সাহিত্য সংস্কৃতি

মুহাম্মাদ

সীরাতুন্নবী (সা.) সংখ্যা

হিজরী-১৪৩৬ বাংলা-১৪২১ ইংরেজী-২০১৫

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

সাহিত্য সংস্কৃতি

সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ২০১৫

সম্পাদক
মোশাররফ হোসেন খান

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র
৪৯২ বড় মগবাজার, ঢাকা ১২১৭

www.pathagar.com

সাহিত্য সংস্কৃতি

সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ২০১৫

প্র কা শ কা ল

মাঘ ১৪২১

রবিউল আউয়াল ১৪৩৬

জানুয়ারি ২০১৫

প্র চ্ছ দ

এম এ তাওহিদ

মু দ্র ণ

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি:

১২৫, মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০

প্র কা শ না য়

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

৪৯২ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ০১৯১৪০৫৮৫৭৬

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা

www.pathagar.com

সম্পাদনা পরিষদ

উ প দে ষ্টা

অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর

শেখ আবুল কাসেম মিঠুন

আসাদ বিন হাফিজ

স ম্পা দ ক

মোশাররফ হোসেন খান

স দ স্য

শরীফ বায়জীদ মাহমুদ

মোঃ আবেদুর রহমান

হাসান আলীম

নাসির হেলাল

শরীফ আবদুল গোফরান

হারুন ইবনে শাহাদাত

বিল্লাল হোসেন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয়
মহানবীর [সা] মহান আদর্শ # ৯
কবিতা
আলো - আল মাহমুদ # ১৩
মুখবন্ধ - কে জি মোস্তফা # ১৪
প্রবন্ধ
অনুপম চরিত্র
বিচারপতি মোহাম্মাদ আব্দুর রউফ # ১৫
মহানবী (সা.) সম্পর্কে পাশ্চাত্যের মনীষীগণ
ড. এমাজউদ্দীন আহমদ # ২০
রাসূল [সা] আমার
মুস্তাফা জামান আব্বাসী # ৩১
কবিতা
তিনি আছেন পৃথিবীর সব জনপদে - জয়নুল আবেদীন আজাদ # ৩৩। একটি অন্যরকম প্রার্থনা - আসাদ বিন হাফিজ # ৩৪। যমজ কবিতা - মুকুল চৌধুরী # ৩৫। ফুলের উপমা - নাসির হেলাল # ৩৭। রাসূলের জন্য ভালবাসা - তমসুর হোসেন # ৩৮।
প্রবন্ধ
নারী জাতির মুক্তিদূত মহানবী [সা]
অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান # ৩৯
রাসূলুলাহ [সা]-এর চরিত্র এক অনন্য মুজিযা
মনসুর আহমদ # ৫৯
রাসূল [সা]-এর চেতনা
শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির # ৬৫
ছড়া
হাজার সালাম- সাজজাদ হোসাইন খান # ৭৬। আলোর পথিক- মানসুর মুজাম্মিল # ৭৬। আমার নবী মোহাম্মাদ [সা] - নজরুল ইসলাম শান্তু # ৭৭।
মিডিয়া
চলচ্চিত্র তথা মিডিয়ার জন্য লেখালেখি
শেখ আবুল কাসেম মিঠুন # ৭৮

www.pathagar.com

কবিতা

পরিত্রাণ - মাহমুদুল হাসান নিজামী # ৯০। দু'টি কবিতা- নাজিব ওয়াদুদ # ৯০। অলিখিত দলিলে স্বাক্ষরিত জমিন- শরীফ আবদুল গোফরান # ৯২। হজরত মুহাম্মাদ [সা] - খুরশীদ আলম বাবু # ৯৩। সিরাতুন্নবী [সা]- আহমদ মতিউর রহমান # ৯৪। রাসূল আমার- মহিউদ্দিন আকবর # ৯৫। কেমন উম্মত ওরা - হারুন ইবনে শাহাদাত # ৯৬।

অর্থনীতি

সর্বকালের সফল অর্থনীতিবিদ মুহাম্মাদ (সা.)
জাফর আহমাদ # ৯৭

অর্থনৈতিক লেনদেনে সুদ
এ কে আজাদ # ১১২

শিক্ষানীতি

মহানবীর শিক্ষা আন্দোলন
ড.আহসান হাবীব ইমরোজ # ১১৭

বিচার ব্যাবস্থা

বিচারপতি মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ [সা]
মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম # ১৩৬

নাতে রাসূল [সা]

নাতে রাসূল [সা] - আমিনুল ইসলাম # ১৪৫। না'ত- শাহনাজ পারভীন # ১৪৬।

যুদ্ধনীতি

ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ
ইকবাল কবীর মোহন # ১৪৭

বদর যুদ্ধের বৈপ্লবিক শিক্ষা ও তার প্রভাব
মোহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম # ১৫১

আবু লাহাবের করুণ পরিণতি
মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ # ১৫৫

কবিতা

আমার নবী- ফজলুল হক তুহিন # ১৬৬। বিজয়ের কোলাহল - রফিক রইচ # ১৬৬। ঘুমের মাঝে- মনসুর আজিজ # ১৬৭। আর কোনো পথ নেই - নাজমা ফেরদৌসী # ১৬৮। তোমার জন্য নয় - আবুল খায়ের মাহবুব # ১৬৮। তুমিই

www.pathagar.com

পথ তুমিই পাথেয় - ইবনে আবদুর রহমান # ১৬৯। হে রাসুল [সা] - জালাল উদ্দিন ওমর # ১৭০। আলোর দিশারী- সাবের রাহী # ১৭১। প্রিয়নবী - মিনহাজুল ইসলাম মোহাম্মদ মাছুম # ১৭২।

দাওয়াত ও মিশন

মহানবীর [সা] মৌখিক দাওয়াতের ভাষা : শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ ও নান্দনিকতা
ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ # ১৭৩

মানবতার রক্ষাকর্তা
হাসান শরীফ # ১৮২

মহানবীর [সা] মিশন
মুহাম্মদ আবুল হুসাইন # ১৮৫

ছোটগল্প

কোমল অতি ধবল জ্যোতি
মালিক ইমতিয়াজ # ১৯২

যতো ভালোবাসা রাসূলের [সা] জন্য
আলতাফ হোসাইন রানা # ১৯৬

সত্য পথে যারা হার মানেনা তারা
রিয়াজ পারভেজ # ১৯৮

সংস্কৃতি

অপসংস্কৃতির কুফল ও আমাদের করণীয়
ইব্রাহিম মন্ডল # ২০১

সাহিত্য

এক মৌলিক সাহাবী-কবি
মুস্তফা মনজুর # ২১০

ভাষা ও সাহিত্যে বিশ্বনবীর [সা] ভালোবাসা
আসাদুজ্জামান আসাদ # ২১৮

কবিতা

সত্যদ্রষ্টা - জামাল দ্বীন সুমন # ২২২। ফোটে ফুল - আমীর উল রুমী # ২২২। খোদার প্রতিনিধি - শাহীন আল মামুন # ২২৩। মনের ভিতর রাসূল [সা] - সোলায়মান আকন্দ # ২২৪। প্রশংসিত প্রিয় নবী - সোনিয়া সাইমুম বন্যা # ২২৪। মহিমান্বিত রাসূল - স্বপন মোহাম্মদ কামাল # ২২৫। শেষ নবী - মীম ওহিদুজ্জামান # ২২৭।

www.pathagar.com

ভ্রমণ

সবুজ গম্বুজের ঘ্রাণ
ইবনে নাসিম # ২২৯

হজ্জ এক ব্যতিক্রমি সফর ভিন্ন এক অনুভূতি
শহীদুল ইসলাম # ২৩৩

চরিত্র মাধুর্য

প্রিয় নবী কখনও রাগ করতেন না
মাহবুবুল হক # ২৪৩

সর্বগুণে গুণান্বিত মুহাম্মাদ [সা]
এইচ. এম. মুশফিকুর রহমান # ২৫১

রাসূল [সা]-এর উত্তম আচরণ
মো: তোফাজ্জল হোসাইন # ২৫৯

প্রিয় নবীর রূপ-লাবণ্য
তৌহিদুর রহমান # ২৭৭

প্রবন্ধ

রাসূলের (সা.) একটি শিক্ষণীয় দিক
হেলাল আনওয়ার # ২৮৪

মুমিন হৃদয়ে আখিরাতের বাসনা
মনির হোসেন হেলালী # ২৯১

সামাজিক অবক্ষয় রোধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মাদ [সা]
মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহিদ # ২৯৮

গ্রন্থালোচনা

বাংলা ভাষায় মুহাম্মদ সা. চরিত
অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান # ৩০৪

প্রতিবেদন

বিভিন্ন সংগঠনের সীরাতুন্নবী (সা.) উদযাপন ২০১৫
আবু শামিল # ৩০৭

www.pathagar.com

সম্পাদকীয়
মহানবীর [সা] মহান আদর্শ

রাসূল [সা] মুহাম্মাদ!

সর্বকালের সর্বযুগের এক শ্রেষ্ঠ মহামানব।

মহান রাব্বুল আলামিন সমগ্র মানবজাতির জন্য তাঁর প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব রাসূল মুহাম্মাদকে [সা] 'হিদায়াত' স্বরূপ, 'সুসংবাদ দানকারী', 'সতর্ককারী', 'রহ্মতস্বরূপ' ও 'পথপ্রদর্শক' হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। এমন আরও বহুতর বিশেষণে রাসূল [সা] বিশেষিত। আল-কুরআনে বলা হচ্ছেঃ 'তিনি তাঁর রাসূলকে 'পথনির্দেশ ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, সমস্ত দীনের ওপর তাকে জয়যুক্ত করার জন্য। সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।' [সূরা আল ফাতহ্ : আয়াত ২৮]। আল্লাহপাক চান বান্দা হিসাবে মানুষ একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করবে এবং তাঁর মনোনীত রাসূলকেই [সা] অনুসরণ করবে। এটাই মহান আল্লাহ্র চূড়ান্ত ঘোষণা।

পৃথিবীতে বহু মানুষের বসবাস। প্রতিটি মানুষেরই রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন কর্মক্ষেত্র এবং জীবন যাপনের পৃথক কর্মপন্থা। মানসিকতা, চিন্তা ও ব্যক্তিসত্তার ক্ষেত্রেও রয়েছে অজস্র ভিন্নতা। প্রতিটি সমাজ, দেশ ও জাতি-গোষ্ঠীর জন্য রয়েছে পৃথক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিজস্ব একটি স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য। সেটা থাকতেই পারে। পৃথিবীর ভারসাম্যপূর্ণ চলমানতার জন্য সেটার প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। কিন্তু সকল কিছুর ওপর প্রকৃত সত্য এই যে, কর্ম ও জীবনপ্রণালী কিংবা সামাজিক ও বৈশ্বিক ভৌগোলিক কারণে মানুষের মধ্যে যত প্রভেদই থাকুক না কেন, এক আল্লাহ্র দাসত্ব স্বীকার এবং রাসূলের [সা] সর্বান্তকরণে অনুসরণ ছাড়া, একমাত্র ইসলামের বিধান, শাসন, জীবনপদ্ধতি, সামগ্রিক আদর্শ ও সংস্কৃতি জীবনের জন্য একান্ত অপরিহার্য হিসাবে গ্রহণ করা ছাড়া আখিরাতে চূড়ান্ত সফলতার অন্য কোনো পথই মানুষের জন্য খোলা রাখা হয়নি। বিজয়ের তো প্রশ্নই ওঠে না। এমনকি, পার্থিব যে বৈষয়িক চিন্তা কিংবা তার জন্য পেরেশানি, যশ-খ্যাতি বা জাগতিক স্বার্থের পেছনে ছুটে চলা– এটাকেও রাব্বুল আলামিন অত্যন্ত তুচ্ছতর

www.pathagar.com

ও লঘু দৃষ্টিতে বিবেচনা করেছেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন: 'যারা শুধুমাত্র এই দুনিয়ার জীবন এবং এর শোভা-সৌন্দর্য কামনা করে তাদের কৃতকর্মের সমুদয় ফল আমি এখানেই তাদেরকে দিয়ে দিই এবং এ ব্যাপারে তাদেরকে কম দেয়া হয় না। কিন্তু এ ধরনের লোকদের জন্য আখিরাতে আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই। [সেখানে তারা জানতে পারবে] যা কিছু তারা দুনিয়ায় বানিয়েছে [তা সবই] বরবাদ হয়ে গেছে এবং এখন তাদের সমস্ত কৃতকর্ম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।' [সূরা হুদ : আয়াত ১৫-১৬]।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, যারা শুধুমাত্র বৈষয়িক ভোগ-বিলাস, লাভ, লোভ, ক্ষমতা, যশ-খ্যাতি কিংবা উন্নতি, সমৃদ্ধি অর্জন করাকেই কেবল তাদের জীবনের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে– আল্লাহর এই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ তাদের জন্য আদৌ শুভ ও কল্যাণবহ নয়।

আখিরাতের জীবনের তুলনায় দুনিয়ার জীবন খুবই নগণ্য। এতই নগণ্য যে এক ফোঁটা বুদবুদের সাথেও এর তুলনা চলে না। সুতরাং এই সাময়িক, ততোধিক ক্ষণস্থায়ী সময়ের জন্য মহামূল্যবান একটি জীবনকে বিলিয়ে দিয়ে নিজেকে সমূহ বিপন্ন ও ভয়ঙ্কর ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত করা কোনো বিবেকসম্পন্ন মানুষ বা ব্যক্তির কাজ হতে পারে না। দুনিয়া ও আখিরাতের লাভ-ক্ষতির সুবিশাল প্রভেদ সামনে নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলে কোনো উজবুকের পক্ষেও এমন পতন ও পচনশীলতাকে গ্রহণ করা সম্ভবপর হওয়ার কথা নয়। কিন্তু আফসোসের বিষয়, এসব বিচার বিশ্লেষণ তো দূরে থাক, চিন্তার সামান্য কণা পরিমাণও এ সকল ক্ষেত্রে ব্যয় করতে অনেকেই রাজি নয়। এর চেয়ে পার্থিব লাভ-লোকসান, হিংসা-বিদ্বেষ, আপন স্বার্থ অর্জনের যাবতীয় কূটকৌশল, ক্ষমতার লিপ্সা, ব্যবসায়িক হিসাব-নিকাশ, এমনকি শেয়ার ও টেন্ডারের মত জটিল বিষয় নিয়ে দর কষাকষি করে একটি জীবন পার করে দিতে তারা অধিক পরিমাণে আগ্রহী। অথচ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে 'জঘন্য জীবের' সাথে উপমিত করেছেন, যারা তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে দীনের পথে, আল্লাহর সৃষ্টি জগতের জন্য, সৎ ও শুভ কর্মের দিকে ধাবিত করে না।

আগেই উল্লেখ করেছি, ভৌগোলিক কিংবা দেশ ও সমাজের মধ্যে আমাদের যতই দূরত্ব কিংবা সীমারেখা কিংবা বৈচিত্র্য থাকুক না কেন, কিন্তু মানুষ হিসাবে আমাদের একটা ক্ষেত্রে ঐক্যকে সুসংহত, সুদৃঢ় ও সংযত করার প্রয়াস থাকতেই হবে, আর সেটা হচ্ছে– মহান রাব্বুল আলামিনের নিরঙ্কুশ দাসত্ব স্বীকার করে একমাত্র তাঁরই প্রতি আনুগত্যে মাথা নত করা এবং আমাদের জীবনের পথের সকল কর্মকাণ্ডে ও চিন্তার গভীরে আল্লাহর মনোনীত দীন ও রাসূলের [সা]

www.pathagar.com

আনুগত্য করা। এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো দরোজা আমাদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়নি। আল্লাহ্ পাকের স্পষ্ট ঘোষণা: 'হে মুহাম্মদ! বলে দাও, হে লোকেরা! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য এসে গেছে। এখন যারা সোজা পথ অবলম্বন করবে, সোজা পথ অবলম্বন তাদের জন্যই কল্যাণকর হবে এবং যারা ভুল পথ অবলম্বন করবে, ভুল পথ অবলম্বন তাদের জন্যই ধক্ষংসের কারণ হবে।' [সূরা ইউনুছ : আয়াত ১০৮]।

আল্লাহর বান্দা তথা খলিফা হিসাবে, মুমিন হিসাবে আমাদের কখনো 'ভুল পথ' গ্রহণ করা সমীচীন নয়। আর যদি সেটা পরিহার করে 'সোজা পথ' অবলম্বন করি তাহলে আল্লাহপাকের তরফ থেকে আমাদের জন্য রয়েছে সফলতাসহ সম্মানজনক পুরস্কার। যেমন তিনি বলছেন: 'যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে এবং নিজের রবের একনিষ্ঠ অনুগত বান্দা হয়ে থাকে, তারা নিশ্চিত জান্নাতের অধিবাসী এবং জান্নাতে তারা চিরকাল থাকবে।' [সূরা হূদ: আয়াত ২৩]। আল্লাহপাকের ওয়াদা হচ্ছে : 'যে ব্যক্তিই ঈমানসহকারে সৎ কাজ করবে, সে পুরুষ হোক কিংবা নারী– আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করবো।' [সূরা আন নহল : আয়াত ৯৭]।

আল্লাহর এই সকল ঘোষণা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, রাব্বুল আলামিন ঘোষিত এই পুরস্কার ও সম্মানের অধিকারী একমাত্র মুমিনরাই। তাদের জন্য আল্লাহপাকের সকল ইতিবাচক ও সম্মানজনক আয়োজন। আর এ জন্যই তিনি রাসূলকে [সা] 'সতর্ককারী', 'রহমতস্বরূপ' ও 'পথপ্রদর্শক' হিসাবে মনোনীত করেছেন। রাসূলকে [সা] সম্বোধন করে আল্লাহপাক বলছেন, 'যারা তোমার বায়াত গ্রহণ করে তারা তো আল্লাহর বায়াত গ্রহণ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর। সুতরাং যে তা ভঙ্গ করে, তা ভঙ্গ করার পরিণাম তারই এবং যে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করে আল্লাহ তাকে মহাপুরস্কার দেন।' [সূরা আল ফাতহ : আয়াত ৮-১০]।

প্রকৃতঅর্থে কোনো মুমিনই 'বায়াত' বা শপথ ভঙ্গ করতে পারে না। সেটা তার জন্য বাঞ্ছনীয় তো নয়ই, বরং চরম লাঞ্ছনার বিষয়। অতএব, আল্লাহ্ এবং তাঁর মনোনীত দীন ও রাসূলের [সা] সর্বান্তকরণে আনুগত্য, অনুসরণ, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর দিকনির্দেশনা সঠিক ও সার্বিক বাস্তবায়নের ওপরই কেবল আমাদের সফলতার সীমা কিংবা বিষয়-আশয় নির্ভর করে। পার্থিব কিংবা জাগতিক লাভ-ক্ষতি কোনো মুমিনের জন্যই বিবেচ্য বিষয়ে পরিণত হতে পারে না। বরং মুমিনের জন্য ইসলাম পরিপূর্ণ আনুগত্যের দাবি করে। বিভ্রান্তি ও কুহকের সকল জাল ও মোহ ছিন্ন করে, সকল চিন্তাপ্রবাহকে একমাত্র আল্লাহর দীনের দিকে স্থির

www.pathagar.com

ও অবিচল রাখাই একজন প্রকৃত মুমিনের কাজ। বস্তুত, রাসূলের [সা] জীবনই আমাদের জন্য একমাত্র আদর্শ ও অনুসরণীয়। তাঁর কর্মপ্রবাহ ও জীবনধারায় শিক্ষা, সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধনীতিসহ এমন কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ও নেই যার আদর্শ রাসূল [সা] বাস্তবে উপস্থাপন করেননি। জীবন ও জগতের সকল বিষয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূলের [সা] দৃপ্ত, সফল পথনির্দেশনা ও দৃষ্টান্ত রয়ে গেছে অমলিন।

একজন মুমিনের জন্য ইসলাম যে আদর্শ, সমাজ-সংস্কৃতি ও সভ্যতার দিকনির্দেশনা পেশ করেছে, এর বাইরে আমাদের জন্য আর কোনো কল্যাণকর আদর্শ, সংস্কৃতি কিংবা সভ্যতা থাকতে পারে না। তেমনটি ভাবাও ঈমান আকিদার পরিপন্থী কাজ হিসেবে গর্হিত অপরাধ বলে বিবেচিত। সুতরাং একমাত্র দীনের মধ্যেই খুঁজতে হবে আমাদের জীবনের সামগ্রিক কল্যাণকর মুক্তির পথ। চলমান স্রোতের সাথে মিশে যাওয়া কোনো মুমিনের চরিত্র হতে পারে না, বরং সকল অবাঞ্ছিত স্রোতধারা থেকে, সকল কুহকের মরীচিকা থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র দীনের ওপরই আমাদের চিন্তা ও কর্মপ্রবাহকে স্থির ও সুদৃঢ় রাখতে হবে। যারা হতভাগা, তাদের কথা ভিন্ন। কিন্তু যারা মুমিন তাদেরকে অবশ্যই রাসূলের [সা] জীবনকেই অনুসরণ করতে হবে সকল ক্ষেত্রে। এর মধ্যেই নিহীত রয়েছে আমাদের জন্য সকলপ্রকার কল্যাণ ও একমাত্র মুক্তি।

সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, রাসূলই [সা] আমাদের জন্য একমাত্র অনুসরণযোগ্য আদর্শ মহামানব। সুতরাং আমাদের জীবনের সকল দিক– হোক সে ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি-অর্থনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি, সকল ক্ষেত্রেই রাসূলের [সা] নির্দেশিত পথ অনুসরণ করতে হবে। এ ছাড়া বিকল্প আর কোনো পথ নেই, দরোজাও খোলা নেই আমাদের জন্য।

বস্তুত রাসূল মুহাম্মাদ [সা] এমন এক মহামানব, যার তুলনা চলে না কোনো কিছুর সাথেই। তিনি ছিলেন আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞানের অধিকারী। স্বয়ং আল্লাহই ছিলেন তাঁর মহান শিক্ষক। এজন্যই তিনি ব্যতিক্রমী, এজন্যই তিনি মানব হয়েও মহামানব। তাঁর আগমনের পূর্বে বা পরে রাসূলের [সা] মত এমন মহামানব আর কখনও আসেননি, কখনও আসবেনও না। এটাই মহান রাব্বুল আলামীনের একান্ত মঞ্জুর, চূড়ান্ত ফায়সালা।

সুতরাং এই মহামানব রাসূলের [সা] আদর্শেই আমাদের গোটা জীবন পরিচালিত করতে হবে– এর কোনো বিকল্প নেই। #

www.pathagar.com

আলো

আল মাহমুদ

আল্লাহর রাসূল তিনি
জগতের আলো
আলোর ওপরে যেন
আলো ঝলমলালো।

দূর হোক অন্ধকার
দূর হোক কালো
সামনে পেছনে জ্বালো
আলো আর আলো।

আলোতে আলোর মালা
তুমি নবী ভালো
তোমার পরশে ভালো
হয় আরো ভালো।

www.pathagar.com

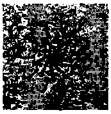

মুখবন্ধ

কে জি মোস্তফা

মানবজাতির কল্যাণে
আল্লাহ্‌র অশেষ দান
মহানবী হজরত মুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু আলাহিস্‌সালাম।

এ বিশ্ব এক মহাগ্রন্থ
হজরত মুহাম্মাদ [সা] যার মুখবন্ধ
জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মনীষীদের অভিমত
মুহাম্মাদ এ জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।
আমাদের গর্ব আমরা তাঁর উম্মত
অন্তরে থাকুক তৌহীদী হিম্মত।

তাঁর নামে দরুদ পড়েন স্বয়ং আল্লাহ্‌
তাঁর নামে দরুদ পড়ে ফেরেশতাকুল
তাঁর নামে দরুদ পড়ে জ্বীন-ইনসান।

‘ইয়া নবী সালাম আ’লাইকা
ইয়া রাসূল সালাম আ’লাইকা
ইয়া হা’বীব সালাম আ’লাইকা
সালাওয়াতুল্লাহ্‌ আ’লাইকা।’

www.pathagar.com

অনুপম চরিত্র

বিচারপতি মোহাম্মাদ আব্দুর রউফ

নবী করিম [সা] ত্রিকালদর্শীয় এক মহাপুরুষ। তিনি এ ধরাধামে আগমনের বহুপূর্ব হতেই এক বিশেষ আলোচিত ব্যক্তিত্ব। এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের পর হতে ইন্তেকাল পর্যন্ত সবচাইতে বেশি আলোচিত ব্যক্তি। তাঁর তিরোধানের পর হতে কেয়ামত পর্যন্ত তিনি সর্বক্ষণ আলোচিত ব্যক্তিত্ব হিসাবেই মর্যাদাবান থাকবেন। সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী রূপে এই পৃথিবীতে তাঁর আগমন। সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য বিশেষ রহমত স্বরূপ। আল্লাহতায়ালা তাঁকে তাঁর ঘনিষ্টতম বন্ধু হিসাবে পাঠিয়ে ছিলেন। তাঁর চরিত্র মাধুর্যপূর্ণ, অনুপম, অকৃত্রিম, নির্মল, অনুকরণীয়, অনুসরণীয়, মানবিক মূল্যবোধে অতুলনীয় ও আর্দশিক।

বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে এ পৃথিবীতে তাঁর আগমন বার্তা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে রয়েছে। ধর্মীয় গবেষকবৃন্দ, জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে অনেক ক্ষেত্রেই তা অকপটে স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন। মানব কূলে তিনিই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যার সম্পর্কে তাঁর জন্ম থেকে আমৃত্যু প্রতিটি মুহূর্তের ঘটনা প্রবাহের তথ্যবলী ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে মূল্যায়িত হয়ে সুচারুরূপে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট গবেষক, তথ্য-সংগ্রহক ও সংরক্ষক, গ্রন্থাকার, আলোচক ও লেখকবৃন্দ স্ব স্ব ক্ষেত্রে ঐ সকল কার্যাদিতে মনোনিবেশ করে অতীব মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব হিসাবে সমাজে নিজেরাও মূল্যায়িত হয়েছেন এবং চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিগনিত হচ্ছেন। তিনি ছিলেন এক পরশমণি। তাঁর জীবদ্দশায় যেমনিভাবে সৌভাগ্যবান বক্তিবর্গ তাঁর সাহচর্য পেয়ে আলোকিত মানুষ হিসাবে ধন্য হয়েছেন, তেমনি ভাবে তাঁদের সাহচর্যেও যারা থাকতে পেরেছেন তারাও ধন্য হয়েছেন। যুগ যুগ ধরে এই প্রক্রিয়া চলমান থাকবে। সে এক অবিস্মরণীয় ক্রমবিকাশ। চিরন্তন তার প্রবাহ। অতুলনীয় তার প্রভাব। অপ্রতিহত তার বিকাশ।

www.pathagar.com

হযরত নবী করিম [সা] বলতেন 'আনা ইবনু যাবায়ীন' অর্থাৎ 'আমি দুইজন উৎস্বর্গকৃত ব্যক্তির পরিবারের সন্তান।' প্রথম জন হচ্ছেন, হযরত ইসমাইল [আ], যাকে তাঁর পিতা হযরত ইব্রাহীম [আ] আল্লাহু সুবাহানাহুতায়ালার নির্দেশে তাঁর রেজামন্দির জন্য মিনা প্রান্তরে সত্যিকার অর্থেই কোরবানী করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহতায়ালা হযরত ইব্রাহীমের এই আল্লাহ্ প্রেমে সন্তুষ্ট হয়ে হযরত জিবরাইলের মাধ্যমে হযরত ইসমাইলের স্থলে একটি দুম্বা কোরবানীর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ঐ দিনটি ছিল ১০ই জিলহজ। তখন থেকেই হজ্জের পরের দিন থেকে আল্লাহ্ স্মরণে পশু কোরবানী করা মালদার মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়।

দ্বিতীয় জন হলেন, হযরত নবী করিম [সা]-এর পিতা হযরত আবদুল্লাহ। নবীজির দাদা হযরত আবদুল মুত্তালিব কাবা ঘরের প্রধান খাদেম ছিলেন। তদানীন্তন হেজাযের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে যার পুত্র সন্তান অধিক তিনিই সমাজে সর্বদিক থেকে প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি বলে পরিগণিত হতেন। সেই প্রথা স্মরণে রেখে হযরত আবদুল মুত্তালিব কাবা ঘরে রক্ষিত দেব দেবীর সম্মুখে এই বলে শপথ করেছিলেন যে, যদি তাঁর দশটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহলে তাদের মধ্যে একজনকে কাবায় রক্ষিত 'লয়লা' দেবীরবেদিতে কোরবানী দিবেন। হযরত আবদুল্লাহ হযরত মুত্তালিবের দশম ও সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। কিশোর আবদুল্লাহ অপরূপ সুশ্রী। আচার-আচরণে অনন্যসাধারণ। মায়াবী চেহারার অধিকারী। পিতামাতার অত্যন্ত প্রিয় এবং স্নেহভাজন। তিনি যৌবনে পদার্পনের পূর্বক্ষণেই একদিন হযরত আবদুল মুত্তালিব তাঁর শপথের কথা স্বরণ করে তা কার্যকর করার উদ্দেশ্যে তার দশ পুত্রের মধ্যে এক লটারির ব্যবস্থা করলেন। তাতে হযরত আবদুল্লাহর নাম উঠে গেল। তিনি ডান হাতে ছুরি ও বাম হাতে আবদুল্লাহকে ধরে 'লয়লা' দেবীর বেদির দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। ঐ শপথ কার্যকরণের প্রতি আবদুল মুত্তালিবের একগ্রতা ও দৃঢ়তা লক্ষ্য করে উপস্থিত কোরায়েশ সরদাররা আতঙ্কিত হয়ে আবদুল মুত্তালিবকে নানাভাবে বুঝানোর চেষ্টা করেন যে, ছেলেকে এইভাবে কোরবানী করলে একটা মর্মান্তিক নজির হয়ে পড়বে। কিন্তু মুত্তালিব তার দৃঢ় সঙ্কল্পে অটুট থাকায় শেষ পর্যন্ত সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নেন যে, সবাই একত্রে মক্কা থেকে চার ক্রোশ দূরে মদিনার পথে 'উবাইয়া' নামক এক ইহুদি বুজুর্গ আলেমের নিকট যেয়ে তার মাধ্যমে বিষয়টা

www.pathagar.com

সুরাহা করার চেষ্টা করবেন। হযরত উবাইয়া সবকিছু শুনে এবং হযরত আবদুল্লার ললাটে একটি নূরের তাজাল্লী দেখতে পেয়ে বুঝতে পারলেন যে, আল্লাহ তায়ালা এই যুবকের মাধ্যমে সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য এক বিশেষ রহমতের ব্যবস্থা করবেন। কাজেই তিনি হযরত মুত্তালিবকে বললেন, সে যদি তার শপথের কথা স স্মরণ করে অনেকগুলি উট কোরবানী দেয় তাহলে ঐ শপথ কার্যকারী হয়েছে বলে গৃহীত হবে। উটের সংখ্যা জানতে চাইলে তিনি বললেন যে, একটি দাঁড়িপাল্লার একদিকে আবদুল্লাহ ও তার পিতামাতার নাম লিখা একটি কাগজ দিতে হবে এবং অপর পাল্লায় উটের সংখ্যা লিখতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত উভয় পাল্লা সমান না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত উটের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়াতে হবে। পাল্লায় যখন উটের সংখ্যা ১০১ লিখা হয় তখন দুই পাল্লাই সমান হয়ে যায়। কালবিলম্ব না করে আবদুল মুত্তালিব ঐ দিনই ১০১ টি উট কোরবানী দিয়ে মাংস গরীব মিসকিনদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। এভাবে হযরত আবদুল্লাহর জীবন রক্ষা পায়।

হযরত আবদুল্লার যৌবনে পদার্পণের সাথে চারিদিক থেকে বিবাহের পয়গাম আসতে থাকে। অনেক মহিলা দূত মারফত আবদুল্লার সাথে বিবাহে স্বীয় উৎসুক্য প্রকাশ করেন। কিন্তু আবদুল মুত্তালিব তারই এক পুরাতন বন্ধু মদিনার সম্ভ্রান্ত্র বংশের ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যা হযরত বিবি আমিনার সাথে আবদুল্লার বিয়ে দিয়ে দেন। আবদুল মুত্তালিব অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন। তার আদেশ নির্দেশ কারো পক্ষে অমান্য করা সম্ভব হতো না। বিবাহের ১৬ দিনের মাথায় তিনি আবদুল্লাকে ব্যবসা উপলক্ষে বিরাট এক কাফেলার সাথে সিরিয়া পাঠিয়ে দেন। হযরত বিবি আমিনা শ্বশুরালয়েই অবস্থান করেন। হযরত আবদুল্লাহ ৩ মাস পর সিরিয়া থেকে ফেরার পথে মদিনা থেকে আনুমানিক ৬ ক্রোশ দক্ষিণ দিকে একস্থানে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার কাফেলা সেখানে ৩ দিন অপেক্ষা করার পর তাদের ১ জন সাথীকে আবদুল্লার সেবায় রেখে মক্কার পথে রওয়ানা দেন। ঐ কাফেলা মক্কায় পৌছাবার পূর্বেই হযরত আবদুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। তার সাথী অন্যান্য কাফেলার লোকদের সহায়তায় ঐ স্থানেই আবদুল্লার লাশ দাফন করে তিনিও মক্কার দিকে রওয়ানা দেন।

হযরত মা আমিনা তখন গর্ভবতী অবস্থায় অসুস্থ থাকায় তাঁকে তখন আবদুল্লার মৃত্যু সংবাদ দেয়া হয়নি। পরে পরিবারের লোকদের কথা-বার্তা থেকে

www.pathagar.com

আবদুল্লার মৃত্যু সংবাদ জানতে পেরে তিনি আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন। হযরত আমিনার বিয়ের পর থেকেই হযরত বারাকা তাঁর খেদমতে নিয়োজিত থাকেন। এই বারাকা এক মহীয়সী নারী। মাত্র তের বছর বয়সে হযরত আবদুল্লাহ্ হযরত বারাকাকে মক্কার বাজার থেকে কৃতদাসী হিসাবে ক্রয় করেছিলেন। তিনিই হযরত আমিনার একমাত্র সাথী ছিলেন। কথিত মতে, নবী করিম [সা] তাঁর হাতেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। নবী করিম [সা] তাঁকে উমন্নী বলে সম্বোধন করতেন।

ঐ সময় ইয়ামেনের বাদশা আবরাহা ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে কাবা ঘরকে ভাঙার উদ্দেশ্যে বিরাট হস্তিবাহিনী নিয়ে আরাফাত ময়দান সংলগ্ন মক্কার উপকূলে তাবু টানিয়ে অপেক্ষা করেন। তাঁর সৈন্যরা আবদুল মুত্তালিবের দুইশত উট ধরে নিয়ে যায়। মুত্তালিব তাঁর ঐ উটগুলি ফেরত পাওয়ার জন্য আবরাহার কাছে গিয়ে উটগুলি ফেরত চায়। তখন আবরাহ্ তাকে বলেছিল, 'তিনি কাবা ঘরের প্রধান পুরোহিত হওয়া সত্বেও শুধু তাঁর উটগুলি ফেরত চাইছেন, কাবা ঘর রক্ষায় কোন কথাই বলছেন না।' উত্তরে আবদুল মুত্তালিব বলেছিলেন, আমার উট আমি ফেরত চাই। যার ঘর তিনিই সেটা দেখবেন। আবরাহা মুত্তালিবের উটগুলি ফেরত দিয়ে দিল। বাড়ি ফিরে তিনি হযরত আমিনাসহ সবাইকে নিয়ে নিকটবর্তী পাহাড়ে চলে যাওয়ার প্রস্তাব করেন, অন্যথায় আবরাহার সৈন্যসামন্ত এসে সবাইকে ধরে নিয়ে যাবে। তাতে করে সারাজীবন সবাইকে কৃতদাস-দাসী হিসাবে জীবন যাপন করতে বাধ্য হতে হবে। গর্ভবতী হযরত আমিনা তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা মনে করে অন্য কোথাও যেতে অমত প্রকাশ করেন। কিন্তু আবদুল মুত্তালিবের পিড়াপীড়িতে বলে ফেলেন, 'আবরাহার সৈন্যরা তাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না'। কার্য্যত: তাই হয়েছিল। একদিন পরেই আবরাহার সৈন্যরা যখন কাবা ঘর আক্রমণের জন্য অগ্রসর হচ্ছিল তখনই আল্লাহ্ নির্দেশে অগণিত আবাবিল পাখির মাধ্যমে আকাশ থেকে পাথরের টুকরা ফেলে আবরাহার হস্তিবাহিনীসহ সকল সৈন্য সামন্তদেরকে ধক্ষংস করে দিয়েছিল। ঐ ঘটনা আল্লাহতায়ালা ১০৫ সূরা ফিল নাযিল করে নবী করিম [সা] কে জ্ঞাত করান।

নবী করিমের [সা] বয়স যখন ৬ বছর তখন বিবি আমিনা তাঁকে নিয়ে হযরত আবদুল্লার কবর যিয়ারতের বাসনা প্রকাশ করেন। আবদুল মোত্তালিব একটি

www.pathagar.com

ভাল উটের ব্যবস্থা করে দেন। বিবি আমিনা হযরত বারাকার কোলে শিশু নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সা] কে নিয়ে ঐ উটে আরোহণ করে মদিনার পথে নবী করিম [সা]-এর নানার বাড়িতে যান। পথিমধ্যে উটের ঝাকিতে শিশু মুহাম্মাদ [সা] হযরত বারাকার গলা আঁকড়ে ধরে থাকতেন। বিবি আমিনা তাঁর একমাত্র সন্তানকে পিত্রালয়ে রেখে ৪০ দিন পর্যন্ত হযরত আবদুল্লাহর কবর যিয়ারত করেন। পরে মক্কায় ফেরার পথে মদিনা থেকে প্রায় ৯ ক্রোশ দূরে বিবি আমিনা ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে মারা যান। মৃত্যুর অন্তিম মুহূর্তে শিশু মুহাম্মাদকে তিনি হযরত বারাকার হাতে তুলে দিয়ে যান। নবী করিম [সা]-এর জীবদ্দশায় হযরত বারাকা তাঁর খেদমতেই নিয়োজিত ছিলেন। তিনি হযরত বারাকাকে মা-এর মতই শ্রদ্ধা করতেন।

পবিত্র কুরআনুল করিমে উল্লেখ রয়েছে যে, পরম করুণাময় আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর ফেরেস্তাদের নিয়ে তাঁর হাবিব নবী করিম [সা] উদ্দেশ্যে সালাম পেশ করেন। কুরআনের সেই উক্তি থেকে এটা সহজেই অনুমেয় যে, যেখানে খালেক স্বয়ং তাঁর এক মাখলুকের সমীপে প্রশংসা করেন তাঁর মর্যাদা আল্লাহতায়ালার কোন পর্যায়ে উন্নীত রয়েছে। সেই নবীর উম্মত হতে পেরে আমরাও সৌভাগ্যবান। #

www.pathagar.com

মহানবী (সা.) সম্পর্কে পাশ্চাত্যের মনীষীগণ

ড. এমাজউদ্দীন আহমদ

আমেরিকার প্রখ্যাত লেখক মাইকেল হার্ট (Michael Hart) তার লিখিত সর্বকালের সেরা এবং কৃতী ব্যক্তিদের জীবনী ও কীর্তি সংক্রান্ত ***The 100*** বইটিতে লেখেন, "ইসলামের প্রবর্তক হজরত মুহাম্মদকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করা যায়, কেননা তার মতে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ধর্মীয় এবং ইহজাগতিক উভয় ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সফল। ['Michael Hart had to give him the distinction of being the most influential personality among the 100 greatest personalities as he was supremely successful on both the religious and secular levels.']।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ব্রিটেনের প্রখ্যাত নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ (George Bernard Shaw) বলেছিলেন, "আমি বিশ্বাস করি, যদি তাঁর মত ব্যক্তি আধুনিক বিশ্বের একচ্ছত্র শাসক হতেন তাহলে তিনি সমস্যাগুলির সমাধান এমনভাবে আনতেন যে বিশ্ব বহুল প্রত্যাশিত শান্তি এবং সুখে ভরে উঠত। ইউরোপ হজরত মুহাম্মদের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হ'কের হয়নি। সুদৃঢ় সারল্য, রসুলের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, অসীম সাহসিকতা, শঙ্কাহীনতা এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং নিজস্ব মিশনের প্রতি সীমাহীন আস্থাই তাঁকে সফলতা দান করে এবং সকল সমস্যার মোকাবেলার সাহস পান তিনি। এসব ক্ষেত্রে তরবারির কোন ভূমিকা ছিল না।"

[I become more than ever convinced that it was not the sword that won a place for Islam in those days. It was the rigid simplicity, the utter self-effacement of the prophet, the scrupulous regard for pledges, his intense devotion to his friends and followers and his intrepidity, his fearlessness, his absolute trust in God and in his own mission. These and not the sword carried everything before them and surmounted every obstacle.]

www.pathagar.com

খ্যাতনামা দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাশেল (Bertrand Russell) তার ***The History of Western Philosphy*** গ্রন্থে লিখেছেন, "প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতায় জ্ঞানের হস্তান্তরকারী হিসাবে মুসলমানদের অবদান অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল।"

["The contributions of Mohammedans as transmitter of knowledge from ancient to modern European civilization must not be underrated."]।

রবার্ট ব্রিফল্ট (Robert Briffault) অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন: "খুব সম্ভব আরবদের ছাড়া আধুনিক ইউরোপ সভ্যতার জন্মই হতো না।"

[It is highly probable that but for the Arabs modern European civilization would never have arisen at all."]।

তিনি আরো বলেন: "আরবরাই পরীক্ষামূলক গবেষণা পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করেন, যা গাণিতিক বিশ্লেষণের সহায়তায় আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছে।"

[He farther stressed that the Arabs "laid the foundation of those methods of experimental research which in conjunction with mathematical analysis gave birth to modern science."]।

Quran and Modern Science গ্রন্থে ড. মরিস বুকাইলি (Dr. Maurice Bucaille) লিখেছেন, "আধুনিক কালের পূর্বে এমন কোন গ্রন্থ মানুষ রচনা করেননি যা জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাগ্রসর ও সময়ের তুলনায় অগ্রগামী এবং যা কোরআনের সাথে তুলনীয় হতে পারে।"

['There is no human work prior to modern time that contains statements which were equally in advance of the state of knowledge at the time they appeared and which might be compared to the Quran.']। তিনি আরো বলেন যে, কোরআন তাঁর অনুসারিদের মধ্যে জ্ঞান অর্জনের সহজাত প্রণোদনা সৃষ্টি করে।

ড. কিথ এল মুর (Dr. Keith L. Moore) তার লিখিত ***The Developing Human*** গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে, অবিকশিত ভ্রূণ সম্পর্কিত কোরআনের বাণী মেডিকেল বিজ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং তাও এক প্রমাণ যে কোরআন হলো সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত ধর্মগ্রন্থ।"

(Dr. L. Moore) in his book ***The Developing Human*** confirmed clearly that relevant verses of the Holy Koran are completely consistent with medical science which proves without any doubt that Holy Koran is the last and final scripture from Allah Almighty)।

ফ্রান্সের খ্যাতনামা দার্শনিক ড. মরিস বুকাইলি (Dr. Maurice Bucaille) তাঁর সুলিখিত গ্রন্থ ***কোরআন, বাইবেল এবং বিজ্ঞান (Quran, Bible and Science)***

www.pathagar.com

লিখেছেন, "কোরআনের আয়াতসমূহে যা বিবৃত হয়েছে তা আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু বাইবেলের অনেক বক্তব্যই অনেক ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পরিপন্থী, কেননা বাইবেলে অনেকের হস্তক্ষেপ রয়েছে।"
['That the verses of the Quran in all relevant areas are completely consistent with modern science, where as many of the verses of Bible due to human intervention on so many occasions, do not tally with science and in fact contradict science in many areas."]।
সম্প্রতি ২০ জন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী এবং গবেষক DVD 'Quran the ultimate truth' শীর্ষক লেখায় বর্ণনা করেছেন যে, "পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে বিবরণ এসেছে তা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।"
['In recent times 20 eminent scientists and research scholars stated in their widely circulated DVD "Quran the ultimate Truth" that all the verses of Holy Quran in a number of fields, have been found completely consistent with their scientific discoveries."]
এক্ষেত্রে এটিও উল্লেখযোগ্য যে, "আল্লাহর নিকট রসুলুল্লাহর (সা.) প্রার্থনার একাংশ থাকতো, জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁকে যেন প্রবৃদ্ধ করা হয় (তিনি জ্ঞানের অন্বেষণের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনায় তিনি জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যে মোনাজাত করতেন।) বুখারি (Bukhari and Muslim) ও মুসলিমের এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, "আল্লাহর রসুল (সা.) যখন ফজরের নামাজের জন্যে মসজিদের দিকে গমন করতেন তখন নিম্নের দোয়াটি তিনি পাঠ করতে করতে যেতেন। "হে আল্লাহ আমার অন্তরকে আলোকিত কর। আমার চোখে আলো দাও। আমার কানে আলো দান কর। আমার ডানে, আমার বামে, আমার মাথার উপরে, আমার সামনে ও পিছনে আলোয় আলোকিত কর। আমার শিরা-উপশিরায়, আমার পেশী, আমার রক্ত-মাংসে এবং আত্মাকে আলোময় করে দাও।"
টমাস কারলাইল (Thomas Carlyle) তাঁর অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থে- ***Heroes and Hero Worship*** এবং The Heroic in History (1840) লিখেছেন, "যেসব মিথ্যা (যা হয়ত ভাল উদ্দেশ্যেই) এই মানুষটির (হজরত মুহাম্মদ (সা.)) উপর বর্ষিত হয়েছে তা আমাদের জন্যে অত্যন্ত অপমানজনক। একজন নীরব মহামানব যিনি বিশ্বের সৃষ্টিকর্তার নির্দেশে সারা বিশ্বকে উদ্দীপ্ত করেছেন তিনি এসবের যোগ্য নন। A. S. ট্রিটন (A. S. Tritton) তাঁর লিখিত ইসলাম (***Islam 1951***) গ্রন্থে

www.pathagar.com

বলেছেন, "এক হাতে তরবারি এবং অন্য হাতে কোরআন সহ যে একজন মুসলিম সৈনিকের ছবি তা সর্বৈব মিথ্যা।"

(The picture of the Muslim soldier advancing with a sword in one hand and the Quran in the other hand is quite false.)

ডি লেসি ও লিয়ারী (De Lacy O' Leary) তাঁর লিখিত গ্রন্থে, (*Islam at the Crossroads*, London, 1923) লিখেছেন, ইতিহাসের গোঁড়া মুসলিমদের সম্পর্কে সেই লোক কাহিনী যে বিশ্বময় তারা ছুটে চলেছেন এবং তরবারির জোরে একটার পর একটা জাতিকে পদানত করেছেন তা অতি উদ্ভট কল্পনাগুলির একটি।"

["History makes it clear, however that the legend of fanatical Muslims sweeping through the world and forcing Islam at the point of sword upon conquered races is one of the most fantastically absurd myths that historians have ever repeated."]

গিবন (Gibbon) তার *The Decline and Fall of the Roman Empire,* 1823 গ্রন্থে লিখেছেন, 'হজরত মুহাম্মদ (সা.) রাজকীয় জাঁকজমককে ঘৃণা করতেন। ঈশ্বরের প্রেরিত মহামানব পরিবারের ভৃত্যদের সাথেও কাজ করতেন। তিনি আগুন জ্বালাতেন। মেঝে পরিষ্কার করতেন। ভেড়ির দুধ দোহন করতেন। নিজের জুতা ও কাপড় চোপড় নিজ হাতেই পরিষ্কার করতেন। একজন তপসীর কার্যক্রমকে অগ্রাহ্য করেও একজন সাধারণ আরব গৃহীর মত মিতাহারি ছিলেন।

["The good sense of Muhammad despised the pomp of royalty. The Apostle of God submitted to menial offices of the family; he kindled the fire; swept the floor; milked the ewes; and mended with his own hands his shoes and garments. Disdaining the penance and merit of a hermit, he observed without effort of vanity the abstemious diet of an Arab."]

Edward Gibbon and Simon Oakley তাঁদের গ্রন্থে- *History of the Saracen Empire,* London, 1870 লিখেছেন, "হজরত মুহাম্মদের (স) জীবনের শ্রেষ্ঠতম সাফল্য অর্জিত হয়েছে তাঁর নৈতিক বলের দ্বারা। ধর্মের প্রচার নয়, বরং তাঁর ধর্মের স্থিতিশীলতাই সকলকে বিস্মিত করে। মক্কা এবং মদিনাতে যে হৃদয়গ্রাহিতার ছাপ দেখা যায়, সেই বিপ্লবের বার শতকের পরেও ভারতে, আফ্রিকায়, তুরস্কে কোরানের প্রচারকদের সেই প্রেরণা প্রাণবন্ত থাকে। মুসলমানরা একইভাবে তাদের বিশ্বাসকে মানুষের কল্পনা ও বিশ্বাসে রূপান্তরিত করে এসেছেন। আমি এক আল্লাহকে বিশ্বাস করি এবং মুহাম্মদ হলেন আল্লাহর প্রেরিত রসুল। এই সহজ কথাগুলিই ইসলামের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে। উপাস্যের

www.pathagar.com

এই বৌদ্ধিক প্রতিকৃতি কখনো অধপতিত হয়নি। আল্লাহর প্রেরিত পুরুষের মর্যাদা কোন সময় অমানবিক গুণাবলির মানদণ্ডে ক্ষুণ্ন হয়নি। ধর্ম এবং যুক্তির বিচারে তাঁর উপদেশ ও নির্দেশাবলি সব সময় কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হয়েছে।"

["The greatest success of Muhammad's life was effected by sheer moral force. It is not the propagation but the permanency of his religion that deserves our wonder, the same pure and perfect impression which he engraved in Mecca and Medina is preserved after the revolutions of twelve centuries by the Indian, the African and the Turkish proselytes of the Koran.... The Mahometans have uniformly withstood the temptation of reducing the object of their faith and devotion to a level with the senses and imagination of man. 'I believe in One God and Mahomet the apostle of God is the simple and invariable profession of Islam. The intellectual image of the Deity has never been degraded by any visible idol; the honors of the prophet have never transgressed the measure of human virtue, his living precepts have restrained the gratitude of his disciples within the bounds of reason and religion.']

Reverend Bosworth Smith কর্তৃক লিখিত ***Muhammad and Muhammadanism, London*** 1974 গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, "তিনি (মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান এবং চার্চেরও প্রধান একই সাথে। তিনি একই সাথে ছিলেন Caesar এবং পোপ। তিনি পোপ ছিলেন, কিন্তু পোপের দাম্ভিকতা ব্যতিত। তিনি Caesar ছিলেন কিন্তু তার বিরাট সৈন্য বাহিনী ছিল না, ছিল না কোন পুলিশ বাহিনী, এমন কী তার ছিল না কোন দেহরক্ষীও। তার কোন সুনির্দিষ্ট আর্থিক ব্যবস্থাও ছিল না। কখনো কোন ব্যক্তি যদি ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতায় শাসন করে থাকেন তাহলে তিনি হলেন মুহাম্মদ (সা.), কেননা তাঁর ছিল উল্লিখিত বাহিনীগুলি ব্যতিত সকল ক্ষমতা। তিনি ক্ষমতাকে সুসজ্জিতকরণে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সারল্য ছিল প্রবাদ স্বরূপ এবং তাঁর সরকারি জীবনও ছিল তেমনি সহজ ও সরল। ইসলামের সব কিছুই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কোন কিছুই আলো-আঁধারি ছিল না। কোথাও ছিল না রহস্যজনক কোন কিছু। হজরত মুহাম্মদের জীবন ইতিহাসও অত্যন্ত স্বচ্ছ।"

["Head of the state as well as the Church, he was Caesar and Pope in one, but he was Pope without the Pope's pretensions, and Casar without the legions of Caesar, without a standing army, without a police force, without a body guard, without a fixed revenue. If ever a man ruled by divine right, it was Muhammad, for he had all the

www.pathagar.com

powers without their supports. He cared not for the dressings of power. The simplicity of his private life was in keeping with his public life. In Muhammedanism everything is different here."]।

Edward Montet তাঁর *La Propagande* Chretienne, Paris, 1890 গ্রন্থে লিখেছেন, "ইসলাম এমন এক ধর্ম যা মূলত যুক্তিভিত্তিক। হজরত মুহাম্মদের (সা.) শিক্ষা এবং কোরআনের দর্শন প্রধানত ঈশ্বরের একত্ব প্রচার করেছে এবং এর মধ্যে রয়েছে এমন এক ধরনের রাজকীয়তা ও মহিমা, এমন এক ধরনের নির্মলতা ও বিশ্বাস যা ইসলামের বাইরে মেলে না।"

["Islam is a religion that is essentially rationalistic...... The teachings of the prophet, the Quran has invariably kept its place as the fundamental starting point and the dogma of the unity of God has always proclaimed there in with a grandeur, a majesty, an invariable purity and with a note of conviction, which it is hard to find surpassed outside the pale of Islam."]

Sir George Bernard Shaw "The Genuine Islam" Vol I, No. 8, 1938 তাঁর এই প্রবন্ধে লিখেছেন, "কোন ধর্মের যদি ইংল্যান্ডে, না ইউরোপে, পরবর্তী শতকে রাজত্ব করার সুযোগ ঘটে তাহলে তা হবে ইসলামের। আমি সব সময়ে মুহাম্মদের (সা.) ধর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত উঁচু ধারণা পোষণ করেছি ইসলামের বিস্ময়কর জীবনী শক্তির জন্যে। এই একটি ধর্ম যার, আমার মনে হয়েছে, পরিবর্তিত বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষমতা রয়েছে এবং প্রত্যেক যুগের জন্যে এর আবেদন রয়েছে। আমি এই বিস্ময়কর মানুষটি সম্পর্কে অনুশীলন করেছি এবং আমার মতে তিনি যীশু খ্রিস্টের বিরোধী তো নন, বরং তাঁকে বলা যেতে পারে মানব জাতির ত্রাতা।

[If any religion had the chance of ruling over England, nay Europe within the next hundred years, it could be Islam. I have always held the religion of Muhammad in high estimation because of its wonderful vitality. It is the only religion which appears to me to possess that assimilating capacity to the changing phase of existence which can make itself appeal to every age. I have studied him the wonderful man and in my opinion far from being an anti-Christ he must be called the Savior of Humanity."]

Dr. William Draper in ***History of Intellectal Development of Europe*** বলেছেন, "জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর ৪ বছর পরে আরবের মক্কা শহরে এমন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন যিনি সমগ্র মানব জাতির উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেন। বহু সাম্রাজ্যের ধর্মীয় নেতা, এমন কী সমগ্র মানব জাতির এক-

www.pathagar.com

তৃতীয়াংশের প্রাত্যহিক জীবনের পথ প্রদর্শক হিসাবে ঈশ্বরের প্রেরিত দূতই তাঁর যথার্থ পরিচয়।"

["Four years after the death of Justinian, AD 569, was born in Mecca, in Arabia, the man who, of all men, has exercised the greatest influence upon human race. To be religious head of many empires, to guide the daily life of one-third of the human race, may perhaps justify the title of a messenger of God."]।

Arthur Glyn Leonard কর্তৃক লিখিত ***Islam : Her Moral and Spiritual Values*** গ্রন্থে তিনি বলেন, "এটি ছিল মুহাম্মদের প্রতিভা, যা ইসলামের আত্মার স্পর্শে সমগ্র আরবকে হিমালয়ের উচ্চতায় উপস্থাপন করে। তন্দ্রাচ্ছন্ন এবং গোত্র-গোষ্ঠির দ্বন্দ্বে স্থবির আরব ভূমি জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এক সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হয়। এর মূলে ছিল মুহাম্মদ (সা.) এর মহত্তম একত্ববাদের প্রভাব, সরলতা, সংযম এবং পবিত্রতা। মহানবীর বিশ্বাস এবং একত্ববাদ অন্ত নিষ্ঠ হয়ে আরবের জনগণের নীতি-নৈতিকতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্র উর্বর হয়ে সম্পূর্ণ নতুন জনপদে রূপান্তরিত হয়।"

["It was the genius of Muhammad, the spirit that he breathed into the Arabs through the soul of Islam that exalted them. That raised them out of the lethargy and low level of tribal stagnation up to the high watermark of national unity and empire. It was in the sublimity of Muhammad's deism, the simplicity, the sobriety and purity; it inculcated the fidelity of its founder to his own tenets, that acted on their moral and intellectual fiber with all the magnetism of true inspiration."]।

Philip K. Hitti তাঁর ***History of the Arabs*** গ্রন্থে লেখেন, তাঁর জীবনকালেই হজরত মুহাম্মদ (সা.) এমন একটি ভূখন্ডে, যা ছিল নিছক একটি ভৌগোলিক এলাকা, সৃষ্টি করেন একটি জাতি যা বিস্তৃত অঞ্চলে খ্রিস্টীয় এবং ইহুদীদের পরাস্ত করে অতি অল্প সময়ে সমগ্র সভ্য দুনিয়ার সুন্দর এলাকায় সাম্রাজ্যরূপে বিস্তৃত হয়।"

[Within a brief span of mortal life, Muhammad called forth material, a nation, never welded before, in a country that was hitherto but a geopgrahical expression he established a religion which in vast areas suppressed Chriastianity and Judaism, and laid the basis of an empire that was soon to embrace within its far flung boundaries the fairest provinces of the then civilized world."]।

www.pathagar.com

কোরআন শরীফ অনুবাদের ভূমিকায় Rodwell লিখেছেন, "হজরত মুহাম্মদদের (সা.) জীবনী শক্তি ছিল বিস্ময়কর। সৃষ্টিকর্তা এবং অদৃশ্য বিশ্বের প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। তাঁকে সব সময় চিহ্নিত করা হবে এমন এক ব্যক্তি হিসাবে যার ছিল সহকর্মীদের উপর বিশ্বাস, নৈতিকতা এবং সমগ্র ইহকালীন জীবনের উপর গভীর আস্থা যা প্রকৃত মহামানবদের মধ্যে দেখা যায় এবং ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে যার উদ্যোগ ছিল অতুলনীয়।"

[Muhammad's career is a woulderful instance of the force and life that resides in him who possesses an intense faith in God and in the unseen world. He will always be regarded as as one of those who had that influence over the faith, morals and whole earthly life of their fellowmen, which none but a really great man ever did, or can exercise, and whose efforts, to propogate a great verity will prosper.']

W. Montgomery Watt তাঁর ***Mohammad at Mecca***, Oxford, 1953 গ্রন্থে লিখেছেন, "তাঁর বিশ্বাসের জন্যে নির্যাতন সহ্য করার মানসিকতা, যারা তাঁকে বিশ্বাস করতেন তাঁদের অত্যন্ত উন্নত নৈতিক চরিত্র এবং তাঁকে নেতা হিসাবে স্বীকার করার দৃঢ়তা এবং তাঁর চূড়ান্ত অর্জন- সব কিছুই তাঁর মৌলিক চারিত্রিক শুদ্ধতার নির্দেশক। এটা অবশ্য সত্য যে, মুহাম্মদকে পাশ্চাত্যে যেভাবে ভুল বোঝা হয়েছে ইতিহাসের অন্য কোন মহৎ ব্যক্তির ক্ষেত্রে তেমন হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে আমাদের উচিত মুহাম্মদের মৌলিক সততা এবং লক্ষ্য অর্জনের একাগ্রতা স্বীকার করা অতি জরুরি এবং অতীতের ভ্রান্তিগুলি সরিয়ে ফেলা জরুরি।"

["His readiness to undergo persecution for his belief, the high moral character of the men who believed in him and looked up to him as a leader, and the greatness of his ultimate achievement all argue his fundamental integrity Moreover, none of the great figures of history is so poorly appreciated in the West as Muhammad. If we are to understand him at all we are to correct the errors we have inherited from the past."]

D. G. Hogarth তাঁর ***Arabia*** গ্রন্থে লিখেছেন, "অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হোক আর হাল্কা বিষয় হোক, তাঁর (হজরত মুহাম্মদের) দৈনন্দিন কার্যক্রম এক ধরনের নিয়মে পরিণত হয়েছিল যা সজ্ঞাতভাবে কোটি কোটি মানুষ অনুসরণ করে থাকে প্রত্যেক দিন। মানবজাতি কোন অংশের স্বীকৃত পরিপূর্ণ মানুষের কার্যক্রমকে এমন নিখুঁতভাবে অনুকরণ কেউ কোথাও করেন না। খ্রিস্টান ধর্মের প্রবর্তকের

www.pathagar.com

কার্যক্রমও সাধারণ মানুষের জীবনকে এমনভাবে প্রভাবিত করেনি। তাছাড়া, অন্য কোন ধর্মের প্রবর্তক এবং আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষের মত শ্রদ্ধা অর্জন করেননি।"

["Serious or trivial his daily behavior has instituted a canon which millions observe this day with conscious memory. No one regarded by any section of the human race as Perfect Man has ever been imitated so minutely. The conduct of the founder of Christianity has not governed the ordinary life of his followers. Moreover, no founder of a religion has left on so solitary an eminence as the Muslim Apostle."]।

K. S. Rama Krisna Rao তার ***Mohammad : The Prophet of Islam*** গ্রন্থে লিখেছেন, "এই ছোট্ট লেখাটি আমার জন্যে লেখা সহজ হয়েছে কেননা এখন সেই বিকৃত ইতিহাস আমাদের আর পড়তে হয় না এবং ইসলামের অসত্য ইতিহাস পড়ে আমাদের প্রচুর সময় নষ্ট করতে হয় না। এখন কোন উল্লেখযোগ্য মহলে ইসলাম এবং তরবারি তত্ত্ব উপস্থাপিত হয় না। ইসলামের এই নীতি যে, ধর্মে কোন বাধ্যবাদকতা নেই তা সর্বজনবিদিত।"

["My Problem to write this monograph is easier, because we are not generally fed now on that (distorted) kind of history and much time need not be spent on pointing out our misrepresentations of Islam. The theory of Islam and sword, for instance, is not heard now in any quarter worth the name. The principle of Islam that 'There is no compulsion in religion' is well known."]।

James Michener লিখিত ***The Misunderstood Religion, Reader's Digest, May 1955*** সংখ্যায় বলা হয়েছে, "ইতিহাসে ইসলামের মত অন্য কোন ধর্ম এত দ্রুত বিস্তার লাভ করেনি। পাশ্চাত্য তাই বিশ্বাস করেছে যে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটেছে তরবারির দ্বারা। কিন্তু কোন আধুনিক লেখক এই তত্ত্ব আর বিশ্বাস করে না এবং পবিত্র কোরআন ও বিবেকের স্বাধীনতায় যে বিশ্বাসী তার প্রচুর প্রমাণ রয়েছে। অন্য গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম প্রচারকের মত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বাণী প্রচারে অত্যন্ত লাজুক ছিলেন। ফেরেস্তা তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন : 'পড়'। যতটুকু আমরা জানি, মুহাম্মদ (সা.) লিখতে ও পড়তে জানতেন না। তিনি ঈশ্বর প্রদত্ত শ্রুতলিপি জোরে জোরে অন্যদের জানাতেন এবং পৃথিবীর বৃহত্তর অংশে তাই বিপ্লব সৃষ্টি করে। তাঁর মুলকথা ছিল, 'ঈশ্বর বা আল্লাহ্ এক।"

["No other religion in history spread so rapidly as Islam. The West has widely believed that this surge of religion was made possible by the sword. But no modem scholar accept this idea, and the Quran is

www.pathagar.com

explicit in the support of the freedom of Conscience. Like almost every major prophet before him, Muhammad fought shy of serving as the transmitter of God's word sensing his own inadequacy. But the Angel commanded 'Read'. So far as we know Muhammad was unable to read and write, but he began to dictate those inspired words which would soon revolutionize a large segment of the earth. There is one God."]।

Washington Irving তার লিখিত ***Mahomet and His Succesors*** গ্রন্থে লিখেছেন, "তিনি ছিলেন আত্মনিয়ন্ত্রিত, পানাহারে অত্যন্ত সংযমী এবং রোজা রাখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর। পোশাক-পরিচ্ছদে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাধারণ। ব্যক্তিগত ব্যবহার ও আচার-আচরণে তিনি ছিলেন সৎ। বন্ধু বান্ধব এবং অপরিচিত, ক্ষমতাবান ও নিঃস্ব, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই তার নিকট থেকে সমান সম্মানজনক ব্যবহার পেতেন। যুদ্ধে ক্ষেত্রে বিজয়ে তাঁর মধ্যে দেখা যেত না কোন অহঙ্কার, কেননা ঐসব যুদ্ধও সংঘটিত হত ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যে। সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগের সময়ও তিনি সরল ও সহজভাবে জীবন যাপন করতেন। যদি তিনি সার্বজনীন সাম্রাজ্য কামনা করতেন তাহলে তা হত বিশ্বাসের সাম্রাজ্য।" ["He was sober and abstemious in his diet and a rigorous observer of fasts. He indulged in no magnificence of apparel, the ostentation of a petty mind; neither was his simplicity in dress affected but a result of real disregard for distinction from so trivial a source. In his private dealings he was just. He treated friends and strangers, the rich and poor, the powerful and weak, with equity, and was beloved by the common people for the affability with which he received them and listened to their complaint. His military triumphs awakened no Pride nor vain glory, as he would have done had they been effected for selfish purposes. If he aimed at a universal dominion, it was the dominion of faith."]

Alphonse de Lamartaine তার ***Historie de la Turquie,*** Paris, 1854 গ্রন্থে লিখেছেন, "ইচ্ছাকৃত হোক অথবা হোক অনিচ্ছাকৃত কখনো কোন ব্যক্তি এমন মহত্তম লক্ষ্য স্থির করে অগ্রসর হননি, কেননা এই লক্ষ্য ছিল অতিমানবীয়, মানুষ এবং তার সৃষ্টিকর্তার মধ্যে কিছু কুসংস্কারকে দূর করে ঈশ্বরকে মানুষের কাছে আনা এবং মানুষকে ঈশ্বরের নিকটে নিয়ে যাওয়া। জাগতিক এবং বিকৃত পৌত্তলিকতার বিশৃঙ্খলার মধ্যে যুক্তিবাদী এবং স্বর্গীয় ভাবনার যোগসূত্র স্থাপন করা। কখনো কোন মানুষ এমন বিশাল কাজে হাত দেননি এত স্বল্প মূলধন নিয়ে, কেননা মুহাম্মদের (সা.) এমন কাজের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করার

www.pathagar.com

জন্যে তিনি এবং মরুভূমির এক প্রান্তে কিছু সংখ্যক বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ ছিলেন না। চূড়ান্ত পর্যায়ে কখনো কোন মানুষ বিশ্বে এত বড় এবং স্থায়ী বিপ্লব ঘটাতেও সক্ষম হননি। কেননা দুইশো বছরের কিছু কম সময়ের মধ্যে ধর্মে ইসলাম এবং বাহুবলে সমগ্র আরব দেশ এর আওতায় আসে এবং আল্লাহর নামে বিজিত হয় পারস্য, খোরাসান, ভারত, সিরিয়া, ইজিপ্ট, আবিসিনিয়া, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন এবং গলের কিছু অংশ। যদি লক্ষ্যের বিশালত্ব, মাধ্যমের স্বল্পতা এবং বিস্ময়কর ফল এই তিনের মানদণ্ডে কোন প্রতিভাবান মানুষের বিচার করা হয় তাহলে মুহাম্মদের সাথে কোন বিরাট মানুষের তুলনা হয় না।"

["Never has a man set for himself, Voluntarily or involuntarily, a more sublime aim, since this aim was super human; to subvert superstitions which had been imposed between his creators, to render God unto man and man unto God; to restore the rational and sacred idea of divinity amidst the chaos of the material and disfigured gods of idolatry then existing, Never has a man undertaken a work so far beyond human power with so feeble means, for he (Muhammad) had in the conception as well as in the execution of such a great design, no other instrument than himself and no other aid except a handful of men living in a corner of the desert. Finally, never has a man accomplished such a huge and lasting revolution in the world, because in less than two centuries afer its appearance, Islam, in faith and in arms, reigned over the whole of Arabia, and conquered, in God;s name, Persia Khorasan, Transoxania, Western India, Syria, Egypt, Abyssinia, all the known continent of Northern Africa, numerous islands of the Mediterranean sea, Spain and Parts of Gaul."]।

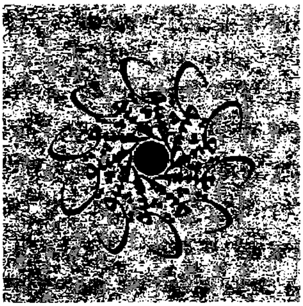

www.pathagar.com

রাসূল [সা] আমার

মুস্তাফা জামান আব্বাসী

গ্রন্থটি দল মেলছে ধীরে, যা স্বপ্ন হয়ে ছিল আমার মনে। মদিনায় যেন ছুটে এসেছে পৃথিবীর চারদিক থেকে শত শত বঞ্চিত শিশু। তারা স্থান করে নিয়েছে নবীর পায়ের কাছে। সত্যের সন্ধানে এসেছে তারা। আসল সত্য কি। কোন সত্য মানুষকে চোখে দেখেনি তারা। আজ নিজের চোখে দেখবে তারা সত্য মানুষের শেষ শয্যা। বাধা দেয়নি কেউ। লাগেনি পাসপোর্ট ভিসা। মহা আনন্দ নিয়ে শুনছে তাদের প্রিয় নবীর কথা। সুন্দর, শান্ত, সবুজ গম্বুজের তলায় এসে মন ভরে গেছে তাদের। বলা হবে এখানে নবীর কথা, শোনা হবে সেই সব নাত যা লিখে গেছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কিছু কবি, নবীর উদ্দেশ্যে নাত লিখেছেন যারা। তারা : হাসসান ইবনে সাবিত [রা], শেখ সাদি [রা], হাসান বুসাইরি [রা] ও কাজী নজরুল ইসলাম। নবীর প্রিয় কবি সাবিত। রাসূল [সা] বসে আছেন আর সাবিত সুললিত কণ্ঠে আবৃত্তি করছেন তার নিজের সদ্য লেখা। নবী আনন্দে আপ্লুত।

পৃথিবীর নানা প্রান্তে আজ অকারণে শিশুদেরকে হত্যা করা হচ্ছে ইসলামের নামে, যা একটি ভয়ংকর ফিতনা। কয়েক দিন আগে পেশোয়ারে হত্যা করা হয়েছে ১৩০ জন স্কুলের ছেলেমেয়েকে। এই হত্যা হয়েছে ইসলামের নামে, অথচ আমাদের প্রিয় রাসূল [সা] ছিলেন ভালবাসার আধার। যেখানেই মানুষ বঞ্চিত, নিগৃহীত, সেখানেই রাসূল [সা]-এর ভালবাসা এসে আমাদের মালিন্য ও অভাব পূরণ করে দেয়। জগতে চলছে যে হানাহানি, সম্পদ, ভূখন্ড, ধর্মের নানা ছোটখাটো সংঘাত নিয়ে, তার মাঝে ভালবাসার আশ্রয় নেই নবী ছাড়া। নিরূপায় হয়েই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটে এসেছে মদিনায়, যেন এখানেই তাদের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। তার সামনে খেলা করছে, গান গাইছে, আর রাসূল [সা]-এর স্নেহ চুম্বনে হচ্ছে অভিষিক্ত।

এ আমার মায়ার খেলা, যা প্রত্যক্ষ করেছি কল্পনার চোখে। তারা যখন গান ধরেছে সেই ফাঁকে ফিরে গেছি ইতিহাসে, অবগাহন করে এসেছি নবীর সেই

www.pathagar.com

সময়ের দেশ, যেটি ছিল শুধু মরুময়। যেদিকে তাকাব শুধু মরুভূমি, আর মাঝে মাঝে ছোট ছোট গাছ, সেখানে উট চরিয়ে ফিরছে ছোট ছোট শিশুরা। সে দৃশ্য এখনো আছে, যদিও মক্কা মদিনা গেছে বদলে। বড় বড় ইমারত দাঁড়িয়ে আছে সেখানে নব্যযুগের নতুন হাজীদের বরণ করে নিতে। আর আমি আছি সেই পুরনো দিনে, পুরনো গানে, পুরনো স্মৃতি নিয়ে। নবী শিশুদের যে কতখানি ভালবাসেন তার উপলব্ধি নিয়ে। যাতে নতুনরা পেতে পারে তার ভালবাসার স্পর্শ, পেতে পারে তার জীবনকে নিজ উপলব্ধির মধ্যে।

রাসূল [সা]-এর পদপ্রান্তে বসে আছি, এই অনুভূতিটুকুই আমার সম্বল। নবী বলেছেন, আমার কবরকে উপাসনালয় বানিও না, যেমনটি করেছে আগের নবীর উম্মতরা। আমাকে সম্মান করবে, কিন্তু তা কখনই উপাসনার পর্যায়ে নয়। সিজদা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যে প্রাপ্য, আর কারো নয়। এই অনুভূতি নবীর উপদেশটুকু মান্য করেই। যেন নাতি নাতনি ও প্রিয়জনরাও সেই অনুভূতিটুকুর মর্যাদা দিতে পারে। নজরুল ইসলাম যখন লিখতেন মদিনাকে নিয়ে তার অনুভূতি, এতখানি আচ্ছন্ন করে যে মুহূর্তে মদিনায় পৌঁছে যাই, খুঁজতে থাকি নবীর কদম, যে পথ দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন তিনি, খুঁজি সেই খেজুর গাছের ছায়া, যেখানে তার উট গিয়ে থেমে গিয়েছিল। অনুভূতি মরে না, কেয়ামতের শেষ দিন পর্যন্ত থাকবে তা অক্ষুণ্ণ। কেউ দেখিনি তাকে, অথচ অনুভূতিতে কত কাছের। পিতা তার পুত্র-কন্যাকে যতখানি ভালবাসেন নবী তার চেয়েও ভালবাসেন তার উম্মতদের, সত্যপথের সন্ধানী থাকার জন্যে তিনি চিরজাগ্রত, উম্মতের প্রতি ভালবাসায় তার নেই এতটুকু ঘাটতি। এই অনুভূতিটুকু যেন অক্ষুণ্ণ থাকে এই হৃদয়ে, এটাই প্রার্থনা।

ঈমান তাজা করতে এসেছি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে করে। যেন তাদের ঈমানও তাজা হয়। এই তো তাকে দেখতে পাচ্ছি, তার সমগ্র জীবন ছায়াছবির মত সামনে দিয়ে খেলা করে যাচ্ছে।

সূর্য যখন প্রবেশ করে একটি কাঁচের জানালা দিয়ে কাঁচটি পরিষ্কার হলে আলোর প্রবেশ হয় অবারিত, তেমনি নূরের প্রবেশের জন্যে হৃদয়কে করতে হয় পরিষ্কার, প্রতিনিয়ত জিকির ও দরুদ দিয়ে। যারা রাসূল [সা]-এর বাণী মানিনি, তাদের জন্যে কাজী নজরুল ইসলাম নবীর কাছে ফরিয়াদ করেছেন সমস্ত মানবতার হয়েঃ 'তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ, ক্ষমা কর হযরত
ভুলিয়া গিয়াছি তব আদর্শ তোমার দেখানো পথ।...
মোরা ভুলে গিয়ে তব উদারতা, সার করিয়াছি ধর্মান্ধতা
বেহেশত হতে ঝরে নাক' আর তাই তব রহমত'। #

www.pathagar.com

তিনি আছেন পৃথিবীর সব জনপদে

জয়নুল আবেদীন আজাদ

শিশিরভেজা ফুলের মতো
কোমল কিছুতো আমি কোথাও দেখিনি।
পাহাড়ের পাদদেশে শায়িত কৃষ্ণ পাথরের মতো
সহিষ্ণু বস্তুতো আমি আর কোথাও স্পর্শ করিনি।

সাগরের সফেদ ঊর্মিমালার মতো
অলৌকিক গতিতো আমি আর কোনো দ্রম্নতিতে দেখিনি।
অমাবস্যার অন্ধকার রাতে
প্রদীপের আলোর মতো সৌন্দর্য আমি আর কিছুতে পাইনি।

বৈশাখের ঝড়ো হাওয়ায় স্থির ও সৌম্য অবয়বে
অবিচল দাঁড়িয়ে থাকে শতাব্দীর যে বিটপী,
তেমন ধ্রম্নপদী দৃশ্যতো এ চোখ আর কোথাও দেখেনি।

তবে একজন মানবের দিকে যখন তাকাই
মুহূর্তেই মনে হয় পৃথিবীর সব পুষ্প, কৃষ্ণপাথর,
ঊর্মিমালা, প্রদীপ কিংবা সৌম্য ও সৌন্দর্যের সব নির্যাস
শিলীভূত হয়ে আছে এখানে- মরুআরবে জন্মেও তিনি আছেন
এই বাংলার হৃদয়ে এবং পৃথিবীর সব জনপদে।

www.pathagar.com

একটি অন্যরকম প্রার্থনা

আসাদ বিন হাফিজ

সৌদি বাদশাহর আমন্ত্রণে গিয়েছিলাম হজে।
মিনার নবনির্মিত রাজপ্রাসাদের দরবার হলে
দেখা হলো বাদশাহর সাথে।
পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত
কয়েক লক্ষ হাজীর মধ্য থেকে
নির্বাচিত কয়েকশো প্রতিনিধির সামনে
বক্তব্য রাখলেন তিনি।
মুসলিম উম্মাহর মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করে
দোয়া করলেন। সেই ভাষণ ভাষান্তরিত হয়ে
চলে এলো আমাদের হাতে হাতে।

আমার চোখে তখন ভাসছিল
পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মার খাওয়া নির্যাতীত
অসহায় মুসলিম বনি আদমের রক্তাক্ত ছবি।
আল্লাহ তো তার কালামে মুসলমানদের
মদদ করার ওয়াদা করেছেন।
তবে কেন আমাদের প্রার্থনা কবুল হচ্ছে না?
কেন দুনিয়াব্যাপী মার খাচ্ছে মুসলমানরা?
যাবতীয় আধিপত্যবাদ অস্বীকার করে
আল্লাহর আধিপত্য মেনে নেয়ার নাম মুসলিম।
আমরা কি তবে অবচেতন মনে
অন্য কারো আধিপত্য মেনে নিচ্ছি?
পৃথিবীর মুসলিম শাসকরা কি তবে আল্লাহর চাইতে
আমেরিকাকে বেশী ভয় পায়?
নাকি গুটিকয় ইহুদীর ভয়
তাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে?

তাহলে এই নামাজ, রোজা,
এই হজ, জাকাত কি কাজে আসবে?
তবে কি নিষ্ঠাবান খোদাভীরু লোককে

www.pathagar.com

ক্ষমতায় না আনা পর্যন্ত আমরা
প্রকৃত মুসলমানই হতে পারবো না?

আমি তখন 'আমিন, আমিন' বলা ভুলে গিয়ে
বলে উঠলাম, মাবুদ, সারা দুনিয়ায় বছর ভরে
প্রতিদিন তোমার কাছে মুসলিম মিল্লাতের
মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করে প্রার্থনা করা হচ্ছে।
পবিত্র কাবার গিলাফ ধরে কাঁদছে তোমার হাবীবের উম্মত।
তাহলে কি সবই নিস্ফল হবে?

তাহলে সবার আগে আমাদের সেই শক্তিই দান করো,
যাতে দেশে দেশে তোমার খাঁটি বান্দাদের
ক্ষমতায় বসিয়ে আমরা প্রমাণ করতে পারি, আমিও মুসলিম।
আর আমি যদি মুসলিম হই তাহলে আমাদের অন্তরের
লালিত স্বপ্ন ও কামনাগুলো মুখে উচ্চারণ করার আগেই যেন
তোমার শাহী দরবারে কবুল হয়ে যায়।
আর আমাদের ওপর যেন ঝরতে থাকে
তোমার অবিশ্রান্ত করুণাধারা,
রহমতের প্রশান্তি-বৃষ্টি যেন ধুয়ে দেয় সব আবিলতা।

যমজ কবিতা

মুকুল চৌধুরী

সবুজ গম্বুজের আলো-ছায়া : এক
বসে আছি মাছ হয়ে আলোর উৎসবে–

সবুজ গম্বুজের আলো-ছায়া, বসে আছি মাছ হয়ে আলোর উৎসবে।
বিজন-নির্জনে যেনো অদৃশ্যে বসে এক মাছের শিকারী
বড়শি ফেলেছে, টোপ তার ইশকের অপরূপ দানা
চায় সে তো আরো সুস্বাদু; আমি মাছ খাদ্যলোভী
অবিশ্রাম ঘুরছি এই পুষ্পময় অতল অথইয়ে।
সবুজ গম্বুজের আলো-ছায়া, জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে রহস্যের অনন্ত ফোয়ারা।

www.pathagar.com

আলো তার আলোর মোহনা, বিচ্ছুরিত অচিন্ত্য আলোক।
রঙ তার বহুবর্ণ, তবু রঙধনু নয় সে-তো
আলো তার দিগন্ত-উৎসারী, তবু চন্দ্রালোক নয় সে মতো
সুবাস অমৃতসম, তবু বসুধা শিহরণে আমূল উন্মাদ
দৃষ্টি তার অভয়ের, তবু কেনো ভয়শূন্য নয় কোলাহল।
আলো তার তবে কী হে অভিন্ন মোহনা, বিস্ফারিত অমর্ত্য গোলক।

আলো যেনো আলো নেই, হয়ে গেলো প্রসন্ন মাছের ছায়া আশ্চর্য উচ্ছ্বাসে।
যতোবার ডুবে যাই ততোবার দেখি সেই ছায়া
যতোবার ভেসে উঠি ততোবার সবুজ গম্বুজ
হাতছানি দিয়ে ডাকে, যেনো এক প্রোজ্জ্বল পাহারা
হৃদয় অবধি বেঁধে নিতে চায় তার লাল-নীল রঙিন রশ্মিতে।
মাছ শেষে নির্ভয়ে মিশে গেলো রশ্মিজ্জ্বোল বহুবর্ণ সৌন্দর্য প্লাবনে।

সবুজ গম্বুজের আলো-ছায়া : দুই
মাছ ঘুরে ভর দিয়ে অলখ ডানায়–

মাছ ঘুরে পানির অতলে, আকাশের মতন অলোকসুন্দর!
আশেপাশে অপূর্ব সংবাদ– ঐ দেখো চন্দ্রকে ঘিরে সমুজ্জ্বল তারকারা;
ঐ দেখো– বেহুঁশ মাছেরা। আরও শোনো বিনয় মিশ্রিত সুর,
যেনো 'বানাত সুয়াদ'– পড়ছেন সবিনয়ে দণ্ডিত 'কাব। ঐ শোনো–
বুরদা'র নজরানা; বু'সিরীর গিরিশিখর উজল করা অজর অশ্রুধারা।
সাদীও গাইছেন তাঁর অমর পঙক্তিমালা, 'সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি...'
মাছ ঘুরে; ভারতের তোতা পাখি আমীর খসরুর সাথে দেখা। গাইছেন,
'রাত্রে যেখানে ছিলাম আমি, বলতে পারবো না কেমন জায়গা ছিল...।'
শামস-ই তাবরিজের হাত ধরে রুমীও তৎপর। ঐ তো ইকবাল,
বাঙলার এক কবির কব্জি ধরে তরবারির মতো চমকাচ্ছেন।

মাছ ঘুরে অবিভক্ত অমরতায়, ভর দিয়ে বরাভয়ে
আবেগের অলখ ডানায়। দেখা হয় বহুবর্ণ মাছের মিছিল।
দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যায়, দেখে– ওয়ায়েস করণীর যুগান্তরের দান।
দেখে শাহজালাল; জালালুদ্দীন তাবরিজী জায়নামাযেই দাঁড়িয়ে আছেন।

www.pathagar.com

মাছ ঘুরে এক কলরবে স্পন্দিত প্রেমের উদ্যানে।
মাছ ঘুরে আলোর স্রোতনাদে তৃপ্ত এক অনন্য আকাশে।

রাত্রিশেষ, সহসাই সন্তর্পণে ফিরে এসে দেখে....
মাছ নয়,
মানুষের শ্বাস ধরে সবুজ গম্বুজের আলো-ছায়ায়
বসে আছে পিপাসা-নির্বাণ এক প্রশান্ত হৃদয়।

ফুলের উপমা

নাসির হেলাল

প্রতিদিন ফোটে ফুল, ফোটে অগণিত বেশুমার
সৌরভ ছড়ায় কত, ভরে যায় পুলকিত মন
আকাশ বাতাস সব নেচে ওঠে, নেচে ওঠে বন
গোলাপ চামেলী জুঁই ফোটে ফুল হাজার হাজার।

বেগুনি লাল গোলাপী সাদা কত রংয়ের বাহার
রং দেখে মনে হয় ঠিক যেন মানুষের মন
বিচিত্র ফুলের হিয়া খুঁজে ফেরে রসিক সুজন
কখনোবা গুঁজে দেয় প্রিয়তম খোপাতে·প্রিয়ার।

ওষ্ঠের তিলের মত প্রিয় হয় ফুল কারো কাছে
মেতে ওঠে পাখি সব আর মাতে সৃষ্টি যত আছে
আমোদিত পরিবেশ, আনন্দিত লোক শত শত
ফুলের মহিমা গান গেয়ে যায় মন তাই নাচে।

আরব মরুর বুকে ফুটেছিল চাঁদসম ফুল
ফুলের উমপা তুমি প্রাণপ্রিয় মুহাম্মদ রাসূল।

www.pathagar.com

রাসূলের জন্য ভালবাসা

তমসুর হোসেন

স্বজন হারানোর দু:সহ কষ্ট বুকে নিয়ে দিবস রজনী
লাখো মানুষের ভীড়ে খুঁজে ফিরি আমার সুপ্রিয় মুর্শিদ, প্রাণের রাসূলকে
আপনজনের বিরহে কঠিন হৃদয় মানুষও যেমন বেদনায় ভেঙ্গে পড়ে
তেমনই শোক জর্জর অন্তরে তালাশ করি দয়াল নবীকে।

শুনেছি তিনি মৃত্যুবরণ করেননি সাধারণ মানুষের মত
খোদার ইচ্ছায় ইহজগত থেকে পরজগতে অন্তরীণ হয়েছেন মাত্র
তাঁর রওজায় প্রতিদিন অগণিত আশেকান উম্মতের লেখা হয় নাম
কবরে শুয়েও তিনি কেঁদে আকুল হন পথহারা মানুষের শোকে।

তাঁর দেখানো পথ সহজ সরল সুখকর এবং অনাবিল শান্তিতে ভরা
তাঁর নির্মল বাণী, পরিশুদ্ধ আচার এবং সংগত অনুমোদন
বিশ্বাসী মানুষের জন্য নির্ভেজাল পথ নির্দেশনা
পাপাচ্ছন্ন ধরণীতে তিনি এসেছেন মহাসত্যের কল্যাণকর বার্তা নিয়ে
কামনা তাঁর পথহারা মানুষের মুক্তি ও সাফল্য
মানুষের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন তিনি লা-শারীক খোদার পরিচয়।

www.pathagar.com

নারী জাতির মুক্তিদূত মহানবী [সা]

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান

মহানবী মুহাম্মাদ [সা] সর্বশ্রেষ্ঠ মানব এবং নবী-রাসূলদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠতম। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সুপরিকল্পিত সৃষ্টি জগতে মহানবীকে [সা] সর্বশেষ নবী হিসাবে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য হেদায়াত ও মানবজাতির সর্বোত্তম আদর্শ রূপে দুনিয়ায় প্রেরণ করেন। এতৎসত্ত্বেও তিনি একজন মানুষ ব্যতীত আর কিছু নন। দুনিয়ার অন্যসব মানুষের যেভাবে জন্ম এবং মৃত্যু, তাঁর জন্ম-মৃত্যুও সেভাবেই। তাঁর খাওয়া-দাওয়া, চাল-চলন, বিয়ে-শাদী তথা সমগ্র জীবন-যাপন পদ্ধতিতে তিনি ছিলেন একজন সাধারণ মানুষের মতোই। বরং তাঁর জন্ম হয়েছে এতিম হিসাবে, অর্থাৎ জন্মের ছয় মাস পূর্বেই তাঁর পিতার ইন্তেকাল ঘটে এবং তিনি যখন মাত্র ছয় বছর বয়সের বালক তখন তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। শিশুকালে দাদা আব্দুল মুত্তালিব এবং দাদার মৃত্যুর পর চাচা আবু তা'লিবের অপৈত্য স্নেহে তিনি লালিত-পালিত হন। আরবের সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে তাঁর জন্ম হলেও আর্থিক সমৃদ্ধি সে সংসারে ছিল না। জন্মের পর আরবের তৎকালীন প্রথানুযায়ী তিনি এক দরিদ্রতম ধাত্রী হালিমার গৃহে প্রতিপালিত হন। কারণ তিনি পিতৃহীন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করায় বেশী প্রতিদান পাওয়ার প্রত্যাশী ধাত্রীগণ তাঁকে গ্রহণে আগ্রহী ছিল না।

এভাবে আজন্ম নানা প্রতিকূল অবস্থা, দু:সহ দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বের মধ্যে মহানবীর [সা] শৈশব, কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত হয়। নবুওত প্রাপ্তির পর তাঁর জীবনের আরেক পর্যায় শুরু হয়। নানা অত্যাচার, উৎপীড়ন, জুলুম-নির্যাতন, মিথ্যা অপবাদ ও কুৎসায় তাঁকে সীমাহীন দু:খ-কষ্ট সহ্য করতে হয়। এমনকি, এক পর্যায়ে তাঁকে স্বগৃহ-স্বজাতি-স্বদেশ পরিত্যাগ করে হিজরত করতে হয় মদীনায়। আল্লাহ্ তা'য়ালা যাঁকে মানবজাতির সর্বোত্তম করে দুনিয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর মর্যাদা দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তিনি ইচ্ছা করলেই তাঁকে সচ্ছল অবস্থায়, প্রতিপত্তিশালী করে দুনিয়ায় পাঠিয়ে তাঁর দ্বীন প্রচারের কাজকে সহজ করে দিতে পারতেন। কিন্তু তাহলে মানবিক আদর্শ হিসাবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার

www.pathagar.com

করতে অনেকের মনেই দ্বিধার সঞ্চার হতে পারতো। তাই যিনি হলেন মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম আদর্শ এবং সমগ্র সৃষ্টির জন্য রহমতস্বরূপ, আল্লাহ্ তাঁকে সৃষ্টি করলেন এতিম ও দরিদ্র করে। যাতে তিনি দুনিয়ার সকল শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত, দু:খী অসহায় মানুষের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হন এবং তাদের মুক্তির অগ্রদূত হিসাবে কাজ করতে পারেন। নিদারুণ দারিদ্র্য আর কঠোরতম অত্যাচারের মুখেও তিনি মানবতার উজ্জ্বলতম আদর্শ প্রদর্শন করে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিরন্তর নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। বাতিল শক্তিকে পরাস্ত করে দুনিয়ায় তিনি আল্লাহর দ্বীন কায়েম করে গেছেন। পাপ-পঙ্কিল বিশ্বকে তিনি দ্বীনের পবিত্র আলোকে সমুদ্ভাসিত করেছেন। নিপীড়িত, অধিকার-বঞ্চিত, অধ:পতিত মানুষকে তিনি দেখিয়েছেন মুক্তি-পথের উজ্জ্বল দিগন্ত। অভিশপ্ত মানুষ মানবতার অমলিন পথের সন্ধান পেয়ে ধন্য হয়েছে। এজন্য স্বয়ং আল্লাহ তাঁকে 'রাহ্মাতুল্লিল আলামীন' অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টির জন্য পরম রহমত স্বরূপ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি কেবল মানবজাতি নয়; সমগ্র সৃষ্টি-জগতের জন্যই আল্লাহ তা'য়ালার বিশেষ রহমত স্বরূপ। তিনি কেবল আরব দেশের নবী নন, তামাম দুনিয়ার নবী! তিনি কেবল আরব জাতির রাসূল নন, সমগ্র মানবজাতির রাসূল [সা]। তিনি কেবল মুসলিম জাতির রাসূল নন, সমগ্র মানবজাতির সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল [সা]। তিনি কেবল সমকালীন মানুষকে সৎ পথ প্রদর্শন করেননি, সর্বকালীন মানুষের জন্য তিনি এক অভ্রান্ত সত্য পথ-প্রদর্শনকারী। তিনি কেবল পুরুষদের পয়গম্বর নন, নারী জাতিরও পয়গম্বর। চির অবহেলিত নারী জাতিকে তিনি যথার্থ মানবিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে গেছেন।

মহানবীর [সা] আর্বিভাবের সময় দুনিয়ার অবস্থা ছিল সর্বদিক দিয়ে অত্যন্ত শোচনীয়। সে সময়কে ইতিহাসে 'আইয়ামে জাহেলিয়াত' বা অন্ধকার যুগ বলে অভিহিত করা হয়েছে। কেবল আরব জাতি নয়, দুনিয়ার সর্বত্র সমগ্র মানবজাতিই তখন অজ্ঞানতা ও পাপ-পঙ্কিলতার গভীর আবর্তে নিমজ্জিত ছিল। পরিচিত পৃথিবীর নিকট আমেরিকা তখনো ছিল অপরিজ্ঞাত এবং আদিম, অসভ্য, বর্বরদের লীলা-ক্ষেত্র। ইউরোপীয়দের অনেকেই তখনো ছিল বন্য মানুষ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলো থেকে বঞ্চিত।

প্রাচীন সভ্যতার দেশ নামে পরিচিত ভারতীয় উপমহাদেশের অবস্থাও ছিল অতিশয় করুণ। বিশেষত নারীদের এখানে কোনই মর্যাদা ছিল না। ভারতীয় রমণীদের ধর্মগ্রন্থ স্পর্শ করার অনুমতি না থাকলেও দেবতাদের মনস্তুষ্টির জন্য অনেক সময় তাদেরকে বলিদান করা হতো। মন্দিরের সেবাদাসী হিসাবে তথা পুরোহিত ও মন্দিরগামীদের জৈবিক লালসা পরিতৃপ্তিতে তাদেরকে যথেচ্ছা

www.pathagar.com

ব্যবহার করা হতো। স্বামী বা পিতামাতার সম্পত্তিতে মেয়েদের কোন অধিকার ছিল না। জাতিভেদ প্রথা ও যৌতুক প্রথার কারণে কুলীন ব্রাহ্মণগণ অনেক ক্ষেত্রে অসংখ্য মেয়েকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করে তাদের সতীত্বনাশের অবাধ অধিকার ভোগ করতো। সামাজিক সংস্কারের কারণে সমাজ, পরিবার জীবনের যে কোন অকল্যাণ বা অশুভ বিষয়ের জন্য অসহায় নারীদেরই দায়ী করে তাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলা হতো। এছাড়া, মেয়েদেরকে কেবল অপবিত্র জ্ঞান করাই নয়, মেয়েদের আত্মা আছে কিনা সে সম্পর্কেও সন্দেহ করা হতো। পৌত্তলিক সমাজে নর-নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় অগ্নিদেবতাকে সাক্ষী রেখে। বিবাহের শপথ বাণী উচ্চারণের সময় এটা বিশেষভাবে বলা হয় যে, স্বামী স্ত্রীর দেবতা। স্ত্রী স্বামীর দাসী। এছাড়া, বিয়ের সময় মেয়ের বাবা-মাকে পণ প্রদান করা বাধ্যতামূলক। অনেক ক্ষেত্রে পণের পরিমাণ এত বেশি থাকতো যে, এ কারণে দরিদ্র পিতা-মাতাকে মেয়ের বিয়েতে সম্পূর্ণ নি:স্ব হতে হতো। পণ প্রথাকে এজন্য হিন্দু সমাজে এক দুর্বিষহ অভিশাপ মনে করা হয়।

সন্তান প্রসবের জন্য মায়ের জন্য একটি পৃথক অস্থায়ী আঁতুড় ঘর নির্মিত হতো। সেখানে তাকে নি:সঙ্গ অবস্থায় অনেক দিন থাকতে হতো। ঐ সময় তাকে অপবিত্র জ্ঞান করা হতো এবং রান্না-বান্না ও ঘর-সংসারের কোন কিছুই তাকে স্পর্শ করতে দেয়া হতো না। আঁতুড় ঘরের বাইরে যাওয়াও তার জন্য নিষিদ্ধ ছিল। হিন্দু সমাজে একদিকে বাল্যবিবাহের ব্যাপক প্রচলন ছিল অন্যদিকে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। মনুর সংবিধানে শিশু কন্যাকে আট বছর বয়সের মধ্যে বিয়ে দেয়ার বিধান রয়েছে। এ বয়সে শিশু কন্যার বিয়েকে 'গৌরীদান' বলা হয়। তাই আটের অধিক বয়স হওয়ার পূর্বেই মেয়েদেরকে পাত্রস্থ করা ধর্মীয় বিধান হিসাবে গণ্য হতো। মনুর শাস্ত্রে পূণবির্বাহের বিধান নেই। এছাড়া, বিধবাকে প্রতি মাসে একাদশীতে উপবাস করতে হয়। নির্দিষ্ট ধরনের সাদামাটা সামান্য খাদ্য এবং মোটা থান-কাপড়ে তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। কোন সামাজিক অনুষ্ঠান, বিয়ে-শাদী বা হাসি-আনন্দের অনুষ্ঠানে তার যাওয়া নিষেধ। কারণ সে অপয়া, অচ্ছূৎ। তার দর্শন বা ছায়া মাড়ানোও অশুভ বা অকল্যাণ। অতএব, পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ-কোলাহল, সুখ-সম্ভোগ থেকে বঞ্চিতা বিধবার জন্য হিন্দুধর্ম স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে জীবন্ত সহ-মরণের ব্যবস্থা দিয়েছে। অনেক বিধবা বৈধব্যের যন্ত্রণা থেকে নিস্কৃতি লাভের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় সহ-মরণের পথ বেছে নিত। যারা এতে অনিচ্ছা প্রকাশ করতো তাদেরকে জোর করে মৃত স্বামীর চিতায় তুলে দিয়ে জীবন্ত দাহ করা হতো।

www.pathagar.com

এভাবে দেখা যায়, হিন্দু সমাজে স্ত্রীজাতির কোন মর্যাদাই ছিল না। তাদেরকে ভোগের সামগ্রী এবং সংসারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী গণ্য করা হতো। মেয়েদের চেয়ে গৃহপালিত গোজাতি বরং হিন্দু সমাজে অনেক বেশি পবিত্র ও মর্যাদার অধিকারী। হিন্দু সমাজে নারীজাতির এরূপ অমর্যাদা ও করুণ অবস্থার কারণে কন্যাশিশু জন্মদানকারী মাতাকে অনেক সময় ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়। অনেকে কন্যা শিশুর জন্ম প্রতিরোধের চেষ্টাও করে থাকেন। আধুনিক যুগে এ প্রবণতা অনেক বেশি লক্ষ্য করা যায়।

খ্রীস্টধর্মে বিবাহ বন্ধন অবিচ্ছেদ্য। কোন অবস্থায়ই তালাক দেবার রীতিকে তারা বৈধ মনে করে না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত ও অসম বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে দাম্পত্য-জীবনে কলহ, অশান্তি ও নানারকম হৃদয়-বিদারক ঘটনার সৃষ্টি হয়। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জীবনই হয় ব্যর্থ।

আরব দেশে পাপ, দুর্নীতি, ব্যভিচার এবং সর্বপ্রকার সামাজিক উচ্ছৃংখলতা ছিল সর্বব্যাপক। নারী ছিল সেখানে ভোগের সামগ্রী, পণ্য দ্রব্যের ন্যায় বাজারে তাদের দৈহিক সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করে বিক্রয় করা হতো। স্বামী বা পিতা-মাতার সম্পত্তিতে তাদের কোনই অধিকার ছিল না। পুরুষ যত খুশী বিয়ে করতে অথবা নারী-সঙ্গ লাভ করতে পারতো। স্বামীর সংসারে তারা ছিল দাসীর ন্যায়। মেয়েদের শালীনতা বা সামাজিক মর্যাদা তেমন কিছুই ছিল না। পুরুষদের মজলিশে নৃত্য-গীত ও শরাব পরিবেশন করা এবং নানারূপ মনোরঞ্জন করাই ছিল তাদের কাজ। ফলে কন্যা সন্তানের জন্মকে অনেকে অমর্যাদাকর মনে করে আত্মসম্মান রক্ষার্থে জন্মের পর মেয়ে সন্তানদের হত্যা করে ফেলতো।

এভাবে দেখা যায়, সমগ্র দুনিয়া জুড়ে তখন যে অন্ধকারের রাজত্ব চলছিল, তার যুপকাষ্ঠে নারীদেরকেই অধিক লাঞ্ছনা-দুর্গতি ভোগ করতে হয়েছে। এ জাহিলিয়াতের যুগে আল্লাহর নবী এলেন মহামুক্তির পয়গাম নিয়ে। সমগ্র মানবজাতিকে তিনি অন্ধকারের আবর্ত থেকে টেনে তুলে মুক্তির উজ্জ্বল দিগন্তে নিয়ে এলেন। সমগ্র মানবজাতি আনন্দে গান গেয়ে উঠলো, বন্দী মানবাত্মা চিরমুক্তির আস্বাদন পেল; নিগৃহীত ও যুগ-যুগান্তর ধরে অবহেলিত নারীজাতি পেল সত্যিকার মুক্তি ও যথার্থ মানবিক মর্যাদা। যে নারীজাতিকে এতদিন পর্যন্ত পুরুষের যথেচ্ছা ভোগের সামগ্রী বিবেচনা করা হতো, যাদের জন্মকে অভিশাপ গণ্য করা হতো সে নারীজাতি সম্পর্কে মহানবী [সা] ঘোষণা করলেন, 'মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশত'। অর্থাৎ মায়ের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন, তাঁর সেবা-যত্ন করে মনস্তুষ্টি বিধান করা সন্তানের অপরিহার্য কর্তব্য। দুনিয়ার ইতিহাসে মায়ের জাতের জন্য এমন বিপ্লবী ঘোষণা ইত:পূর্বে আর কেউ উচ্চারণ

www.pathagar.com

করেননি। মায়ের জাতকে এরচেয়ে অধিক বা উচ্চতর মর্যাদা পৃথিবীর অন্যকোন ধর্ম, দর্শন বা আদর্শ দিয়েছে বলে জানা যায় না। মহানবীর উপরোক্ত ঘোষণায় আল্-কুরআনের নির্দেশ প্রতিফলিত হয়েছে, যেখানে বিশ্ব-স্রষ্টা পিতা-মাতার যথার্থ মর্যাদা ও তাঁদের প্রতি সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণ করেছেন এভাবে : 'তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করতে ও পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে ধমক দিও না, তাদের সাথে কথা বলো সম্মানসূচক নম্র ভাষায়। মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করো এবং বলো, 'হে আমার প্রতিপালক, তাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন'। [সূরা বনী ইসরাইল আয়াত : ২৩-২৪]।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে মাতা-পিতার মর্যাদা ও তাদের প্রতি সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির আনুগত্য সর্বোচ্চ। তাই উপরোক্ত আয়াতে প্রথমে স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ও তাঁর ইবাদত করার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এরপরই পিতা-মাতার খেদমত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ থেকে ইসলামে পিতা-মাতার সম্মান ও মর্যাদা কত বেশি তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

পিতা-মাতার খেদমতের ব্যাপারে মহানবীর [সা] সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। এ সম্পর্কে বহু সংখ্যক হাদীসের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইসলাম পিতা ও মাতা উভয়েরই সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে। তবে পিতার চেয়ে মাতার মর্যাদা অনেক বেশি। এ প্রসঙ্গে মহানবীর [সা] একটি সুপ্রসিদ্ধ হাদীসের উল্লেখ করা যায়। হাদীসটি বিশিষ্ট সাহাবী আবু হুরাইরাহ [রা] বর্ণিত এবং বুখারী ও মুসলিম শরীফের অন্তর্ভূক্ত।

'এক ব্যক্তি রাসূলকে [সা] জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার নিকটাত্মীয়ের মধ্যে আমার ওপর সর্বাধিক অধিকার কার?' মহানবী [সা] জবাব দিলেন, 'তোমার মায়ের।' সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, 'অত:পর কে?' মহানবী [সা] বললেন, 'তোমার মা।' তিনি জানতে চাইলেন 'অত:পর কে?' মহানবী [সা] এবারও বললেন, 'তোমার মা।' উক্ত ব্যক্তি আবার প্রশ্ন করলেন 'অত:পর কে?' এবারে মহানবী [সা] বললেন, 'তোমার বাবা।'

উক্ত হাদীস থেকে মায়ের সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে জানা যায়। ইসলাম মায়ের মর্যাদাকে বাবার চেয়ে অন্তত তিনগুণ অধিক প্রদান করেছে। দুনিয়ার কোন ধর্ম বা সমাজে মায়ের এত অধিক সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হয়নি। এ থেকে

www.pathagar.com

নারীজাতির সম্মান ও মর্যাদাকে ইসলাম কত বেশি গুরুত্ব দিয়েছে তা উপলব্ধি করা যায়।

আরব দেশে যে সময় কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়াকে অভিশাপ মনে করা হতো এবং নবজাত শিশুকে গলা টিপে হত্যা করা হতো অথবা জীবন্ত প্রোথিত করা হতো সে নিষ্ঠুর বর্বর সমাজেই মহানবীর [সা] বিপ্লবী ঘোষণা এলো, 'যে ব্যক্তি দুই বা ততোধিক কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছে এবং উপযুক্তভাবে লালন-পালন করে সৎপাত্রস্থ করেছে সে নিশ্চয়ই জান্নাতবাসী।' এ ঘোষণার ফলে মেয়েরা বাপ-মায়ের নিকট অভিশাপের বদলে নিয়ামত রূপে গণ্য হয়। আরবের জাহিলী সমাজে কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হওয়াকে অভিশাপ মনে করা বা তাকে মেরে ফেলার ব্যাপারে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে মহান স্রষ্টা বলেন: 'তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় থেকে আত্মগোপন করে। [সে চিন্তা করে] হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে দেবে! সাবধান! তারা যা করে তা কত নিকৃষ্ট।' [সূরা নাহ্‌ল, আয়াত : ৫৮-৫৯]।

আল-কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ্‌ কঠোর হুঁশিয়ারীর সুরে বলেন: 'এবং যখন জীবিত কবরস্থ মেয়েদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কোন্ অপরাধে তাদেরকে মেরে ফেলা হয়েছিল?' [সুরা তাকবীর, আয়াত : ৮-৯]।

ইসলাম-পূর্ব সমাজে নারী যেখানে পুরুষের নিছক ভোগের সামগ্রী বিবেচিত হতো, ইসলাম সেখানে নারী ও পুরুষকে সমান মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিকভাবে উভয়ের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করেছে। আল্লাহ বলেন: 'হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তা থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন [সৃষ্টি করেন] এবং আল্লাহকে ভয় কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট [অধিকার] দাবি কর, এবং সতর্ক থাক সে উদর সম্পর্কে [যে তোমাকে ধারণ করেছে] আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।' [সূরা নিসা, আয়াত: ১]

ইসলাম নারী ও পুরুষকে কেবল জন্মগত দিক থেকেই সমদৃষ্টিতে দেখে তাই নয়, মানবিক অধিকার ও মর্যাদার দিক থেকেও উভয়কেই সমান দৃষ্টিতে দেখে। বরং তুলনামুলকভাবে নারী তার মাতৃত্ব এবং মাতৃত্বকালীন দু:সহ ক্লেশ ভোগের কারণে পুরুষের চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী। যে মাতা কত কষ্ট করে তাঁর উদরে সন্তান ধারণ করেন এবং ভুমিষ্ট হবার পর শিশুকালে তাকে সযত্নে লালন-

www.pathagar.com

পালন করেন ইসলাম তাঁর মর্যাদাকে সকল মানুষের উপরে স্থান দিয়েছেন। মানব-বংশের বিস্তার এবং গর্ভকালীন ও শিশুকালীন সেবা-যত্ন, লালন-পালন মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আন্জাম দেয়ার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়েরই ভূমিকা রয়েছে। তবে নারীর ভূমিকা যে অনেক বেশি তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এ কারণে স্রষ্টার বিধানে সংগতভাবেই পুরুষের চেয়ে নারীকে অধিক মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। নারী-পুরুষ উভয়ের সমমর্যাদার ক্ষেত্রে আরেকটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো এই যে, আল-কুরআনের যে কোন স্থানে আল্লাহ্ যখন ঈমানদারদের সম্বোধন করে কিছু বলেছেন, তখন শুধু পুরুষদেরকেই নয়, নারী এবং পুরুষ উভয়কে স্বতন্ত্রভাবে একই সাথে সম্বোধন করেছেন। যেমন : 'মু'মিন নর-নারী একে অপরের বন্ধু, এরা সৎকার্য করার নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্যের নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের [সা] আনুগত্য করে, এদেরকেই আল্লাহ্ অনুগ্রহ করবেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ্ মু'মিন নর ও নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের।' [সূরা তাওবা, আয়াত : ৭১-৭২]

'অবশ্য আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সওম পালনকারী পুরুষ ও সওম পালনকারী নারী, যৌন অংগ হিফাযতকারী পুরুষ, যৌন অংগ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী-এদের জন্য আল্লাহ্ রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল [সা] কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার নেই। কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে [সা] অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রান্ত হবে।' [সূরা আহযাব, আয়াত : ৩৫-৩৬]।

ইসলামের দৃষ্টিতে পুরুষ ও নারী যে সমান মর্যাদার অধিকারী, আল্লাহ্র নিকট যে এদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই তা এখানে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। মানব সৃষ্টির ধারাকে অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে পুরুষ ও নারীকে স্বতন্ত্র দৈহিক বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে। নারী-পুরুষের সমানাধিকার সম্পর্কে মহানবী [সা] তাঁর বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক ভাষণে সমগ্র বিশ্ববাসীকে সম্বোধন করে ঘোষণা করেন : 'তোমাদের ওপর তোমাদের স্ত্রীদের কিছু হক আছে। অনুরূপভাবে তাদের ওপরেও তোমাদের সুনির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে।... স্ত্রীদের সাথে তোমরা সদ্ব্যবহার কর। কারণ তারা যে তোমাদেরই অনুগত। নিজেদের জন্য তারা কিছুই

www.pathagar.com

করতে পারে না। সুতরাং তারা তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ রাখবে কারণ আল্লাহর নামেই তোমরা তাদেরকে হাসিল করেছো এবং তাঁর নামেই তোমাদের জন্য তারা হালালরূপে গণ্য হয়েছে। সুতরাং তাদের কল্যাণ সাধনের ব্যাপারে তোমরা আমার নছিহত [উপদেশ] গ্রহণ কর।'

মানব-সভ্যতার ইতিহাসে নারীজাতির সমানাধিকার, তাদের মর্যাদা ও যথাযথ কল্যাণ বিধানের এমন সুস্পষ্ট গ্যারান্টি অন্য কোন ধর্ম, আদর্শ, দর্শন বা সমাজ-ব্যবস্থা দিতে আদৌ সক্ষম হয়নি। বিশ্ব-স্রষ্টা নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করে তাদের পরস্পরের মধ্যে গভীর আকর্ষণ সৃষ্টি করে মানব সমাজে অনাবিল শান্তি প্রতিষ্ঠার সুব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ্ এ সম্পর্কে বলেন: 'এবং তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।' [সূরা রূম, আয়াত : ২১]

এভাবে প্রেম-ভালবাসা, মায়া-মহব্বত ও পারস্পরিক সমঝোতা ও সহানুভূতির ভিত্তিতে সুখী, শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠাই মহান রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্য। তবে কোন কারণে পারস্পরিক সমঝোতা ও মহব্বত সৃষ্টি না হলে অথবা দাম্পত্য জীবন শান্তিপূর্ণ না হয়ে অসহনীয় ও অশান্তিপূর্ণ হলে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবার অধিকারও ইসলামে স্বীকৃত। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীকে তালাক দেবার অধিকার যেমন স্বামীর রয়েছে, স্বামীকে তালাক দেবার ক্ষেত্রে স্ত্রীকেও অনুরূপ অধিকার দেয়া হয়েছে। স্ত্রীকে সমানাধিকার ও সমমর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস: 'সর্বোত্তম সম্পদ হলো আল্লাহকে স্মরণকারী জিহ্বা, কৃতজ্ঞ অন্তর ও মু'মিনা স্ত্রী যে আল্লাহর পথে স্বামীকে সাহায্য করে।' [তিরমিযী শরীফ]। দ্বিতীয় হাদীসটিতে মহানবী [সা] পুরুষদের ভাল-মন্দ বিচারের মাপকাঠি প্রদান করেছেন স্ত্রীদের হাতে। তিনি বলেন: 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম।'

মহানবীর [সা] আবির্ভাবের পূর্বে আরবসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পুরুষরা ইচ্ছামত যে কোন সংখ্যক স্ত্রী বা কামসঙ্গী রাখতে পারতো। বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে তখন কোন পবিত্রতার সম্পর্ক ছিল না। বিয়ের ব্যাপারে মেয়েদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন মূল্য ছিল না। পুরুষরা ইচ্ছামত তাদেরকে পত্নী বা উপপত্নী হিসাবে গ্রহণ করতো আবার ইচ্ছামত তাদেরকে পরিত্যাগ করতো। এমন কি, অনেক সময় ক্রীতদাসীর ন্যায় তাদেরকে বিক্রি করে দিত। মহানবী [সা] ইসলামের বিধান মুতাবিক মেয়েদেরকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে-শাদী দেয়া নিষিদ্ধ করলেন এবং অবস্থাভেদে শর্তসাপেক্ষে সর্বাধিক চারজন পর্যন্ত স্ত্রী

www.pathagar.com

গ্রহণের অনুমতি প্রদান করলেন। শর্তগুলো এই যে, স্ত্রীর অসুস্থতা বা অন্য কোন সঙ্গত কারণে পুরুষ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে। তবে শর্ত হলো, স্বামী সমতার ভিত্তিতে তাদের প্রত্যেকের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবে, প্রত্যেক স্ত্রীর হক আদায় করবে এবং সকল ক্ষেত্রে তাদের ব্যাপারে আদল [ন্যায়ানুগ ব্যবস্থা] কায়েম করবে। অন্যথায় একজন স্ত্রী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

তাই দেখা যায়, ইসলাম শর্ত-সাপেক্ষে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিলেও মুসলিম সমাজে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ বিরল ঘটনা হিসাবেই পরিদৃষ্ট হয়। ইসলামে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ কোন প্রথা নয় বরং শরীয়তের বৈধ সীমা যা বিভিন্ন যৌক্তিক শর্তের দ্বারা স্ত্রীর মর্যাদা ও অধিকারকে অক্ষুণ্ন রেখেছে। এক্ষেত্রে আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ: 'নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের; কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে।' [সূরা বাকারা, আয়াত : ২২৮]

উপরোক্ত আয়াতে নারী-পুরুষের পারস্পরিক অধিকার সমান বলে ঘোষণা দেয়ার পর নারীর ওপর পুরুষের অধিক মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা কারো মানবিক অধিকার ক্ষুণ্ন করা নয়, বরং সামাজিক ও পারিবারিক ভারসাম্য রক্ষার্থেই একথা বলা হয়েছে। একাধিক ব্যক্তি মিলিত হয়ে কোন কাজ করতে হলে সেখানে একজনকে অবশ্যই প্রধান বা নেতা মানতে হবে, নতুবা বিশৃংখলা সৃষ্টি হতে বাধ্য। স্বামী-স্ত্রীর সংসার বা পরিবারে দৈহিক, অর্থোপার্জন, অভিভাবকত্ব, পরিবারের বাইরে অন্যদের সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ রক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয়ে প্রকৃতিগতভাবেই পুরুষের প্রাধান্য রয়েছে। মূলত পুরুষই পরিবারের হাল ধরে যথাযথভাবে তা পরিচালনার দায়ভার গ্রহণ করে থাকে। এক্ষেত্রে নারী অবশ্যই তার অন্তরঙ্গ এবং অপরিহার্য সহযোগী। কিন্তু যে কোন পরিবারে পুরুষের নেতৃত্বের ভূমিকা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এটা একান্তই স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত। এ অর্থেই নারীর ওপরে পুরুষের মর্যাদার কথা উল্লিখিত হয়েছে।

একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে স্বামীর ব্যবহার কীরূপ হবে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন : 'তোমরা কোন একজনের [স্ত্রী] দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না ও অপরকে [অন্য স্ত্রী] ঝুলানো অবস্থায় রেখো না।' [সূরা নিসা, আয়াত : ১২৯]।

উপরোক্ত আয়াতে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ব্যবহার যাতে ন্যায়সঙ্গত হয়, তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কখনো এক স্ত্রীর প্রতি বেশি আকৃষ্ট না হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে স্বামীকে অবশ্যই সকল স্ত্রীর প্রতি সমতা ও ন্যায়ানুগ আচরণ করতে হবে। তার ফলে পরিবারে শান্তি, সৌহার্দ ও

www.pathagar.com

পারস্পরিক সহানুভূতি-সহযোগিতার পরিবেশ বিরাজ করবে। আয়াতের শেষাংশের ব্যাখ্যায় এটাও ধারণা করা চলে যে, কোন স্ত্রীর প্রতি স্বামী অসন্তুষ্ট হলে এবং কোনভাবেই একত্র বসবাস সম্ভব না হলে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে তালাক দিয়ে তাকে তার পছন্দমত স্বামী বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়া যেতে পারে। কিন্তু কোন অবস্থায়ই জোর করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রেখে কারো হক নষ্ট করা উচিত নয়। এরদ্বারা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকের ব্যক্তি অধিকার, পছন্দ-অপছন্দ ও স্বাধীনভাবে নিজ নিজ জীবন গড়ার অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য মহানবী [সা] আল্লাহর তরফ থেকে মহিলাদের জন্য তাদের বিয়ের দেনমোহর এবং স্বামী ও পিতার সম্পত্তিতে তাদের অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। মহানবীর [সা] আবির্ভাবের পূর্বেও আরবে বিয়েতে মেয়েদেরকে দেনমোহর দেবার নিয়ম ছিল। কিন্তু মূলত সে দেনমোহর ছিল বিক্রয় মূল্য সমতুল্য। সে দেনমোহর মেয়েদের বাবারাই গ্রহণ করতো এবং স্বামীরা দেনমোহর দিয়ে মেয়েদেরকে পণ্য দ্রব্যের মত ক্রয় করে নিতো। বিয়ের পর মেয়েদের কোন স্বাধীনতাই থাকতো না, স্বামীরা যেভাবে খুশী তাদের ব্যবহার করতো এবং প্রয়োজনে অন্যের নিকট বিক্রিও করে দিতে পারতো। নারীদের ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে কিছুই ছিল না। কিন্তু মহানবী [সা] মেয়েদের বিয়ের দেনমোহর তাদের নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিলেন। এতে তাদের বাবা বা স্বামীর কোন অধিকার নেই। এছাড়া, বিয়ের আগে অথবা পরে তাদের নিজস্ব কোন সম্পদ থাকলে বা অর্জিত হলে সেটা এবং তা বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা ইত্যাদি সব কিছুতেই ইসলাম মেয়েদের অধিকার সুনিশ্চিত করেছে। তাছাড়া, পিতা-মাতা ও স্বামীর সম্পত্তিতেও মেয়েদের নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে। অবশ্য এ অংশ ছেলেদের সমান নয়। পিতা-মাতার সম্পত্তিতে কন্যার অংশ পুত্রের অংশের অর্ধেক এবং স্বামীর সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ স্ত্রীর প্রাপ্য। এটা একান্ত ন্যায়সঙ্গত। কারণ মেয়েরা সংসার পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে না। পিতা-গৃহে পিতা অথবা ভ্রাতা, স্বামী গৃহে স্বামী অথবা পুত্রের উপর পরিবারের ভরণ-পোষণ ও সকল দায়-দায়িত্ব ন্যাস্ত থাকে। এ ব্যাপারে ইসলাম যথাক্রমে পিতা, ভ্রাতা, স্বামী ও সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং তা যথাযথভাবে পালনের নির্দেশ প্রদান করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মেয়েদের স্বাধীন ব্যক্তিত্বের বিকাশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও মানবিক মর্যাদাবোধ সমুন্নত রাখার জন্য ইসলাম নারীদেরকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার দান করেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালার সুস্পষ্ট ঘোষণা: 'হে

www.pathagar.com

ঈমানদারগণ! নারীদেরকে জবরদস্তি তোমাদের উত্তরাধিকার গণ্য করা বৈধ নয়; [জাহিলী যুগে আরবদেশে ওয়ারিসগণ পরিত্যক্ত সম্পত্তির ন্যায় মৃত ব্যক্তির স্ত্রী/স্ত্রীদেরকে জবরদস্তি অধিকার করে নিত। তার বা তাদের সম্পত্তি থাকলে সেটা হস্তগত করার উদ্দেশ্যে মোহর না দিয়েই বিয়ে করত অথবা বিয়ে না করেই আটকিয়ে রাখতো। আর অন্যত্র বিয়ে দিলেও দেনমোহর নিজেরা আত্মসাৎ করতো। এ আয়াতে এ ধরনের জুলুম নিষিদ্ধ করা হয়েছে।] তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছো তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকিয়ে রেখো না, যদি না তারা প্রকাশ্য ব্যভিচার করে। তাদের সাথে সৎভাবে জীবন-যাপন করবে।' [সূরা নিসা, আয়াত : ১৯]।

উপরোক্ত আয়াতে জাহিলী যুগে আরব দেশে নারীর প্রতি যেসব অত্যাচার-নির্যাতন হতো অথবা বিভিন্নভাবে তাদের মর্যাদা ও অধিকার ক্ষুণ্ন করা হতো, সে সব রহিত করে নারীর মর্যাদা-সম্মান ও অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরবর্তী আয়াতে [২০ নং আয়াত] আল্লাহ্ বলেন: 'তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির কর এবং তাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাক, তবু তা থেকে কিছু প্রতিগ্রহণ করো না' [দাম্পত্য জীবন দুর্বিষহ হলে ন্যায়সঙ্গতভাবে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ হতে পারে। কিন্তু স্বামী দেনমোহর বা অন্য কোন সামগ্রী স্ত্রীকে দিয়ে থাকলে তা ফিরিয়ে নিতে পারবে না।]

দেনমোহর স্ত্রীর হক। স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পূর্বেই দেনমোহর আদায় করা বিধেয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ্র নির্দেশ : 'এবং তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর স্বত:প্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে সন্তুষ্ট চিত্তে তারা মোহরের কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বচ্ছন্দে ভোগ করবে।' [সূরা নিসা, আয়াত : ৪]।

পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের যেমন অংশ রয়েছে, নারীদেরও তেমনি অংশ রয়েছে। আল্লাহ বলেন : 'পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের যেমন অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, তা অল্পই হোক আর বেশীই হোক, এর নির্ধারিত অংশ সম্পর্কে বিস্তারিত ও স্পষ্ট নির্দেশ আছে।'

তালাকের অধিকারও নারীদের মৌলিক মানবিক অধিকারের অন্তর্গত। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ককে ইসলাম এক অতি পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বন্ধন মনে করে। ইসলাম যে কোন মূল্যে এ বন্ধন টিকিয়ে রাখার জন্য স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে যথাযথ সমঝোতামূলক আচরণ করতে এমন কি, তাদের আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীদেরকেও এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালনের নির্দেশ দেয়। কিন্তু কোন

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে দাম্পত্য জীবন যদি দুর্বিসহ হয়ে পড়ে এবং স্বামী-স্ত্রী একত্র ঘর-সংসার করতে একান্ত অপারগ হয়, তাহলে ইসলাম উভয়কেই শালীনতা ও সমঝোতার মধ্যে তালাক বা বিচ্ছেদের অধিকার দিয়েছে। অবশ্য বৈধ হলেও এটা আল্লাহর নিকট অতিশয় অপছন্দনীয়।

ইসলাম নারীজাতির মান-সম্ভ্রম ও ইজ্জতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ইসলাম-পূর্ব যুগে নারীকে শুধু ভোগের পণ্য হিসাবে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু ইসলাম নারীকে পণ্য হিসাবে নয়, বরং পুরুষের সহযোগী হিসাবে বিবেচনা করে। সহযোগী হিসাবে ইসলাম নারীর পূর্ণ মানবিক মর্যাদা, অধিকার ও ইজ্জতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিক্ষা দেয়। সেকালে যুদ্ধ-বন্দী রমণীদের বিজয়ী বাহিনীর লোকেরা যথেচ্ছা উপভোগ করতো। এমনকি, আধুনিক উন্নত সভ্যতার যুগেও যুদ্ধকালে অথবা সংকটকালে অবলা নারীদের উপর তথাকথিত সভ্যতাগর্বী পুরুষেরা পাশবিক কাম-ক্ষুধা চরিতার্থ করে থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে, ভিয়েৎনাম যুদ্ধের সময়, সাম্প্রতিক কালে বসনিয়া-হার্জেগোবিনা, ফিলিস্তিন, ইরাক, সিরিয়া, কাশ্মীর প্রভৃতি যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকায় নারী-নির্যাতনের এ পাশবিক দৃশ্য বিশ্ব-বিবেককে নিয়ত ক্ষত-বিক্ষত করছে। কিন্তু মহানবীর [সা] সময়কালে সংঘটিত প্রতিটি যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে যেসব বিধর্মী নারী বন্দী হয়েছে, রাসুলুল্লাহ [সা] তাদের ইজ্জতের পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছেন। এমনকি, তাঁর শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে খুলাফায়ে রাশিদীন তথা- সকল দ্বীনদার মুসলিমই সর্বদা নারীর ইজ্জতের পূর্ণ হিফাজত করেছেন। ইসলাম সর্বাবস্থায় নারীর ইজ্জতকে সমুন্নত করার শিক্ষা দেয়।

মহানবীর [সা] হাদীস 'বিদ্যাশিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরয।' বিদ্যাশিক্ষা বা জ্ঞানার্জন ব্যতীত যেমন প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না, তেমনি প্রকৃত মুসলিম হওয়ার জন্যও বিদ্যাশিক্ষা বা জ্ঞানার্জন অপরিহার্য। 'মুসলিম' অর্থ আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারী। আল্লাহ্ কী, কেন তাঁর প্রতি আত্মসর্ম্পণ করা প্রয়োজন, আত্মসমর্পণের পর একজন মুসলিমের দায়িত্ব-কর্তব্য কী এবং কীভাবে সে দায়িত্ব কর্তব্য পালন করা হবে, তা জানতে হলে অবশ্যই শিক্ষার প্রয়োজন। এজন্যই স্রষ্টার পক্ষ থেকে রাসূলের [সা] প্রতি প্রথম যে ওহী নাযিল হয়, তা হলো 'ইকরা' অর্থাৎ 'পড়'। এরপর ধীরে ধীরে রাসূলের [সা] ওপর আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ বিধান অর্থাৎ আল-কুরআন নাযিল হয়। আল-কুরআন হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য প্রদত্ত গাইডবুক বা আসমানী কিতাব। এ কিতাব পাঠ ও অনুসরণের মাধ্যমেই প্রকৃত মুসলিম হওয়া সম্ভব। এছাড়া, মহান স্রষ্টা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন।

www.pathagar.com

বিদ্যাশিক্ষা বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনার দ্বারাই মানুষ এ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে। অতএব, ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব অনেক বেশি। আর এ শিক্ষা নর ও নারী উভয়ের জন্যই একান্ত প্রয়োজন। তাই আল্লাহর রাসূল [সা] পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যই বিদ্যাশিক্ষা অর্জন ফরয হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন।

পাশ্চাত্যে নারী-মুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত হয় উনবিংশ শতকে। তখন পর্যন্ত সেখানে সামাজিক, রাজনৈতিক তথা আইনগতভাবে নারীর কোন অধিকার স্বীকৃত ছিল না। সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীজাতি বিভিন্ন জুলুম, নির্যাতন ও অবিচারের শিকার ছিল। তখন ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের কারণে শ্রমিক সমাজের মধ্যে অধিকার সচেতনতার সৃষ্টি হয়। সে সূত্রে অধিকার বঞ্চিত নারী সমাজও তাদের অধিকার সম্পর্কে কিছুটা সচেতন হয়ে ওঠে। তখন থেকে ক্রমান্বয়ে আন্দোলনের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের নারী সমাজ তাদের বহুবিধ অধিকার আদায়ে সক্ষম হয়েছে।

সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আইনগত প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারীর অধিকার আজ সেখানে বহুলাংশে স্বীকৃত হলেও সর্বক্ষেত্রে নারী সমাজ সেখানে বৈষম্যের হাত থেকে এখনো মুক্তি পায়নি। তাছাড়া, নারী-স্বাধীনতার নামে সেখানে আজ অবাধ যৌন-মিলন, অশ্লীলতা, অনাচার, নৈতিক অধঃপতন ও সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টি হয়ে সমাজ ও সভ্যতার ভিতকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার এ পতনোন্মুখ অবস্থা দেখে পাশ্চাত্যের জ্ঞানী-গুণী মনীষীরাও আজ অনেকেই আতংকগ্রস্ত। অথচ আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে ইসলাম নারীর যথার্থ মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করে নারীজাতিকে তার যোগ্যতা ও প্রতিভা বিকাশের সম্যক সুযোগ দিয়েছে। নারীর এ মর্যাদা ও অধিকার তার স্বভাব-প্রকৃতি ও চাহিদার সাথে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও মহানবীর [সা] প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থায় নারীর এ মর্যাদা ও অধিকারের বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত ও বাস্তবায়িত হয়েছে। পাশ্চাত্য সমাজ তথা সমগ্র বিশ্ব বর্তমানে নারী-মুক্তি ও নারীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয়। এক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে যে মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে, সেটাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা হলে নারীজাতির যথার্থই মুক্তি ও কল্যাণ সাধিত হবে।

পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মাবলম্বীর মধ্যেই প্রাচীন কাল থেকে এরূপ বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে যে, নারী অশুভ শক্তির প্রতীক। সকল অন্যায়, পাপ ও অনাচারের জন্য প্রধানত নারীরাই দায়ী বলে তাদের ধারণা। আদমের [আ] স্বর্গ-চ্যুতির জন্যও তারা ইভকেই [মা হাওয়া] দায়ী করে থাকেন। তাদের ধারণা ইভের প্ররোচনায় আদম নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হন। কিন্তু ইসলাম এ ধারণা

www.pathagar.com

থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। ইসলাম নর এবং নারী উভয়কেই দুনিয়ায় আল্লাহর খলীফা হিসাবে সুউচ্চ মর্যাদা দিয়েছে। আশরাফুল মখলুকাত অর্থাৎ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হিসাবে পুরুষ যেমন সম্মানিত, নারীও ঠিক সমভাবেই সম্মানিতা। এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনই প্রভেদ নেই। আদমের [আ] স্বর্গচ্যুতির জন্য ইসলাম মা হাওয়াকে [আ] অভিযুক্ত করে না। এ সম্পর্কে মহান স্রষ্টা বলেন: 'অত:পর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল; সে বললো, হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা?' অত:পর তারা সেটা থেকে [নিষিদ্ধ ফল] ভক্ষণ করলো, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজদেরকে আবৃত করতে লাগলো। আদম তার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করলো, ফলে সে ভ্রমে পতিত হলো।' [সূরা তাহা, আয়াত : ১২০-১২১]।

কুরআনের ভাষা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়, শয়তান আদমকে [আ] কুমন্ত্রণা দান করে এবং তার ফলে আদম [আ] ও হাওয়া [আ] দু'জনে একই সাথে নিষিদ্ধ ফল খেয়ে আল্লাহর হুকুম অমান্য করেন। পরিশেষে, এ অবাধ্যাচরণের জন্য আল্লাহ আদমের [আ] প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন, কেননা শয়তানের কুমন্ত্রণায় আল্লাহর আদেশ অমান্য করা বা ভুলে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকাই মুখ্য। এভাবে ইসলাম নারীজাতিকে এক বিশ্বজনীন কুধারণা ও ঐতিহাসিক ষড়যন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে।

ঐ একই কুধারণার বশবর্তী হয়ে পৃথিবীতে প্রচলিত অনেক ধর্মের অনুসারীদের ধারণা, নারীজাতি কখনো বেহেশতে যেতে পারবে না। ইসলাম এ কুধারণা ও পক্ষপাতমূলক আচরণের ঘোর বিরোধী। ইসলাম বেহেশতে যাওয়ার জন্য পুরুষ বা নারীর জন্য কোন আলাদা বা বৈষম্যমূলক মাপকাঠি নির্ধারণ করেনি। একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছাতেই নর-নারীগণ জান্নাত বা জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবেন। আল-কুরআন ও আল-হাদীস অনুযায়ী ঈমান ও নেক আমলই হবে এর প্রধান মাপকাঠি। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন : 'মু'মিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয় আনন্দময় জীবন দান করবো এবং তাদেরকে তাদের কাজের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করবো।' [সূরা নাহল, আয়াত : ৯৭]

স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে, আল্লাহর নিকট থেকে পুরস্কার লাভ বা জান্নাত পাওয়ার জন্য পুরুষ বা নারী হওয়া কোনই শর্ত নয়, মু'মিন বা মু'মিনা এবং সৎকর্মশীল বা সৎকর্মশীলা হওয়াই শর্ত। এভাবে ইসলাম পুরুষের সকল দর্প-অহংকার খর্ব করে নারী-পুরুষকে সম অধিকার ও মর্যাদা দান করেছে।

www.pathagar.com

ইসলাম নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রদানের সাথে সাথে নারী ও পুরুষ উভয়কেই রুচিশীল, শালীন ও সম্ভ্রমপূর্ণ পারিবারিক ও সামাজিক জীবন-যাপনের নির্দেশ দিয়েছে। এজন্য মহানবীর [সা] প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থা তথা ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলো :

এক. ইসলাম প্রাপ্ত-বয়স্ক নারী পুরুষের সম্মতিক্রমে বিয়েকে হালাল করেছে এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন সহজ ও সুলভ করে সুস্থ দাম্পত্য জীবন-যাপনকে উৎসাহিত করে থাকে। অন্যদিকে, জ্বিনা, ব্যভিচার ও চরিত্র-বিধ্বংসী প্রবণতা ও কাজের জন্য ইসলাম কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছে।

দুই. নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। কারণ এটাই ব্যভিচার, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা ও সকল অনাচারের মূল উৎস।

তিন. পর্দা প্রথাকে ইসলাম বাধ্যতামূলক করেছে। পর্দা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য বাধ্যতামূলক। ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য 'সতর' বা পোষাকের সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। সুস্থ, সম্ভ্রমপূর্ণ সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি ও সংরক্ষণের জন্য এটা অপরিহার্য।

চার. পুরুষ ও নারীর দৈহিক গঠন ও স্বভাব-প্রকৃতিতে যেমন সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান তেমনি তাদের কর্মক্ষেত্রও ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। যার যার পরিবেশে সর্বোচ্চ পারদর্শিতা, যোগ্যতা ও নৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগ ইসলাম পূর্ণ মাত্রায় প্রদান করেছে।

পাঁচ. ইসলামের পাঁচটি মৌলিক ইবাদত– কালেমা, নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত- পুরুষদের জন্য যেমন নারীদের জন্যও তেমনি ফরয। এমনকি, জিহাদে [এটাও ফরয ইবাদত] অংশগ্রহণে নারীদেরও অনুমতি রয়েছে। মহানবী [সা] এবং খুলাফায়ে রাশিদার যুগে পুরুষদের সাথে মহিলারাও জিহাদে শরীক হতেন। তবে সেখানে তাদের দায়িত্ব পুরুষদের থেকে ভিন্ন। জিহাদে অংশগ্রহণকারী পিতা-ভ্রাতা-স্বামী-ছেলেকে উৎসাহ প্রদান, খাদ্য-সামগ্রী প্রস্তুত, অস্ত্রাদির যোগান ও আহত সৈনিকের সেবা-যত্ন ইত্যাদি কাজেই তারা ব্যাপৃত থাকতেন। অবশ্য প্রয়োজনে বীর নারী খাওলার মত অস্ত্রধারণেও তারা দ্বিধা করেননি।

ইসলাম পুরুষ ও নারীকে পরস্পর সম্পূরক গণ্য করে। মর্যাদা, অধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার লাভের ক্ষেত্রে উভয়েরই অধিকার সমভাবে স্বীকৃত। পুরুষদের মত নারীদেরও সম্পত্তির অংশীদার ও মালিক হবার অধিকার আছে এবং পরিবার ও সমাজ গঠনেও তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ ভূমিকার

www.pathagar.com

সীমারেখাও ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এ সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিজ নিজ ভূমিকা পালনার্থে নারী ও পুরুষ উভয়কেই সামাজিক শালীনতা বজায় রাখতে হবে। এ শালীনতা বজায় রাখার জন্য নারীদের জন্য হিজাব বা পর্দা প্রথাকে ইসলাম বাধ্যতামূলক করেছে। মাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, কন্যা ইত্যাদি মর্যাদাবান ভূমিকা পালনের জন্য অবশ্যই নারীদের সম্ভ্রমপূর্ণ, শালীন আচরণ অত্যাবশ্যক। আর মর্যাদার দাবী হিসাবে পুরুষদের যেমন মহিলাদেরও তেমনি ইজ্জত, আব্রু, দৈহিক ও চারিত্রিক পবিত্রতা সংরক্ষণ অপরিহার্য। এরই প্রতীক হিসাবে আল-কুরআনে আল্লাহ্ নারীদেরকে সংযত ও আচরণকে সম্ভ্রমপূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন : 'হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মু'মিনদের নারীদের বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর টেনে দেয় [অর্থাৎ পর্দা করে] এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে; ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' [সূরা আহযাব, আয়াত : ৫৯]।

এ আয়াতের দ্বারা নারীদের জন্য পর্দা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং বেপর্দা মহিলা যে সামাজিক অনাচার সৃষ্টির উৎস সে সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। সামাজিক শালীনতা রক্ষার্থে পুরুষদের প্রতিও আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ: 'মু'মিনদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে, এটাই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।' [সূরা নূর, আয়াত : ৩০]।

মহিলাদের আচরণ ও পর্দা সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ আরো বিস্তারিত ও স্পষ্টভাবে বলেন: 'মু'মিন নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে, তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ [অলংকার বা আকর্ষণীয় পোষাক] প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেমন মাথার কাপড় [ওড়না বা চাদর জাতীয় পরিচ্ছদ] দ্বারা আবৃত করে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ [সচ্চরিত্রবান মুসলিম নারী], তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনারহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মু'মিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।' [সূরা নূর, আয়াত : ৩১]।

www.pathagar.com

পর্দা লজ্জা ও শালীনতার প্রতীক। এটাকে সম্ভ্রম ও পবিত্রতার প্রতীকও বলা যায়। স্বয়ং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল [সা]-এর পক্ষ থেকে এটাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অতএব, পর্দা প্রথাকে অমান্য করা বা এ সম্পর্কে বিভ্রান্তি ও বিরূপ ধারনাকারীদেরকে আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি স্মরণ করা উচিত: 'আল্লাহ্ ও রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লহ্ এবং তাঁর রাসূল [সা]কে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।' [সূরা আহযাব, আয়াত : ৩৬]।

পর্দা প্রথাকে যারা অমান্য করে তারা আল্লহ্ ও রাসূলেরই [সা] অবাধ্যতা করে এবং এর পরিণতি যে শুভ নয় দুনিয়াতেই আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি। সমাজের বহুবিধ অনাচারের মূল কারণ হলো বেপর্দা, বেহায়াপনা ও নারীর জৌলুসপূর্ণ দেহ-বল্লরীর নির্লজ্জ প্রদর্শনী যা প্রকারান্তরে মানুষকে অধিকতর পাপের দিকেই ঠেলে দেয়। অথচ পর্দা মানুষকে এ সকল পাপের হাত থেকে রক্ষা করে এবং শালীন ও পবিত্র সমাজ গঠনে সাহায্য করে। তাই পর্দাকে একটি সীমানার সাথে তুলনা করা চলে, যার এক পাশে পাপ, অশ্লীলতা, অপবিত্রতা ও নানারূপ অনাচার আর অন্যপাশে পবিত্রতা, শুভ্রতা ও শুচিতা বিরাজমান। কোনটি আমাদের জন্য ভাল বা কল্যাণপ্রদ তা সহজেই অনুমেয়।

নারী ও পুরুষ উভয়েই সমাজের অপরিহার্য দু'টি অঙ্গ। এরা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়; বরং সম্পূরক। এদের একজনকে বাদ দিয়ে অন্যজন চলতে পারে না। সুষ্ঠু সমাজ গঠনে উভয়েরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের প্রয়োজন রয়েছে। তাই উভয়ের সামাজিক মর্যাদা ও গুরুত্ব সমান। তবে উভয়ের কর্মক্ষেত্র অবশ্যই একটি যৌক্তিক সীমারেখায় বিভক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সমাজের সুস্থ ও উৎকর্ষিক বিকাশের জন্যই এটা প্রয়োজন। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ নারী স্বাধীনতার নামে জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আজ তাদের পরস্পরের মধ্যে যেন চলছে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রয়েছে সেখানে পুরুষের একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারের সম্ভাবনা। তাই সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে, প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দেয়া যুক্তি সঙ্গত নয়। প্রকৃতিগতভাবে যার যে ক্ষেত্রে যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ অধিক সে ক্ষেত্র তার জন্য নির্দিষ্ট রাখাই সঙ্গত।

আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা নারী-মুক্তির নামে নারীকে আজ বাজারের পণ্য-সম্ভারে পরিণত করেছে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে, বিপণী কেন্দ্রে, রেডিও, টিভি, ফ্যাশন শো, পত্র-পত্রিকা সর্বত্র মেয়েরা আজ তাদের রূপ-সৌন্দর্য ও দেহ বল্লরীর আকর্ষণ নিয়ে পুরুষের পশু-প্রবৃত্তি চরিতার্থে সমুপস্থিত। নারী-পুরুষের অবাধ

www.pathagar.com

মেলামেলার ফলে সমাজের নৈতিকতা আজ শিথিল হয়ে পড়েছে। বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতা বিনষ্ট হচ্ছে, দাম্পত্য-কলহ ও সংশয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিয়ের প্রয়োজনীয়তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে, জারজ সন্তানের জন্মহার বৃদ্ধি পাচ্ছে, সিঙ্গল প্যারেন্ট এবং অভিভাবকহীন সন্তানের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, নানা রকম কঠিন যৌন ব্যাধির প্রকোপ দেখা যাচ্ছে, আত্মহত্যা, দু:শ্চিন্তা ও প্রেম-ঘটিত নানা দুর্ঘটনা অহরহ সংঘটিত হচ্ছে। সর্বোপরি সমাজের শান্তি, শালীনতা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিনষ্ট হয়ে পড়েছে। মূলত নারী স্বাধীনতার নামে পুরুষ তার পশু-প্রবৃত্তির শৃংখলে নারীকে আবদ্ধ করে তার ইজ্জত-হুরমত, মর্যাদা ও অধিকারকে চরমভাবে লাঞ্ছিত ও পদদলিত করছে।

এ অসুস্থ, বিকারগ্রস্ত সমাজে মানবতাহীন বিধক্ষংসী চিত্র নতুন কিছু নয়। যুগে যুগে, বিভিন্ন অঞ্চলে আগেও এরূপ অবস্থা অবলোকন করা গেছে এবং যখনই ইতিহাসের যে কোন অধ্যায়ে মানবতা এমন মুখ থুব্‌ড়ে পড়েছে, তখনই আল্লহ্ তাঁর নবী-রাসূলগণদের পাঠিয়ে সে সমাজকে উদ্ধার করে মানবতার সুস্থ রাজপথে তুলে দিয়েছেন। এভাবেই মহান স্রষ্টা তাঁর রহমত ও নিয়ামতের দ্বারা মানব-সৃষ্টির ধারা ও সভ্যতার গতিকে অব্যাহত রেখেছেন।

আখিরী নবী মুহাম্মাদ [সা]-এর আবির্ভাবের পূর্ববর্তী দুনিয়ার অবস্থাও অনুরূপ শোচনীয় পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। মহানবী [সা] সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটালেন। নারীর অধিকার ও মর্যাদাকে তিনি সর্বোচ্চ স্থান দিলেন, নারীর মান-সম্ভ্রমকে দিলেন যথাযথ নিরাপত্তা। পুরুষের লালসার অগ্নি-স্পর্শ থেকে নারীকে রক্ষা করে তাকে দিলেন স্নেহময়ী কন্যা, আদরের বোন, দাম্পত্য বন্ধনে প্রেমময়ী প্রণয়িনী এবং মাতৃত্বের সর্বোন্নত মহিমাময় শ্রদ্ধার আসন। এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই সম্পর্কের পবিত্রতা ও অনুভূতির গভীরতা বিদ্যমান। ব্যক্তি, পরিবার ও সুস্থ সমাজ গঠনের জন্য এ ধরনের পারস্পরিক অনুরাগ ও প্রেমানুভূতিপূর্ণ সম্পর্কের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে।

ইসলামের আলোকে প্রতিষ্ঠিত মহানবীর [সা] সমাজে নারী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপের ফলে তৎকালীন নারী সমাজ শিক্ষার আলোকস্পর্শে স্বকীয় প্রতিভা বিকাশে সুযোগ পেয়েছে, নিজ নিজ পরিবেশে স্বাধীন মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে। বিবাহিত জীবনেও তারা স্বামীর সংসারে যথাযথ মর্যাদা ও অধিকার লাভ করে সুস্থ-সুন্দর পারিবারিক জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। মা হিসাবেও সন্তান লালন-পালন, গৃহের পরিচর্যা, পরিবারের দেখাশোনা তথা সমাজ-গঠনে তার দায়িত্ব পালনে সর্বক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান

www.pathagar.com

রেখেছে। তৎকালীন মুসলিম সমাজে ইসলামী অনুশাসন ও বিধি-বিধান পুরাপুরি কার্যকর থাকায় সমাজে অশ্লীলতা, ব্যভিচার, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, অসামাজিক-অনৈতিক আচার-আচরণ ও অসুস্থ-উচ্ছৃঙ্খল প্রবণতা ইত্যাদি বিকাশের কোন সুযোগ ছিল না। ফলে ঐ সময় এক সুস্থ-সুন্দর, কল্যাণময়, মানবিক উৎকৃষ্ট সমাজ গড়ে উঠেছিল।

তাই মহানবীর [সা] প্রতিষ্ঠিত সমাজ সর্বদিক দিয়ে একটি সর্বোত্তম আদর্শ সমাজ হিসাবে পরিগণিত। সে সমাজে পুরুষ যেমন স্ব স্ব প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন, অনেক নারীও তেমনি স্বীয় স্বতন্ত্র পরিবেশে স্বকীয় প্রতিভার সম্যক বিকাশ সাধন করে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাই মহানবী [সা] যথার্থই নারীজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ মুক্তিদূত। তিনি শুধু সমাজের আধিপত্যবাদী পুরুষ শ্রেণীর অন্যায় জুলুম নির্যাতন ও অবিচার থেকে নারীজাতিকে মুক্তি দিয়েছেন তাই নয়, বরং নারীর ন্যায্য অধিকার, মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার ও নিজেকে বিকশিত করে তোলার সার্বিক ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধান করেছেন। সর্বোপরি নারীর মান-সম্ভ্রম ও ইজ্জত-আব্রুকে সমুন্নত করে তাকে যথার্থ মানবিক মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন।

দুর্ভাগ্যবশত ইসলামের সে স্বর্ণযুগের অবসান ঘটেছে। বর্তমানে পাশ্চাত্য জগত জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে সারা বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে। সভ্যতার গর্বে গর্বিত পাশ্চাত্য সমাজ জাগতিক অনেক ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটাতে পারলেও নারীজাতির উন্নয়নে বা তাদের ন্যায্য অধিকার ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এখনো অনেক পিছিয়ে আছে। অন্যদিকে, তথাকথিত প্রগতিবাদী সমাজতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোতেও নারীজাতির ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা চরমভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। বর্তমানে মুসলিম বিশ্বেও নারীজাতি চরম দুরবস্থার সম্মুখীন। কারণ ইসলামের শিক্ষা এবং রাসূলুল্লহর [সা] আদর্শ মুসলিম সমাজে পুরোপুরি বাস্তবায়িত নেই। তবু পুঁজিবাদী পাশ্চাত্য সমাজ ও সমাজতান্ত্রিক প্রগতিবাদী সমাজের তুলনায় তুলনামূলকভাবে মুসলিম বিশ্বে নারীজাতির মর্যাদা ও অধিকার অনেকটা ভাল। অবশ্য এতে সন্তুষ্ট হওয়ার অবকাশ নেই। বিভিন্ন বিজাতীয় ও বৈদেশিক প্রভাবের কারণে ইতোপূর্বে পরাধীন মুসলিম বিশ্বে ধীরে ধীরে অনেক কুসংস্কার ও অনাচার ঢুকে পড়েছে। এগুলোর মধ্যে পণ প্রথা, যৌতুক, মেয়েদের অমতে বিয়ে দান, মেয়েদেরকে পিতা-মাতার সম্পত্তির প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি নানা অনৈসলামি রুসুম-রেওয়াজ বর্তমানে মুসলিম সমাজে অভিশাপ হিসাবে বিদ্যমান। ইসলামী বিধানের পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক বাস্তবায়নের দ্বারা মুসলিম সমাজের সকল অশিক্ষা-

www.pathagar.com

কুশিক্ষা, অনাচার, কুসংস্কার, অধ:পতন ও দুর্গতির যেমন অবসান ঘটানো সম্ভব, তেমনি এর দ্বারা নারীজাতির সার্বিক মুক্তি, কল্যাণ ও তাদেরকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করা সম্ভব। অতএব, স্রষ্টার বিধানের কাছে ফিরে আসার কোন বিকল্প নেই। স্রষ্টার বিধানের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নেই নারীজাতি তথা সমগ্র মানবজাতির মুক্তি ও কল্যাণ নির্ভরশীল।

নারীজাতির যথার্থ অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মহানবীর [সা] প্রদর্শিত পথই একমাত্র অভ্রান্ত পথ। যে মহান স্রষ্টা সমগ্র বিশ্ব-জগৎ, প্রাণীকুল ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, সে মহান সত্তাই মানবজাতির সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য সত্য সরল জীবন-ব্যবস্থা দ্বীন ইসলাম প্রেরণ করেছেন। আল্লহর দেয়া সে দ্বীন আল্লাহ্ তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ [সা]-এর মাধ্যমে কায়েম করে মানবজাতির মহামুক্তির শুভ্র দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। মহানবীর [সা] প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থায় সর্বশ্রেণীর মানুষ তার ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা লাভ করেছে। সর্বকালের মানুষের জন্যই তা এক অনুসরণীয় আদর্শ। পুরুষের জন্য যেমন, নারীদের জন্যও তেমনি। নারী-পুরুষ, বর্ণ-গোত্র, ভাষা, ধনী-নির্ধন সকলের জন্যই তা সর্বোত্তম আদর্শ।

দুনিয়ার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সবলের হাতে দুর্বল সর্বদাই শোষিত, বঞ্চিত ও অত্যাচারিত হয়েছে। দৈহিক ও স্বভাবগতভাবে নারী পুরুষের তুলনায় কিছুটা দুর্বল হওয়ায় তারা চিরকালই এ বঞ্চনা, শোষণ ও নিপীড়ন ভোগ করেছে। ইসলামের শাশ্বত জীবন-ব্যবস্থার ভিত্তিতে মহানবী [সা] সকল শোষণ, বঞ্চনা, উৎপীড়ন, বেইনসাফী দূর করে নারী তথা সর্বশ্রেণীর মানুষকে ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা দান করেছেন। তাই মহানবী [সা] শুধু নারীজাতির মুক্তিদূত নন; সমগ্র মানবজাতির মহামুক্তির অবিসংবাদিত মহানায়ক। এজন্য স্বয়ং বিশ্ব-স্রষ্টা তাঁকে 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টির জন্য তিনি রহমত স্বরূপ বলে আখ্যায়িত করেছেন। #

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ [সা.]-এর চরিত্র এক অনন্য মুজিযা

মনসুর আহমদ

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়শা [রা] রাসূল [সা]-এর চরিত্রকে তুলনা করেছেন পবিত্র কুরআনের সাথে। রাসূল [সা] ছিলেন চলন্ত কুরআন। কুরআনের ব্যাপকতা যেমন বিরাট, তুলনাহীন, তেমনি রাসূল [সা]-এর চরিত্র অতলান্ত সীমাহীন পারাবার। এ পারাবার পার হওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি এর তল থেকে অমূল্য রত্নরাজি আহরণ করা আরও দুরূহ ব্যাপার। তাই আমি নিজ প্রচেষ্টায় রাসূল [সা]-এর চারিত্রিক মু'জিযা না খুঁজে কিছু পন্ডিতের লেখার মাধ্যমে তার পবিত্র চরিত্রের সামান্য আলোকচ্ছটা পাঠকদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র। রাসূল [সা]-এর চরিত্রের প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ কুরআন মজিদে বিভিন্ন ভাবে পেশ করেছেন। শুরুতে কিছু আলোচনা করা যাক 'সীরাতে সরোয়ারে আলম'-এর অলোকে ।

নবী মুহাম্মাদ [সা]-এর প্রশংসনীয় গুণাবলী সম্পর্কে কুরআনের সাক্ষ্য: ১. কুরআন বলে যে, তার বাহক চারিত্রিক গুণাবলীর শীর্ষস্থানে অবস্থান করছিলেন। 'এবং হে মুহাম্মাদ [সা] তুমি চরিত্রের উচ্চতম মর্যাদার অধিকারী।' [নুন- ৪]।

রাসূল [সা]-এর চারিত্রিক নির্মলতা ও পবিত্রতার বড় সাক্ষী তার স্ত্রী খাদিজা [রা] এবং ওয়ারাকা বিন নাওফাল।

'[রাসূলুল্লাহ [সা]-এর কাছে অহী আসার ঘটনা থেকে একটি বিষয় জানা যায় যে, নবুয়তের পূর্বে নবী মুস্তফার জীবন কত পাক পবিত্র এবং স্বভাব চরিত্র কত উন্নত মানের ছিল। হযরত খাদিজা [রা] কোন অল্প বয়স্কা মহিলা ছিলেন না। তাঁর বয়স তখন ছিল পঞ্চান্ন বছর। পনেরো বছর যাবত তিনি নবীর জীবন সংগিনী ছিলেন। বিবির কাছে স্বামীর কোন দুর্বলতা গোপন থাকে না। তিনি তাঁর এ সুদীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে হুযুরকে [সা] এতো উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ পেয়েছিলেন যে, যখন তিনি তাঁকে হেরাগুহায় সংঘটিত ঘটনা শুনালেন, তখন তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে এ কথা মেনে নিলেন যে, প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর ফেরেশতাই তাঁর নিকট ওহী নিয়ে এসেছিলেন। তেমনি ওয়ারাকা বিন নাওফালও মক্কার একজন

www.pathagar.com

বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। শৈশব কাল থেকেই তিনি হুযুরের জীবন লক্ষ্য করে আসছিলেন। পনেরো বছরে নিকট আত্মীয়তার ভিত্তিতে তিনি তাঁর অবস্থা সম্পর্কে আরও গভীর অভিজ্ঞতা পোষণ করতেন। তিনি যখন এ ঘটনা শুনলেন তখন তিনি তা কোন অসঅসা বা প্ররোচনা মনে করেননি। বরঞ্চ শুনা মাত্রই বলে ফেলেন যে, এ ত অবিকল সেই নামুস যা মুসা [আ]-এর প্রতি নাযিল হয়েছিল। এর অথ এই যে, তাঁর নিকটেও নবী মুস্তফা এতো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ ছিলেন যে, তঁর নবীর মর্যাদায় ভূষিত হওয়া কোন বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল না।'

২. কুরআন বলে যে, তার বাহক একজন দৃঢ় সংকল্প, দৃঢ় চিত্ত ও সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তি ছিলেন যে, যখন তাঁর সমগ্র জাতি তাঁকে নির্মূল করার জন্য বদ্ধপরিকর হলো এবং তিনি একজন সহযোগীসহ পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন, সেই কঠিন বিপজ্জনক অবস্থায়ও তিনি সাহস হারিয়ে ফেলেননি বরঞ্চ আপন সংকল্পে অটল ছিলেন।

ইরশাদ হচ্ছে: 'স্মরণ কর সে সময়ের কথা যখন কাফেরগণ তাঁকে বহিষ্কার করে দিয়েছিল, যখন তিনি দুইয়ের মধ্যে দ্বিতীয় ছিলেন এবং যখন দুজন গুহায় ছিলেন এবং তিনি তাঁর সাথীকে বলেছিলেন, চিন্তা করো না। আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন।' [তওবা-৪০]।

৩. কুরআন বলে যে, তার বাহক একজন অত্যন্ত উদারচেতা ও দয়াশীল ব্যক্তি ছিলেন যিনি তার চরম শত্রুর জন্যেও ক্ষমা করার দোয়া করেন এবং অবশেষে আল্লাহকে এ চূড়ান্ত ফায়সালা শুনিয়ে দিতে হয় যে, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। এরশাদ হচ্ছে : 'তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না কর, তুমি যদি সত্তর বারও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর তথাপি আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।' [তওবা -৮০]।

৪. কুরআন বলে, তার বাহকের স্বভাব-প্রকৃতি ছিল অত্যন্ত নম্র। তিনি কোন দিন কারো প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেননি এবং দুনিয়া তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়। এরশাদ হচ্ছে : 'এ আল্লাহরই রহমত যে তুমি তাদের প্রতি বিনম্র-নম্র। নতুবা তুমি যদি কর্কশভাষী ও পাষাণ হৃদয়ের হতে, তা হলে সব লোক তোমার চার পাশ থেকে কেটে পড়তো।' [তওবা- ১৫১]।

তিনি কেমন নম্র দয়াদ্র হৃদয়ের ছিলেন তার সাক্ষী হযরত যায়েদ [রা]। যায়েদের সন্ধানে এল তার বাবা ও চাচা। নবী [সা] যায়েদকে ডেকে তাদেরকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এ দু'ব্যক্তিকে চেন?'

www.pathagar.com

যায়েদ বললেন, 'জি হাঁ, উনি আমার পিতা এং উনি চাচা।' নবী [সা] বললেন, 'ভালো কথা, তুমি তাদেরকেও চেন এবং আমাকেও চেন। এখন তুমি পূর্ণ স্বাধীন। চাইলে তাদের সাথে চলে যাও, আর চাইলে আমার সাথে থাক।' যায়েদ বলেন, 'আমি আপনাকে ছেড়ে কারা কাছে যেতে চাই না।'

যায়েদের বাপ-চাচা বললেন, 'যায়েদ! তুমি কি স্বাধীনতা থেকে গোলামীকে প্রাধান্য দিচ্ছ? আর আপন মা-বাপ ছেড়ে অন্যের কাছে থাকতে চাচ্ছ?'

যায়েদ বললেন, 'আমি এ মহান ব্যক্তির গুণাবলী দেখেছি এবং তার আলোকে দুনিয়ার কাউকে তাঁর ওপর প্রধান্য দিতে পারি না।'

৫. কুরআন বলে, তার বাহক খোদার বান্দাহদেরকে সত্য সঠিক পথে আনার জন্য মনের মধ্যে অস্থিরতা বোধ করতেন এবং গোমরাহীর জন্য তারা জিদ ধরে থাকলে মনে বড় কষ্ট পেতেন। এমনকি তাদের দু:খে অধীর হয়ে পড়তেন। আল্লাহ্ বলেন: 'হে মুহাম্মাদ! এমন মনে হচ্ছে যে, তুমি তাদের জন্য দু:খে অভিভূত হয়ে প্রাণ হারিয়ে ফেলবে যদি তারা এ কথার উপরে ঈমান না আনে।' [কাহাফ-৬]।

৬. কুরআন বলে, তার বাহক তাঁর উম্মতের জন্য গভীর ভালোবাসা পোষণ করতেন। তিনি তাদের শুভাকাংখী ছিলেন। তারা ক্ষতিগ্রস্ত হলে মর্মাহত হতেন। তাদের জন্য তিনি ছিলেন দয়া ও স্নেহ মমতার প্রতীক। এরশাদ হচ্ছে: 'তোমাদের নিকট স্বয়ং তোমাদের মধ্য থেকেই এমন এক রাসূল এসেছেন, যার কাছে সে প্রতিটি জিনিস কষ্টদায়ক হয় যা তোমাদের ক্ষতিকারক, যে তোমাদের কল্যাণকামী এবং আহলে ঈমানদারদের জন্যে বড়োই স্নেহশীল ও দয়ালু।' [তওবা- ১২৮]।

৭. কুরআন বলে, তার বাহক শুধু তাঁর জাতির জন্যেই নয়, বরঞ্চ সমগ্র দুনিয়ার জন্য রহমত স্বরূপ। আল্লাহ্ ফরমান : 'হে মুহাম্মাদ [সা]! আমরা তোমাকে সারা দুনিয়ার জন্য রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি।' [আম্বিয়া- ১০৭]।

৮. কুরআন বলে, তার বাহক রাতে ঘন্টার পর ঘন্টা জেগে জেগে এবাদত করেন এবং খোদার স্বরণে দন্ডায়মান থাকেন।

এরশাদ হচ্ছে : 'হে মুহাম্মাদ [সা]! তোমার রব জানেন যে তুমি রাতের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ পর্যন্ত এবং কখনো অর্ধ রাত, কখনো এক তৃতীয়াংশ রাত নামাযে দাঁড়িয়ে থাক।' [মুয্যাম্মেল- ২০]।

৯. কুরআন বলে, তার বাহক ছিল সত্যবাদী মানুষ। জীবনে তিনি কখনো সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হননি। অশুভ চিন্তাধারায় প্রভাবিত হননি। আর না কখনো প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে হকের বিরুদ্ধে টু শব্দটি করেছেন। কুরআন বলে : 'হে

www.pathagar.com

লোকেরা! তোমাদের ছাহেব না কখনো সত্য সরল পথ থেকে সরে পড়েছে, না সঠিক চিন্তাধারা থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আর না সে প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে কিছু বলে।' [নজম -২-৩]।

রাসূলের [সা] সত্যবাদিতা সম্পর্কে রাসূলের সবচেয়ে বড় দুশমন আবু জাহেল বলে, 'আমরা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি না। বরঞ্চ তুমি যা নিয়ে এসেছ তা মিথ্যা মনে করি।'

বদর যুদ্ধের সময় আখ্ নাস বিন শারীক নিভৃতে আবু জেহেলকে জিজ্ঞেস করলো, 'এখানে তুমি ছাড়া তৃতীয় কোন ব্যক্তি নেই। সত্যি করে বলো দেখি, মুহাম্মাদকে [সা] সত্যবাদী মনে কর না মিথ্যাবাদী?'

সে জবাবে বলে, 'খোদার কসম, মুহাম্মাদ একজন সত্যবাদী লোক। সারা জীবন কোন মিথ্যা কথা বলেনি। কিন্তু লেওয়া, [পতাকাবাহীর মর্যাদা] হিজাবত [খানায়ে কাবার চাবি বহন কারীর মর্যাদা,] সিকায়াত [হাজীদেরকে পানি পান করবার মর্যাদা] এবং নবুওত সব কিছুই যদি বনী কুসাই-এর অংশে যায় তাহলে বলো, অবশিষ্ট কুরাইশদের কাছে আর কি রইলো?'

১০. কুরআন বলে, তার বাহক সারা দুনিয়ার জন্য অনুসরণযোগ্য আদর্শ এবং তাঁর গোটা জীবন পরিপূর্ণ নৈতিকতার সঠিক মাণদণ্ড। এরশাদ হচ্ছে : 'তোমাদের জন্য রাসূলের মধ্যে এক সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ রয়েছে।' [আহযাব- ২১]। রাসূল যে জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করে 'সীরাতে সরোয়ারে আলম' গ্রন্থে লেখা হয়েছে :

'এ সময় [রেসালাতের দায়িত্ব আসার পরে] নবী [সা] পাকের সততা, বিশ্বস্ততা, কাজকর্ম ও লেনদেন অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সত্যপরায়ণতা, দান খয়রাত, আত্মীয় স্বজনের সাহায্য ও সেবা যত্ন, অসহায় মানুষের সাহায্য, দারিদ্রের ভরণ পোষণ, বিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতির যে সকল গুণাবলী গোটা কুরাইশ এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ গোত্রাবলীর কছে এমনভাবে উদ্ভাসিত হয়ে পড়লো যা প্রথমে প্রকাশ লাভের সুযোগের অভাবে লুপ্ত ছিল। এখন সমাজে তাঁর মর্যাদা শুধু নৈতিকতার দিক দিয়েই নয়, বরঞ্চ বৈষয়িক দিক দিয়েও এতটা উন্নীত হলো যে তিনি কুরাইশদের অন্যতম সরদার হিসেবে বিবেচিত হতে লাগলেন। হযরত খাদিজার [রা] সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর নবী পাকের অসচ্ছলতা দূর হয়। নবী [সা] পাকের হাতে ব্যবসা এলে পর তাঁর ব্যবসা জমজমাট হয়ে উঠলো। 'আল্লাহ্ তাকে দরিদ্র পেয়েছিলেন এবং পরে তাঁকে ধনশালী বানিয়ে দিলেন।'

তাঁর ওপরে মানুষের এতটা আস্থা সৃষ্টি হলো যে, তারা তাদের মূল্যবান সম্পদ তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখতে লাগলো। এমনকি এ অবস্থা তখন পর্যন্ত অব্যাহত

www.pathagar.com

ছিল যখন নবুয়ত ঘোষণার পর মক্কার জনসাধারণ নবীর রক্ত পিপাসু হয়ে পড়েছিল। তাঁর প্রতি চরম দুশমনী পোষণ করা সত্ত্বেও তারা তাদের সকল আমানত তাঁর হেফাজতেই রেখে দিত। এ কারণেই হিজরতের সময় হযরত আলী [রা]কে মক্কায় রেখে যেতে হয়েছিল যাতে করে তিনি সকলের আমানতের সম্পদ ফেরৎ দিয়ে আসতে পারেন। এতে এটাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবুযতের পূর্বেই শুধু নয়, নবী হওয়ার পরেও ইসলামের দুশমনদের অন্তরে তাঁর আমানতদারীর ব্যাপারে কোন দুশ্চিন্তা জন্ম নেয়নি বরং এরপরও তারা তাঁকেই তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য লোক মনে করতো।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রাসূল [সা]-এর মহান চরিত্র বর্ণনা করতে লিখেছেন : 'জগতে অনেক মহামানব আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁদের কৃতিত্ব এক এক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। কেউ ধর্মে, কেউ যুদ্ধে, কেউ বাগ্মিতায়, কেউ সাহিত্যে, কেউ রাজনীতিতে মহত্ব লাভ করেছেন। কিন্তু মহত্বের সর্ব কৃতিত্ব লাভ করেছেন কেবল একজন, তিনি মুহাম্মাদ [সা]। এটা আমি ভক্তির উচ্ছাসে বলছি না। একজন ফরাসী লেখক আলফ্রেড দে লেমার্টিন তাঁর তুর্কীর ইতিহাসের প্রথম খন্ডে বলেছেন : 'দার্শনিক, বক্তা, ধর্ম-প্রচারক, যোদ্ধা, আইন-রচয়িতা, ভাবের বিজয়কর্তা, ধর্ম মতের ও প্রতিমাবিহীন কর্মপদ্ধতির সংস্থাপক, কুড়িটি পার্থিব রাজ্যের এবং একটি ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা দেখ সেই মুহাম্মাদ [সা]-কে মানুষের মহত্বের যতগুলি মাপকাঠি আছে তা দিয়ে মাপলে কোন্ লোক তাঁর চেয়ে মহত্তর হতে পারে? --হযরত মুহাম্মাদ [সা] আমাদের সকলের আদর্শ। স্বামী দেখতে পাবে তাঁর মধ্যে স্ত্রী-অনুরাগী আদর্শ স্বামী। পুত্র দেখতে পাবে তাঁর মধ্যে মাতৃ-পিতৃভক্ত আদর্শ পুত্র। পিতা দেখতে পাবে তাঁর মধ্যে মমতাশীল কর্তব্যপরায়ণ আদর্শ পিতা। গৃহী দেখতে পাবে তাঁর মধ্যে স্বহস্তে গৃহকর্মে রত আদর্শগৃহী। যোগী দেখতে পাবে তাঁর মধ্যে সংসার মধ্যে ধ্যান নিরত আদর্শ যোগী। প্রভু দেখতে পাবে তার মধ্যে সদয় হাস্যবদন আদর্শ প্রভু। ভৃত্য দেখতে পাবে তার মধ্যে কর্তব্যনিষ্ঠ পরিশ্রমী আদর্শ ভৃত্য। বণিক দেখতে পাবে তাঁর মধ্যে আদর্শ বণিক। যোদ্ধা দেখতে পাবে তাঁর মধ্যে নির্ভীক আদর্শ যোদ্ধা। সেনাপতি দেখতে পাবে তাঁর মধ্যে রণকুশলী ও স্থির মস্তিষ্কের আদর্শ সেনাপতি। নেতা দেখতে পাবে তাঁর মধ্যে হিতৈষী জনসেবক আদর্শ নেতা। বিচারক দেখতে পাবে তাঁর মধ্যে নিরপেক্ষ ন্যায়নিষ্ঠ আদর্শ বিচারক। কুরআন শরীফে তাই তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে : 'লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা,' –নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ আছে।'

www.pathagar.com

জগতের আদর্শ মহামানব

এভাবে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্নভাবে তার উসওয়াতুন হাসানার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁদের মূল্যবান রচনাতে। সৈয়দ সুলায়মান নদভী সমস্ত নবীদের পবিত্র গুণাবলীর সমাহার খুঁজে পেয়েছেন রাসূলুল্লাহ [সা]-এর চরিত্রের মাঝে। তিনি লিখেছেন, 'এমনিতেই তো সকল পয়গম্বর খোদায়ী বাণীর সাক্ষ্য দানকারী, তৎপ্রতি আহক্ষানকরী, সুসংবাদ দানকারী, ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে এই দুনিয়ায় এসেছেন। কিন্তু এ সব গুণাবলী তাঁদের সকলের জীবনে কার্যত সমানভাবে বিকাশ লাভ করেনি। অনেক নবী ছিলেন যাঁরা বিশেষভাবে সাক্ষ্য দানের দায়িত্ব পালন করেছেন। যেমন হযরত ইয়াকুব, হযরত ইসহাক, হযরত ইসমাইল পড়ৃষু নবীগণ। অনেক নবী সুসংবাদ দানকারীর দায়িত্ব পালন করেছেন। যেমন হযরত ইবরাহীম, হযরত ঈসা প্রমুখ নবীগণ। অনেক নবীর বিশেষ গুণ ছিল ভীতি প্রদর্শন। যেমন হযরত নুহ, হযরত মুসা, হযরত হুদ ও হযরত শোয়াইব [আ] প্রমুখ নবীগণ। আবার অনেক নবীর বৈশিষ্ট ছিল সত্যের পথে আহক্ষানকারী হিসেবে। যেমন হযরত ইউসুফ, হযরত ইউনুস [আ] প্রমুখ নবীগণ। কিন্তু যিনি একই সংগে সাক্ষ্যদানকারী, সুসংবাদদাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী, হকের পথের আহক্ষায়ক ও উজ্জ্বল প্রদীপ ছিলেন এবং যাঁর জীবনপটে এসব গুণাবলী স্পষ্টভাবে খোদিত ছিল তিনি হচ্ছেন হযরত মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কারণ, তাঁকে দুনিয়ার সর্বশেষ পয়গম্বর হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। তাঁকে একটি পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত প্রদান করা হয়েছিল বিধায় একে পুর্ণতা দানের জন্যে আর কোনো নবী আসার প্রয়োজনই রইল না। রাসূলের [সা] চরিত্রে এত ব্যাপক গুণের সমাহার অলৌকিক ছাড়া আর কি হতে পারে? #

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

রাসূল [সা]-এর জীবন চেতনা

শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির

ভূমিকা

'সুস্পষ্টভাবে এবং আক্ষরিক অর্থে বলতে গেলে ধর্মের চেয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ নিয়েই ইসলামের উত্থান।' [ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা, মানবেন্দ্র নাথ রায়, বদিউর রহমান অনূদিত, অধ্যায়-০২, পৃ.-১৯, প্রকাশক-মোতাহার হোসেন, প্যাপিরাস, ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।]

এম এন রায় বা মানবেন্দ্রনাথ রায়–এর ইসলাম নিয়ে এই মূল্যায়ন নিয়ে ভাবার আগে এম এন রায় সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা প্রয়োজন। ভারতবর্ষে মানবতাবাদী আন্দোলনের প্রবক্তা মানবেন্দ্রনাথ রায় যিনি এম এন রায় নামেই অধিক পরিচিত; আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন মেধাবী কারিগর। লেনিন, স্ট্যালিন, ট্রটস্কি, বুখারিন প্রমুখদের সাথে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন পরিচালনায় তিনি অবদান রেখেছেন। ইসলামের বিজয়কে এভাবে রাজনৈতিক দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রেও তিনি তৎকালীন সময়ে অগ্রণীদের একজন ছিলেন। কারো কারো কাছে মূল্যায়নটি নিয়ে ভিন্নমত থাকলেও ইসলামে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের যে ঘোষণা রাসূল [সা] দিয়েছেন তাতে রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ নিয়ে ইসলামের উত্থানের বিষয়ে এম এন রায়ের উক্ত মতামতকে যথাযথ বলেই বিবেচনা করতে হয়। কারণ পৃথিবীর বুকে সকল রাজনৈতিক আদর্শ ও চেতনার মূলই হচ্ছে রাষ্ট্রীয় 'সার্বভৌমত্বের ধারণা'। 'রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব' এই চেতনার পৃষ্ঠপোষক সকল সরকার প্রধানই নিজেদেরকে নিরংকুশ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী মনে করে। ফলে কম-বেশী প্রায় সকল ক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিক স্বৈরাচার বা ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির অবাধ প্রসার ঘটতে থাকে। মানুষ জীবন-মৃত্যুর মালিক না হয়ে বরং নিজেই জীবন-মৃত্যুর শিকার হওয়ার কারণে প্রকৃতপক্ষে কোনো সার্বভৌমত্বের মালিক মানুষ নয়। তাই রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের নামে সরকার প্রধানদের ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির প্রসার হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু ইসলাম আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ছাড়া

www.pathagar.com

অন্যান্য সকল সার্বভৌমত্বের ধারণাকে অনধিকার চর্চা হিসেবে মূল্যায়ন করায় সরকার প্রধানদের ক্ষমতার অপব্যবহার করার কিংবা দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষক হবার কোনো অবকাশ আর থাকে না। কারণ সরকার প্রধানকেও মূল সার্বভৌম শক্তির কাছে জবাবদিহি করার মতো জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হতে হয়। নিশ্চিত করতে হয় সার্বভৌম শক্তির বিধানসমূহের বাস্তবায়ন। রাসূল [সা]-এর জীবন-যাপন ছিল মূল সার্বভৌম শক্তির কাছে জবাবদিহির চেতনার আলোকে গড়া এবং তিনি নিশ্চিত করেছিলেন মূল সার্বভৌম শক্তি আল্লাহর বিধানসমূহের বাস্তবায়ন।

বিষয়টি আরো পরিস্কারভাবে তুলে ধরেছেন ঐতিহাসিক ফিসার। তার ভাষায়, 'আরব রাষ্ট্রে, নিয়মিত সৈন্য বাহিনী কিংবা সাধারণ রাজনৈতিক অভিলাষ এর কোনো কিছুরই নামগন্ধ ছিল না। আরবরা রাজনীতিক ছিল না, ছিল কবি, স্বপ্নবিলাসী, যোদ্ধা এবং ব্যবসায়ী। ধর্মেও তারা একীকরণ কিংবা স্থিতির কিছু দেখেনি। তারা বহু ঈশ্বরের পূজায় অভ্যস্ত ছিল অত্যন্ত জঘন্যভাবে। একশ' বছর পর এই অন্ধ অসভ্যরাই পৃথিবীতে বৃহৎ শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করল। জয় করে নিল সিরিয়া ও মিশর। পদানত ও দীক্ষিত করল পারস্য। আধিপত্য বিস্তার করল পশ্চিম তুরস্ক এবং পাঞ্জাবের কতকাংশের ওপর। তারা বাইজেনটাইনস্ ও বেরবেরসদের কাছ থেকে আফ্রিকা এবং ভিসিগোথসদের কাছ থেকে স্পেনকে ছিনিয়ে নিল। পশ্চিমে ফ্রান্স, পূর্বে কন্সট্যান্টিনোপলকে তারা সন্ত্রস্ত করে তুলল। আলেকজান্দ্রিয়া বা সিরিয়ার বন্দরে তাদের জাহাজ তৈরি হলো। নির্ভয়ে চলাফেরা করল ভূমধ্যসাগরে। পদানত করল গ্রিক দ্বীপগুলো; আর চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের নৌ-শক্তিকে। তারা এত সহজে বিজয়ী হলো যে কেবল পারস্য এবং এটলাস পার্বত্য অঞ্চলের বেরবেররা ছাড়া আর কেউ তেমন কোনো বাঁধাই দিতে পারলো না। অষ্টম শতাব্দীর শুরুতে সবার মনে প্রশ্ন দেখা দিল, তাদের এই বিজয়ের পথে আর কোনো বাঁধাই কী দেয়া যাবে না? ভূমধ্যসাগরের ওপর রোমকরা তাদের আধিপত্য হারালো। ইউরোপের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত সারা খ্রিষ্ট জগৎ এক নতুন বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত নতুন প্রাচ্য সভ্যতার সামনে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। [H.L. Fisher: A History Of Europe; p137-138.] '

কিভাবে এমন বিস্ময়কর ঘটনা ঘটলো? ঐতিহাসিকদের কাছেও এ এক বিস্ময়কর প্রশ্ন। এম এন রায় নিজেই তার জবাব দিয়েছেন এভাবে, 'শান্ত-সহিষ্ণু মানুষের উপর গোঁড়ামির জয়' ইসলামের অভ্যুত্থান সম্বন্ধে এই ঘৃণ্য অভিমত আজকের দুনিয়ার শিক্ষিত মানুষরা প্রত্যাখ্যান করছে। ইসলামের এই বিস্ময়কর বিজয়ের মূলে ছিল এর বৈপ্লবিক চেতনা এবং সেই সাথে প্রাচীন

www.pathagar.com

সভ্যতার ঘুণে ধরা কেবল গ্রিস, রোম, পারস্য এবং চীন নয়, ভারতবর্ষেরও বিপুল জনগোষ্ঠিকে দু:খ-দুর্দশার পঙ্কিলতা থেকে আলোর পথ দেখালো।' [ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা, মানবেন্দ্র নাথ রায়, বদিউর রহমান অনূদিত, অধ্যায়-০১, পৃ.-১৭, প্রকাশক-মোতাহার হোসেন, প্যাপিরাস, ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।]

কি ছিল সেই বৈপ্লবিক চেতনা?

চেতনা বিপ্লব করতে সক্ষম হলেই কেবল তা বৈপ্লবিক চেতনা হিসেবে বিবেচিত হয়। বিপ্লবের ধরণ অনুযায়ী চেতনাকে যেমন উপলব্ধি করা যায়, তেমনি চেতনার পরিধিকে অনুধাবন করেও বিপ্লবের ধরণকে আগাম অনুভব করা সম্ভব। যে চেতনা শুধুই রাজনৈতিক তা রাজনৈতিকভাবে সফল হলেও অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পারিবারিকসহ জীবনের অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই এর ব্যর্থতা অনিবার্য।

চেতনার পরিধি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ইসলামের চেতনা একাধারে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক, সাংস্কৃতিকসহ জীবনের সবগুলো দিক নিয়েই এর পরিধি।তবে যিনি এই চেতনাকে সফলভাবে বিপ্লবে পরিণত করবেন, তাঁকে অতি অবশ্যই ইসলামের এই পূর্ণাঙ্গ পরিধিকে সফলভাবে উপলব্ধি করতে হবে। উপলব্ধির সীমাবদ্ধতা চেতনার সফল বাস্তবায়নে এক অলংঘনীয় বাধা।

বাংলাদেশসহ বিশ্বের বহু দেশেই শুধু রাজনৈতিক চেতনা বা শুধু অর্থনৈতিক চেতনার বৈপ্লবিক রূপ মানবজাতি দেখেছে এবং এসব চেতনার অপমৃত্যুও দেখেছে এবং দেখছে। নানা চেতনার এই অপমৃত্যু বরণের মধ্যেও ইসলাম সারা বিশ্বে এখনও ক্রম-সম্প্রসারণশীল এক অপ্রতিরোধ্য চেতনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। জীবনের সকল দিককেই ইসলাম তার চেতনায় ধারণ করার কারণে আজকের দুনিয়ার শিক্ষিত মানুষরা ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও প্রপাগান্ডাকে মুল্যায়ন করেই ইসলামের চেতনায় নিজেদেরকে সিক্ত করছে। অন্যদিকে ক্ষমতালোভী ও প্রতিপত্তিলোভীরা আবহমানকাল হতেই বিভিন্ন রাজনৈতিক চেতনার নামে ইসলামের রাজনৈতিক চেতনা 'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে' অস্বীকার করছে এবং ইসলামকে নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জনের প্রতিবন্ধক হিসেবেই বিবেচনা করেছে এবং করছে।

ইসলামের বিস্ময়কর বিজয়ের মূলে ছিল বৈপ্লবিক চেতনা। দেখা যাক্ কি ছিল সেই বৈপ্লবিক চেতনা।

www.pathagar.com

১. রাজনৈতিক বৈপ্লবিক চেতনা

আল্লাহ তাঁর মনোনীত রাসূলের মাধ্যমে যে রাজনৈতিক বৈপ্লবিক চেতনা অবহিত করলেন; তা স্বয়ং রাসূল [সা]কে ধারণ করার কথাও বলে দিলেন। গোটা আরব শুধু নয়, ঐতিহাসিক ফিসারের মতামত অনুযায়ী এই বৈপ্লবিক রাজনৈতিক চেতনা মানব ইতিহাসে এক বিস্ময়কর রাজনৈতিক বিজয় এনে দিয়েছিল। আল্লাহ যে চেতনা নাযিল করেছেন তা ছিল নিম্নরূপ :

'বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই; তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তাঁর বার্তাবাহক উম্মী নবীর প্রতি; যে [উম্মী নবী] আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে ঈমান আনে এবং তোমরা তার [উম্মী নবীর] অনুসরণ কর, যাতে তোমরা সঠিক পথ পাও।' [সূরা আ'রাফ : ১৫৮]।

আল্লাহর সার্বভৌমত্বের এই চেতনাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে, প্রকাশ্যে বা গোপনে অস্বীকারকারী ব্যক্তি চেতনায় একজন অমুসলিম। তার লেবাস, চেহারা, ডিগ্রি যাই থাকুক না কেন। এ বিষয়টি তিনি উপলব্ধি করুন বা না করুন। কেউ তা ঘোষণা দিক বা না দিক।

২. নেতৃত্বের বৈপবিক চেতনা

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সা] বাঙালী, বাংলাদেশী, আরবী, ইংরেজি, ফরাসী, ভারতীয়, জার্মানী, ইত্যাদি সকল জাতীয়তার মানুষের জন্যই রাসূল। তিনি আব্রাহাম লিংকনের জন্য যেমন তেমনি শেখ মুজিবর রহমান ও জিয়াউর রহমানের জন্যেও একমাত্র অনুকরণীয় রাসূল।

আল্লাহ বলেন, 'আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।' [সূরা সাবা : ২৮]। আল্লাহ আরো বলেন, 'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।' [সূরা আহযাব : ৪০]।

বাঙালী, বাংলাদেশী, আরবী, ইংরেজি, ফরাসী, ভারতীয়, জার্মানী, ইত্যাদি সকল জাতীয়তাবাদের চেতনাকে সরলীকরণ করে ইসলাম একটি গ্লোবাল জাতীয়তার অধীনে মানবজাতিকে রাসূলের নেতৃত্বে বিশ্ব পরিচালনার ধারণা দিয়েছেন। কার্যত: বিশ্ব এখন গ্লোবাল জাতীয়তার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের যে কোনো দেশকে যে এখন গ্লোবাল ভিলেজ বলা হচ্ছে এ তারই প্রক্রিয়ার একটি অংশ। মাতৃভাষা ছাড়াও গ্লোবাল ল্যাংগুয়েজ ইংরেজিতে পারদর্শীতা অর্জন করছে

www.pathagar.com

ব্যাপক সংখ্যক মানুষ। যারা বর্তমান জাতীয়তাবাদী পরিচয়ের দিক দিয়ে বিভিন্ন। বিভিন্ন জাতীয়তা নির্বিশেষে মানুষের এই গ্লোবাল ল্যাংগুয়েজে পারদর্শীতা অর্জন মানুষের গ্লোবাল জাতীয়তা অর্জনের প্রক্রিয়ারই একটি অংশ। এছাড়া দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থাও এখন বিশ্বের প্রতিটি দেশকে এক একটি গ্রামে পরিণত করেছে। বিশ্বের যে কোনো দেশ এখন তাই পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহে মুহূর্তেই আন্দোলিত ও প্রভাবিত হয়। 'গ্লোবাল জাতীয়তা' চেতনার রূপকার আল্লাহতায়ালা মানুষকে রক্ত, ভাষা, বর্ণ, সম্প্রদায়, গোত্র ও দেশ নির্বিশেষে মানবিকভাবে চিন্তা করার দিকেই আহ্বান করেছেন। রক্ত, ভাষা, বর্ণ, সম্প্রদায়, গোত্র ও দেশের বিভক্তিকে আল্লাহতায়ালা পারস্পরিক পরিচয়ের, জানা-বোঝা এবং জ্ঞানের বিনিময়ের জন্য নির্ধারণ করেছেন। রক্ত, ভাষা, বর্ণ, সম্প্রদায়, গোত্র ও দেশভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকার জন্য নয়। আল্লাহ্ বলেন, 'হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।' [সূরা হুজুরাত: ১৩]।

৩. অর্থনৈতিক বৈপ্লবিক চেতনা

ইসলামে আর্থিক বিবেচনায় মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হয় না। শারিরীক ও মানসিক সামর্থ্যের পার্থক্যের কারণে মানুষে মানুষে আর্থিক অবস্থার পার্থক্য হয়ে থাকে। তাই যত দরিদ্রই হোক না কেন মানবিক দিক বিবেচনায় প্রত্যেক মানুষই ইসলামে সম্মানিত ও মর্যাদাবান হিসেবে বিবেচিত। মানুষকে ইসলাম অর্থনৈতিক পণ্য হিসেবে কখনই বিবেচনা করে না; ইসলামে একজন দরিদ্র ও একজন ধনী ব্যক্তি মানবিক মর্যাদার দিক দিয়ে সমান মর্যাদার। আল্লাহ্ বলেন, 'আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।' [সূরা বনী ইসরাঈল : ৭০]। এই মর্যাদা ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে। ধনীদের দায়িত্ব রয়েছে, আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকে দান করার। আল্লাহ্ বলেন, 'আত্মীয়-স্বজনকে দিবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না।' [সূরা বনী ইসরাঈল : ২৬]। অর্থাৎ ধন বা সম্পদে সামর্থ্যবান হলে যাচ্ছেতাই করা, ইসলামে অপব্যয়ের শামিল। সুদ ভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে অপব্যয়ের কোনো সংজ্ঞা নেই। আছে অভাবের সংজ্ঞা। সুদ ভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে

www.pathagar.com

একজন পুঁজির মালিকের 'অভাব অসীম'। 'অসীম অভাব' যার, তার পক্ষে কি আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরের জন্য কিছু করা সম্ভব? সুদ নির্ভর পুঁজিবাদী অর্থনীতি তাই পুঁজির মালিক কেন্দ্রিক। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ব্যস্টিক কিংবা সামষ্টিক অর্থনীতি পুঁজির মালিকের, পুঁজির মালিক দ্বারা, পুঁজির মালিকের জন্য। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরের জন্য ব্যয়ের কোনো খাত নেই। ইসলাম, আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরের জন্য ব্যয়ের কথা বলেই শেষ করেনি। আল্লাহতায়ালা আরো নির্দেশনা দিয়েছেন, 'সুন্দর কথা বলা এবং ভুল ক্ষমা করে দেয়া সেইসব দানের চাইতে ভালো, যে দানের পর মানুষকে [দান গ্রহণকারীকে] কষ্ট দেয়া হয়, আর আল্লাহতায়ালা কারোরই মুখাপেক্ষী নন, তিনি অতিশয় সহনশীল।' [সূরা বাকারাহ : ২৬৩]।

বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রেরই রাজনৈতিক মতবাদ যাই-ই হোক না কেন, অর্থনৈতিক মতবাদ হলো সুদ ভিত্তিক অর্থনৈতিক মতবাদ-পুঁজিবাদ। সুদ হচ্ছে 'দু-ধারী ছুরি'। এই 'ছুরি' বাঙালী, বাংলাদেশী, আরবী, ইংরেজি, ফরাসী, ভারতীয়, জার্মানী, ইত্যাদি সকল জাতীয়তা এবং হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলিম ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অভাবী মানুষের বেঁচে থাকার সহায়কে খুন করে তাকে আর্থিকভাবে কপর্দকহীনে পরিণত করে নিঃস্ব করে দেয়। ভেতর থেকে মানুষটির সব স্বপ্নকে মেরে ফেলে। সমাজে তাঁর অবস্থান হয় ঠিকানাবিহীন ভাসমান আর্বজনার মতো। সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি মানুষকে দারিদ্রমুক্ত করতে সক্ষম হয়নি। বরং তাঁর হাতের পাঁচ যা কিছু দরিদ্র মানুষের থাকে তার সবই কেড়ে নিয়ে তাঁকে সর্বহারা করেছে। সুদ এভাবেই সারা বিশ্বে দরিদ্র মানুষের মিছিলের সারি বংশ পরম্পরায় নিরবচ্ছিন্নভাবে সৃষ্টি করে যাচ্ছে। আর বিশ্ব সমাজকে উপহার দিচ্ছে জুয়া, মাদক, সন্ত্রাস, খুন ও বহুমুখী অজাচার।

হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলিম ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবতার এতবড় শত্রুকে আল্লাহ নিষিদ্ধ করে মানবজাতিকে এক অর্থনৈতিক বৈপ্লবিক চেতনা দান করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'ব্যবসা বৈধ এবং সুদ অবৈধ।' [০২ : ২৭৫]।

সুদকে অবৈধ করে অর্থনীতিকে বায়বীয় সম্পদ বা ভার্চুয়াল সম্পদের মরিচীকা মুক্ত করে বাস্তব সম্পদের ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছে ইসলাম এবং ধনী-দরিদ্রের ব্যবধানকে আকাশ থেকে নামিয়ে ভূমির সমান্তরাল করেছে। সুদের হিসাবের মারপ্যাচে অপরের সম্পদকে নিজের সম্পদে পরিণত করার ধূর্তামীকে নিষিদ্ধ করে বিশ্বের অভাবী মানুষদেরকে ধনীদের লালসার শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করেছে। আর এজন্যই বিশ্বের ধনলোভীদের এক বিশাল অংশ ইসলামের সুদবিহীন মানবিক অর্থনৈতিক মতবাদের পৃষ্ঠপোষক না হয়ে সুদ ভিত্তিক

www.pathagar.com

পুঁজিবাদের নিবিড় পৃষ্ঠপোষক এবং এই একটিমাত্র কারণে ওরা ইসলামকে অপছন্দ করে।

ইসলামের অর্থনৈতিক বৈপ্লবিক চেতনার অন্যতম আরো কিছু দিক হলো 'যাকাত, কারদান হাসানান এবং স্বত: প্রণোদিত দান'। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কে আল্লাহকে 'করজে হাসানা' দিতে প্রস্তুত, যাতে আল্লাহ তা কয়েকগুণ বাড়িয়ে তাকে ফেরত দিবেন ? কমাবার ক্ষমতা আল্লাহর আছে, বাড়াবারও এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।' [সূরা বাকারাহ্ : ২৪৫]।

আল্লাহ আরো বলেন, 'যারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি শস্যবীজ, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশত শস্যদানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ, প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

যারা আল্লাহর পথে ধনৈশ্বর্য ব্যয় করে অত:পর যা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না এবং ক্লেশও দেয় না, তাদের পুরস্কার তাদের রবের কাছে আছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দু:খিতও হবে না। সুন্দর কথা বলা এবং ভুল ক্ষমা করে দেয়া সেইসব দানের চাইতে ভালো, যে দানের পর মানুষকে [দান গ্রহণকারীকে] কষ্ট দেয়া হয়, আর আল্লাহতায়ালা কারোরই মুখাপেক্ষী নন, তিনি অতিশয় সহনশীল।' [সূরা বাকারাহ্ : ২৬১-২৬৩]।

যাকাত, একটি অর্থনৈতিক ইবাদাত। আল্লাহর পক্ষ হতে সামর্থ্যবান ঈমানদারদের জন্য নির্ধারিত ফরজ বা অবশ্য পালনীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। স্বত:প্রণোদিত দান ও যাকাত এক নয়। যাকাত প্রদানের পরও আল্লাহ স্বত:প্রণোদিত দানের জন্য উৎসাহিত করেছেন, যা বাধ্যতামূলক করা হয়নি।

যাকাত, স্বত:প্রণোদিত দান এবং কারদান হাসানান বা করজে হাসানা এগুলো অর্থনৈতিক টুলস্ যা সমাজে দারিদ্র বিমোচনে সর্বাধিক কার্যকর। 'কারদান হাসানান বা করজে হাসানা' এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে 'উত্তম ঋণ'। অর্থাৎ এমন ঋণ যা কেবলমাত্র সৎকর্ম অনুষ্ঠানের প্রেরণায় চালিত হয়ে নি:স্বার্থভাবে কাউকে দেয়া হয়। অনুরূপভাবে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করলে আল্লাহ তাকে নিজের জন্য ঋণ বলে গণ্য করেন। এক্ষেত্রে তিনি কেবল আসলটি নয় বরং তার ওপর কয়েকগুণ বেশী দেয়ার ওয়াদা করেন। তবে এ জন্য শর্ত আরোপ করে বলেন যে, সেটি 'করজে হাসানা' অর্থাৎ এমন ঋণ হতে হবে যা আদায়ের পেছনে কোনো উপরি অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিলের নিয়ত থাকবে না বরং নিছক আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার নিয়তেই এ ঋণ দিতে হবে। ঋণ লেনদেনের ক্ষেত্রে লিখিত রাখা

www.pathagar.com

ইসলামের বিধান এবং তাতে সাক্ষীও রাখতে হবে। আল্লাহ্ বলেন, 'হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরস্পর ঋণের লেনদেন করবে, তখন তা লিখে রাখবে। যার ওপর পাওনা [চাপছে] সে [ঋণগ্রহীতা] যেন তা লিখিয়ে রাখে। আর সে যেন তার রব আল্লাহকে ভয় করে [তাকওয়া অবলম্বন করে] এবং পাওনা থেকে যেন সামান্যও কম না দেয়। আর তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী রাখ। অতপর যদি তারা দুজন পুরুষ না হয়, তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন নারী- যাদেরকে তোমরা সাক্ষী হিসেবে পছন্দ কর। আর তা [ঋণ] ছোট হোক কিংবা বড় তা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করতে তোমরা বিরক্ত হয়ো না। এটি আল্লাহর নিকট অধিক ইনসাফপূর্ণ এবং সাক্ষ্যদানের জন্য যথাযথ। আর তোমাদের সন্দিহান হয়ে না পড়ার অধিক নিকটবর্তী।' সূরা বাকারাহ্ : ২৮২]। এবং তা এমন কাজে ব্যয় করতে হবে যা আল্লাহ্ পছন্দ করেন। হালাল যে কোনো কাজে এই ঋণ বিনিয়োগ বা ব্যয় করার ক্ষমতা– হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলিম ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অভাবী মানুষের বেঁচে থাকার সহায়। এটিই মানবিক সমাজ নিমার্ণের অর্থনৈতিক নীতি এবং বিশ্ব থেকে দারিদ্র দূরীকরণের কার্যকর উপায়।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কিংবা পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে যাকাত, স্বত:প্রণোদিত দান এবং করজে হাসানা বা উত্তম ঋণ এ জাতীয় কোনো ইকোনমিক টুলস নেই যা দারিদ্র দূরীকরণে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। অর্থনৈতিক এ বৈপ্লবিক চেতনা কেবল ইসলামেই রয়েছে। আর তাই অর্থনৈতিক এই চেতনার সুফল হিসেবে আল্লাহর দেখানো পথে যারা অর্থনীতিকে পরিচালিত করছে, আরবের সেইসব দেশে এখনও পর্যন্ত দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী কোনো মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না। আমাদের বাংলাদেশে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা কোটি ছাড়িয়েছে। প্রসঙ্গত : উল্লেখ্য, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কিংবা পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে যাকাত, স্বত:প্রণোদিত দান এবং করজে হাসানা বা উত্তম ঋণ জাতীয় কোনো ইকোনোমিক টুলস না থাকলেও সেখানে সিএসআর বা করপোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি নামে কিছু চ্যারিটেবল অর্থনৈতিক কার্যক্রম রয়েছে। যা বাংলায় প্রচলিত একটি বাগধারা 'গরু মেরে জুতা দান'-এর শামিল। যা পরিচালিত হয়, অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য অধিক বিপণণ-এর নীতির আলোকে।

৪. সামাজিক বৈপবিক চেতনা

মানবজাতির সামাজিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দুটি উপাদান- নারী ও পুরুষ। সমাজে নারী ও পুরুষের ভূমিকা ও অধিকার নিয়ে ধর্ম ও নানান আদর্শের যে

www.pathagar.com

অবস্থান সে অনুযায়ীই সংশ্লিষ্ট ধর্মের অধীনে বা আদর্শের অধীনে সমাজ গড়ে ওঠে। নারী ও পুরুষ সে অধিকার ভোগ করে এবং একত্রে সমাজে বসবাস করে। সামজিক জীবনে নারী ও পুরুষের অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আল্লাহ যে বৈপ্লবিক নির্দেশনা দিয়েছেন তা অনুসরণে একটি শৃংখলাপূর্ণ সমাজ নিমার্ণ করেছিলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সা]।

সামাজিক বৈপ্লবিক চেতনাগুলো ছিল এমন

ক. মানবিক সাম্যতা

জ্ঞানের বিবেচনায় নারী হোক বা পুরুষ হোক কারো সামাজিক মর্যাদায় ভিন্নতা থাকলেও মানবিক বিবেচনায় মানুষের মর্যাদা সমান।

আল্লাহ বলেন, 'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করে চলো, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি জীবন থেকে। আর সেই জীবন থেকেই সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে। আর এ দুটি জীবন থেকেই সৃষ্টি করেছেন-বহু নর ও নারী এবং চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন।' [সূরা নিসা : ০১]।

মানবিক বিবেচনায় যারা নারী-পুরুষের সাম্যতাকে অস্বীকার করে তারা ইগো বা অহংবোধ দিয়ে পরিচালিত। শুধু পুরুষ হওয়ার কারণে কোনো পুরুষ অধিক মর্যাদাসম্পন্ন নয়। আল্লাহ বলেন, 'হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে [নর-নারী নির্বিশেষে] আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।' [সূরা হুজুরাত : ১৩]।

মানুষ সৃষ্টির এই উৎস বিবেচনায় নর-নারীর মানবিক সাম্যতা প্রশ্নাতীত। আর অহংকারের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ [সা] বলেন, 'যার সাথে তার ভৃত্য আহার করে, সে অহংকারী নয়।' [বায়হাকী : ৭৮৩৯]।

খ. প্রতিদানের সাম্যতা

নারী ও পুরুষের গঠনগত পার্থক্য আল্লাহই দিয়েছেন। একজন পুরুষ শারিরীকভাবে নারীর চেয়ে সবল বলে তা যদি তার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হয় তবে সন্তান ধারণের অক্ষমতা তার নিকৃষ্টতার কারণ বিবেচ্য হয়। অন্যদিকে সন্তান ধারণ ও জন্মদানের সক্ষমতা বিবেচনায় নারী, নরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হলে শারিরীক সক্ষমতার দুর্বলতা তার নিকৃষ্টতার কারণ বিবেচ্য হয়। আল্লাহ, নারী ও পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি এবং তাদের ভূমিকার জন্য প্রতিদান দেয়ার

www.pathagar.com

বিষয় এভাবে নির্ধারণ করেননি। নারী ও পুরুষের জন্য আল্লাহ যা যা সৎকর্ম হিসেবে বিবেচ্য করেছেন, তাই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতিদানের মাপকাঠি।
আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কোনো পুরুষ অথবা কোনো নারী সৎকর্মপরায়নকারীর আমল নষ্ট করবো না। তোমরা একে অপরের অংশ।' [সূরা আলে ইমরান : ১৯৫]।
আল্লাহ আরো বলেন, 'যে সকল মুমিন সৎকর্মশীল ও পূণ্যবান হবে তারা নারী হোক বা পুরুষ হোক, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের পাওনা ও অধিকার বিন্দু পরিমাণও নস্যাৎ করা হবে না।' [সূরা নিসা : ১২৪]।
সৎকর্মের প্রতিদান বিবেচনায় আল্লাহ নর-নারীর মধ্যে কোনো মর্যাদার পার্থক্য রাখেননি। পুরুষ ও নারীর প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের সুখ বিবেচনায় যা যথার্থ হয় জান্নাতে তাই-ই আল্লাহ নারীকে বা পুরুষকে দেবেন। আর পৃথিবীতে তাদের দিবেন পবিত্র জীবন। পবিত্র জীবন বলতে পবিত্র জীবনোপকরণ, পবিত্র সম্পর্ক, চক্ষু শীতলকারী পবিত্র সন্তান, পবিত্র বন্ধু, পবিত্র চরিত্র, পবিত্র লেনদেন, পবিত্র মৃত্যু। মৃত্যু জীবনেরই অংশ। জীবনের অপর পিঠ।
আল্লাহ বলেন, 'যে মুমিন, সে নারী হোক বা পুরুষ হোক, যদি সৎকর্মশীল হয়, তবে তাদেরকে আমি এই পার্থিব জগতে পবিত্র জীবন দান করবো এবং তারা যা করতো তার তুলনায় অবশ্যই আমি তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিব।' [সূরা নাহল্ : ৯৭]।
মানবিক সাম্যতা ও প্রতিদান প্রাপ্তির সাম্যতার এই বৈপ্লবিক চেতনা ইসলাম ছাড়া আর কোথাও নেই, যা রাসূলুল্লাহ [সা]-এর বিস্ময়কর বিজয়ের উৎস।

গ. সকল ধরণের মন্দকে ভালো দিয়ে প্রতিহত করা

ভালো আর মন্দ নিয়েই সমাজ। সমাজে মন্দ নিয়ে যত দুশ্চিন্তা তত চিন্তা আর কিছু নিয়ে করার প্রয়োজন হয় না। সমাজের শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখতে সব স্তরেই মন্দকে দূর করার কথা ভাবতে হয়। আর এই ভাবনার সাধারণ প্রবণতা হলো মন্দকে মন্দ দিয়ে মোকাবেলা করা বা উৎখাত করা। কিন্তু মন্দকে মন্দ দিয়ে মোকাবেলার পরিণাম হচ্ছে মন্দের প্রসার লাভ করা। তাই আল্লাহ তার রাসূলকে জানালেন সমাজ থেকে মন্দ দূর করার এক বৈপ্লবিক চেতনার কথা। আল্লাহ বললেন, 'ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দকে প্রতিহত কর ভাল দ্বারা, ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা রয়েছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই, যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের

www.pathagar.com

অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই, যারা মহাভাগ্যবান।' [সূরা হামীম আস সাজদা : ৩৪-৩৫]।

৫. সাংস্কৃতিক বৈপ্লবিক চেতনা

সৌজন্যতাই একজন ব্যক্তি বা একটি জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রকৃত মাপকাঠি। নাচ, গান, নাটক, সিনেমা, খেলাধুলা ইত্যাদি সে জাতির বিনোদনের বিভিন্ন উপায়কে প্রতিফলিত করে। এই উপায় ব্যক্তি ও জাতিভেদে বিভিন্ন। এই উপায়গুলো সংস্কৃতি নয়। তাই পৃথিবীতে যে জাতি নাচ, গান, চলচিত্র, খেলাধুলায় যত বেশী নিমজ্জিত সে জাতি ততবেশী সংস্কৃতবান জাতি বলে বিবেচিত নয়। বরং যে জাতি যত বেশী সৌজন্য প্রকাশের অধিকারী সে জাতিই বিশ্বে ততবেশী সংস্কৃতবান বলে বিবেচিত হয়। আল্লাহ তায়ালা সে বৈপ্লবিক চেতনাই রাসূলুল্লাহ [সা]-এর মাধ্যমে মানব জাতিকে জানালেন। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদেরকে যখন অভিবাদন করা হয় [সৌজন্য প্রকাশ করা হয়] তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম প্রত্যাভিবাদন করবে অথবা তারই অনুরূপ করবে; নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী। ' [সূরা নিসা : ৮৬]।

হৃদয়ে চেতনা বা আদর্শ বা বিশ্বাসকে ধারণ করার অধিকার মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন আল্লাহ। 'দীন গ্রহণে জোর-জবরদস্তি নেই; সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়েছে।' [সূরা বাকারা: ২৫৬]। এবং সেই সাথে তিনি কোন্ চেতনাগুলো ধারণ করতে হবে তাও বলে দিয়েছেন তাঁর প্রেরিত রাসূলের মাধ্যমে এবং বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম চেতনা।' [সূরা আহযাব : ২১]। #

www.pathagar.com

হাজার সালাম

সাজ্জাদ হোসাইন খান

হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা নাম
তাঁর প্রতি সবার, হাজার সালাম।
তিনি শেষ নবী, নবীদের সেরা
তাঁর নামে আজো আলোকিত হেরা।
তাঁর কাছে এল আল্লাহর বাণী
বিশ্ব-ভুবনে তা হয় জানাজানি।
এই বাণী করে মানুষের ভালো
ভুবনে জীবনে থরে থরে জ্বালো।

আলোর পথিক

মানসুর মুজাম্মিল

সরল পথের পথিক তুমি
তুমি দয়ার দান,
পৃথিবীতে রেখে গেলে
অসীম অবদান।
সকল মানুষ তাইতো করে
তোমার গুণগান।

তুমিই দিলে
আলোর পথের দিশা
কাটিয়ে দিলে গভীর অমানিশা
তুমিই দিলে মোমিনের ভিসা।

www.pathagar.com

ছড়া
করলে আলো তুমিই জগতময়
তোমার মতো মানুষ কি আর হয়?
ভালোবাসায় করলে সকল জয়।

আমার নবী মোহাম্মাদ [সা]

নজরুল ইসলাম শান্ত

আমার নবী বিশ্বনবী
নুরনবী হজরত,
তার ছোঁয়াতে জগত বাসী
পেলো আলোর পথ।

কতো নবী এলো ধরায়
সবার উপর তিনি,
ইসলাম ধর্মের প্রধান বলে
আমরা তাকে চিনি।

সত্য ধর্মের সত্য নবী
ছিলেন আল্লাহ্ প্রেমে,
আল্লাহ্ প্রেমে আকাশ থেকে
ওহি আসতো নেমে।

নবীর বুকে দিতো গেঁথে
আল কুরআনের বানী
আমার নবী বিশ্বনবী
তাঁর আদর্শই মানি।

www.pathagar.com

চলচ্চিত্র তথা মিডিয়ার জন্য লেখালেখি

শেখ আবুল কাসেম মিঠুন

আমরা গণমাধ্যম বা মিডিয়াগুলোতে যা দেখি, শুনি বা পড়ি তা সবই একটি জাতির সংস্কৃতির প্রকাশ্য রূপ। গণমাধ্যম বলতে চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, কমপিউটার, রেডিও, মঞ্চ, পত্র-পত্রিকা, ভিসিডি, ক্যাসেট, বই-পুস্তক, ম্যাগাজিন সবই বুঝায়। আর এসবের মাধ্যমে যে সংস্কৃতির যোগান দেয়া হয় তার উপস্থাপনা একজন লেখকের চিন্তাপ্রসূত এবং বেশিরভাগই গল্পকেন্দ্রিক।

অনেক বিদেশি টিভি চ্যানেল খবর পড়ার মধ্যেই একটা বিশেষ খবরকে বিশ্বাসযোগ্য, রসময় ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলার জন্য গল্প দেখানোর মতো করে দেখায়। বাস্তব জীবনেও আমরা গল্প শুনতে ও বলতে ভালোবাসি।

অফিস থেকে ফিরে কেউ অফিসের গল্প বলে, দেশের বাড়ি থেকে ফিরে এসে প্রায় লোকই দেশের গল্প বলে। ছাত্ররা ছুটিতে বাড়ি গিয়ে কলেজ-ভার্সিটি এবং হোস্টেল বা মেসের গল্প বলে। দেশের বাড়ির কোনো আত্মীয় হলে মানুষ তার কাছে দেশের নানান গল্প শুনতে চায়। চিড়িয়াখানা, যাদুঘর বা সংসদ ভবনে কেউ গেলে বাড়ির লোক বা বন্ধুরা সেখানকার গল্প শোনার বায়না ধরে।

ছোটবেলায় বাবা-মা, দাদা-দাদী বা নানা-নানীর কাছে গল্প শুনতে চায়নি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। বিদেশ থেকে কেউ এলে তার কাছে বিদেশের গল্প শোনার জন্য তো রীতিমতো ভিড় লেগে যায়। মোটকথা, মানুষ সদা-সর্বদা কোনো না কোনোভাবে গল্প বলছে এবং শুনছে।

রসিয়ে রসিয়ে একটা সামান্য ঘটনাও কেউ কেউ এমনভাবে বলতে পারে যে, শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শোনে। আর রসিয়ে গল্প বলার জন্য ব্যক্তির একটা বিশেষ জনপ্রিয়তা বেড়ে যায় পরিচিত মহলে। গল্পের মাধ্যমে যেসব ঘটনা এবং বিষয়বস্তুর প্রকাশ ঘটে তা থেকে আনন্দের সঙ্গে মানুষ শিক্ষা, বৈধ-অবৈধ কর্মকাণ্ডের স্বরূপ এবং লাভ-ক্ষতির দিকগুলো ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

www.pathagar.com

আর এই গল্প চলচ্চিত্র তথা মিডিয়ার মূল উপাদান। সাহিত্য, কাব্য, সংগীতের মূল উপাদানও গল্প। কোথাও তা মূর্ত কোথাও তা বিমূর্ত, কোথাও তা মূখ্য কোথাও তা গৌণ, কোথাও তা প্রত্যক্ষ কোথাও তা পরোক্ষ।

টিভি, রেডিও, পত্র-পত্রিকায় যেসব সাক্ষাৎকার, আলোচনা, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠান আমরা দেখি সেসব অনুষ্ঠানের নেপথ্যে একজন লেখক সত্তার চিন্তা-ভাবনা সক্রিয় থাকে।

বিংশ শতাব্দির সূচনাতেই চলচ্চিত্রের আগমন। এরপর পর্যায়ক্রমে টিভি, রেডিও, ক্যাসেট প্লেয়ার, ভিডিও কমপিউটার, ইনটারনেট, মোবাইল ফোন এসেছে। আর এসব মাধ্যম আজ সমাজ-সংস্কৃতি ও সভ্যতার অন্যতম অনুষঙ্গ।

এসব মাধ্যমে মানুষ তার মনের চাহিদার প্রতিফলন দেখতে আগ্রহী। আজকের যুগে প্রায় প্রতিটি মানুষই গল্প খবর, ইতিহাস, জীবনাচরণ, বক্তব্য, দেশ-বিদেশের প্রকৃতি ইত্যাদি পড়ার চেয়ে বা শোনার চেয়ে দেখার দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ছে। এজন্য প্রকাশনার মাধ্যমটির সাথে যারা ব্যবসায়িকভাবে জড়িত, তারা তাদের ব্যবসা নিয়ে চিন্তিত। আর প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে যারা লেখক হিসেবে জড়িত তারা বেশিরভাগই দর্শনযোগ্য অর্থাৎ মিডিয়ার লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে আগ্রহী।

এখনতো দশ সেকেন্ডের একটা বিজ্ঞাপনচিত্রও গল্পভিত্তিক হয়ে গেছে। হয়তো সামনে এমন দিন আসবে যে, বক্তারা কষ্ট করে আর জনসভায় না গিয়ে তাদের বক্তব্য কমপিউটার ও ভিসিডির মাধ্যমে বাজারজাত করবেন। আর তার পেছনেও থাকবে একজন লেখকের সক্রিয় ভূমিকা।

তাই এই মুহূর্তে চলচ্চিত্র, টিভি, ভিসিডি, ক্যাসেট, মঞ্চ ইত্যাদির জন্য লেখালেখির কর্মটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লেখার কাজটি গদ্যসাহিত্য, কাব্য বা সংগীতের মাধ্যমে তৈরি হতে পারে। অর্থাৎ প্রথমে লেখার কাজ, তারপর চিত্রনাট্য, তারপর চলচ্চিত্র– এই হলো চলচ্চিত্রের সংক্ষিপ্ত ও সামগ্রিক রূপরেখা। আর ক্যামেরা হলো চলচ্চিত্রের বাহন।

লেখার পরের কাজগুলি সবই টেকনিক্যাল, আমি শুধুমাত্র লেখালেখি করার জন্য যে প্রস্তুতি, এই প্রবন্ধে সেই বিষয়েই আলোচনা করছি বিধায় তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার চেষ্টা করবো। আমরা সিনেমা, টিভি এবং কমপিউটারের পর্দায় যা কিছুই দেখি তা সবই চলচ্চিত্র। বিষয়বস্তু, বক্তব্য, সময়সীমা, উপস্থাপনা ও সামগ্রিক আঙ্গিকের বিচারে এসবের শ্রেণীভাগ করা হয়েছে। যেমন পূর্ণ দৈর্ঘ চলচ্চিত্র, স্বল্প দৈর্ঘ চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্র, বিজ্ঞাপন চিত্র, সংবাদচিত্র, টেলিফিল্ম,

www.pathagar.com

প্যাকেজ নাটক, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ইত্যাদি। আবার সংস্কৃতি সংক্রান্ত এসব মাধ্যমগুলোকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারেঃ

১. শব্দজনিত : ভাষা [সংলাপ], নৃত্য, সংগীত, নাট্যকলা ইত্যাদি।

২. টেকনিক্যালঃ বই পুস্তক মুদ্রণ, সংবাদপত্র, রেডিও, ভিসিডি ক্যাসেট [কারিগরি মাধ্যম] ইত্যাদি।

৩. ছবি ও শব্দ তরঙ্গজনিত বৈজ্ঞানিক মাধ্যমঃ কমপিউটার, টিভি ও চলচ্চিত্র। এই মাধ্যমগুলির প্রাণকেন্দ্র হলো চলচ্চিত্র।

একমাত্র চলচ্চিত্রের গর্ভেই উক্ত সকল মাধ্যমগুলোর আবাসস্থল। অতএব, একমাত্র চলচ্চিত্রের জন্য লেখার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারলে বাকি বিষয়গুলোর জন্য লেখা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, চলচ্চিত্রের লেখালেখির কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম বা পদ্ধতি নেই। শুধুমাত্র নিম্নের গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করতে পারলে চলচ্চিত্রের জন্য লেখালেখি করা সম্ভব। এই চারটিই একজন লেখকের জন্য মৌলিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য।

১. সাহিত্যবোধ

প্রচুর লেখাপড়া করতে হবে। ভালো সাহিত্য ভালো সাহিত্যবোধ তৈরি করে। অন্যান্য শিক্ষার জন্য ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণ কাহিনী, জীবন কাহিনী, রাজনীতি বিষয়ক পুস্তকাদি পড়া উচিৎ। বিশ্বের বিভিন্ন জনপদ, তাদের জীবনাচরণ, পেশা এবং মানুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা অর্জন করতে হবে। আর এসব জ্ঞান থেকে সুস্থ রুচিবোধ আয়ত্ত করা কর্তব্য।

২. চলচ্চিত্রবোধ

ভালো ভালো ছবি দেখতে হবে। সাধারণ দর্শকের আবেগী দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা নিয়ে ছবিগুলোর পরিবেশ, প্রকৃতি, চরিত্র, সংলাপ, চরিত্রের আচার-আচরণ ও নৈতিকবোধ দেখতে হবে। চলচ্চিত্র বিষয়ে রচনা পড়তে হবে।

৩. বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি

নিজের জ্ঞানবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্লেষণের ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। একজন যুক্তিবাদী প্রবন্ধকারের দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করতে হবে।

৪. মনস্তত্ত্ব

মানুষের অভিব্যক্তি, বিশেষ করে মানুষের দৃষ্টিপাতের অর্থ, মুখ ও শারীরিক অঙ্গভঙ্গির অভিব্যক্তি দেখে তার মানসিক অবস্থা নির্ণয় ও পছন্দ-অপছন্দ

www.pathagar.com

অনুধাবনের চেষ্টা করতে হবে। একজন লেখকের জন্য মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন ও চর্চা করা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

উক্ত চারটি মৌলিক বিষয় সম্বন্ধে চর্চা করা এবং জ্ঞান অর্জন করতে পারলেই যে ভালো লেখক হওয়া যাবে তা নয়। তবে লেখক হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করতে চাইলে উক্ত বিষয়গুলো আয়ত্তে থাকা চাই। এরপর অনুশীলন ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই ক্রমে ক্রমে চলচ্চিত্রের লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে।

উক্ত চারটি বিষয় একজন লেখককে লেখালেখি করার প্রধান প্রধান চারটি বৈশিষ্ট্যের দিকে ধাবিত করে: ১. পরিবেশ সৃষ্টি ২. চরিত্র সৃষ্টি ৩. অপ্রধান ঘটনার সঙ্গে প্রধান ঘটনার সংযোগ স্থাপন এবং ৪. খন্ড খন্ড পরস্পর বিযুক্ত বিষয়কে প্রধানত পরস্পরের সাহায্যে একটি অর্থসূত্রে গেঁথে তোলা।

চিত্রনাট্য রচনা ও সম্পাদনার কাজেও উক্ত চারটি বৈশিষ্ট্য সমভাবে প্রযোজ্য। এখন প্রশ্ন হলো, ইসলামী আন্দোলনের একজন কর্মী কি উক্ত গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করতে পারলে লেখক হিসেবে তার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হবে? এর জবাব এক কথায় 'না'। তাকে আরো কিছু অর্জন করতে হবে। কারণ একটা বিশেষ কিছু করতে গেলে বিশেষ কিছু জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা-ভাবনা, মূল্যমান এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকতে হবে। বিশেষ কিছু আকিদা বিশ্বাসকে ধারণ করতে হবে, তাকে ভিত্তি করতে হবে।

ইসলাম একটি বিশেষ জীবনব্যবস্থা, একটি বিশেষ আদর্শ। এই বিশেষ আদর্শকে ভিত্তি করে যখন কেউ কোনো কর্মকাণ্ড রপ্ত করতে চাইবে তখন অবশ্যই তাকে উক্ত আদর্শ প্রসঙ্গে ভালোভাবে জানতে ও বুঝতে হবে। কর্মের স্বরূপ হিসেবে ইসলামের নানামুখি শিক্ষা বিদ্যমান।

যেহেতু কর্মটি গণমাধ্যম ও গণমাধ্যমের জন্য লেখালেখি সেহেতু নিজেকে লেখক হিসেবে প্রস্তুত করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করা বাঞ্ছনীয়।

সূর্যের আলো ও রাতের কৃত্রিম আলোর মধ্যে বিস্তর তফাৎ। শুধুমাত্র ইসলামকে জেনে বুঝে গণমাধ্যমের জন্য কিছু রচনা করা, রাতের কৃত্রিম আলোর মতো। তা দিয়ে ব্যক্তির প্রয়োজন মেটানো সম্ভব। কিন্তু ইসলামকে জেনে বুঝে, আত্মস্থ করে ব্যক্তিজীবনে আমল করে, নিজের জ্ঞানবুদ্ধি বিবেক-বিবেচনা দিয়ে আত্মাকে প্রসারিত ও ব্যাপক এবং পবিত্র করতে পারলে তার দৃষ্টিভঙ্গির চিন্তা-ভাবনা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে সার্বজনীন, মানবীয় এবং সমগ্র মানবকল্যাণে সমৃদ্ধ। তখন তার আলো হবে সূর্যের আলোর মতো। শত্রু মিত্র সবার জন্যে তার প্রেমময়

www.pathagar.com

দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটবে। তখন লেখকের কলম যা লিখবে তা ইসলামী হবে বলেই বিশ্বাস করি। কারণ ইসলামকে জেনে বুঝে আত্মস্থ করা ও ব্যক্তি জীবনে আমল করার অর্থই হলো কুরআন ও সুন্নাহর চিরন্তন আলোক রাজ্যে অবগাহন করা। তার থেকে আলোই ঠিকরে বেরুবে, তা অন্ধকার বিলাবে না। যেমন বরফের কাছে আমরা ঠান্ডারই আশা করি। বরফের কাছে কেউ তাপ আশা করে না।

একমাত্র ইসলামেই রয়েছে ব্যাপক বিস্তৃত চিন্তার রাজ্য, আর সেই চিন্তার আলোকে অজস্র কিসিমের রচনা লেখা সম্ভব। বর্তমানে একটা ইসলামী টিভি চ্যানেল চালাবার মতো কেনো অনুষ্ঠান তৈরি করা হয়তো আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে যে বিপুল প্রতিভাদীপ্ত তরুণদের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তারা যদি লেখালেখির জন্য প্রাথমিকভাবে নিজেদেরকে প্রস্তুত করেন তবে তাদের দ্বারা বিপুল সংখ্যক চলচ্চিত্রই শুধু নয়, এমন সব বিভিন্নমুখী অনুষ্ঠান নির্মাণ সম্ভব যা দিয়ে একটা মাত্র ইসলামী টিভি চ্যানেল নয়, চার পাঁচটা টিভি চ্যানেল দিবারাত্র চালানো সম্ভব। ইসলামে এতো বিপুল, ব্যাপক ও বিশাল চিন্তার অবকাশ রয়েছে, আরো রয়েছে আগ্রহী প্রতিভাধর মেধাবী সব শিল্পী ও লেখক।

ইসলামী শিক্ষা আত্মস্থ করার পর, একজন লেখক যদি কোনো সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানের প্রশ্নমালা তৈরি করেন তবে প্রশ্নের স্টাইল এবং অর্থই হবে অন্য ধরনের। প্রশ্নগুলো জাহিলীর পরিবর্তে হয়ে উঠবে মানবিক, সার্বজনীন এবং পূর্ণাঙ্গ ঐতিহ্যমাখা, যা সাধারণ দর্শকদের অন্তর্লোকে কারো প্রতি বিদ্বেষের বীজ বপন করবে না, বরং একটা পজেটিভ চিন্তাধারার চর্চা হবে। এমনিভাবে কোনো আলোচনা অনুষ্ঠান, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, বিজ্ঞাপন চিত্রের ভাষা এমনকি খবর পাঠের ভাষা, রঙ, রূপও বদলে যাবে। জাহেলিয়াত ও ইসলামের পার্থক্য শুধু সামান্য কতোগুলো মোটা দাগের চিন্তা ভাবনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এ পার্থক্য শোয়া, ঘুমানো, উঠাবসা, পানি খাওয়া থেকে শুরু করে আলাপচারিতা, সম্বোধন, ভাষা ও শব্দবিন্যাসে এবং শেষমেষ যুদ্ধ, সন্ধি সবকিছুতেই সেই পার্থক্যই ফুটে উঠবে একজন লেখকের কলমের ডগায়। কিন্তু ইসলামকে সঠিকভাবে না জেনে না বুঝে না গ্রহণ করে যদি কেউ কিছু লেখেন তবে তার লেখা দেখে মনে হবে তিনি মডেল হিসেবে জাহেলিয়াতকে সামনে রাখছেন, জাহেলিয়াতকে তিনি মানদন্ড হিসেবে স্থির করেছেন। তাই তার লেখাগুলো জাহেলিয়তের ট্রাজেডি, কমেডি ও রোমান্টিকতায় পূর্ণ হতে পারে।

www.pathagar.com

না– ইসলাম তা নয়। আর তা যে নয় তা বুঝতে গেলে প্রথমে যা দরকার তা হলো মন-মস্তিষ্ক থেকে সমস্ত জাহেলি দৃশ্যপট ও চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে হবে। পারিবারিক, সামাজিক ও পেশাগত পরিবেশের সমস্ত লোকজন ও বন্ধু-বান্ধব সম্পূর্ণ ইসলামী জ্ঞানে সমৃদ্ধ ও ইসলামী চেতনায় উদ্দীপ্ত হতে হবে। তা না হলে তা সযত্নে বর্জন করতে হবে। চোখের মধ্যে গুঁজে কিছু দেখা যায় না। বস্তুকে একটু দূরে রাখলেই তা দেখা যায়। তদ্রুপ জাহেলিয়াতের বায়ুমন্ডলে ডুবে থেকে জাহেলিয়াতকে চেনা সম্ভব নয়। ঈমানের সমুদ্রে ডুবে থেকে দূর থেকে জাহিলিয়াতকে দেখতে হবে। জাহেলি সংস্কৃতি যে কোনো মডেল বা মানদন্ড নয়, ইসলাম যে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতির আধার এই সত্যটিকে স্পষ্ট দৃঢ়মূল ধারণা ও বিশ্বাসে যুক্তিসহ প্রথিত করতে হবে। যুক্তিসহ এই কারণে যে, একজন লেখককে যুক্তি প্রদর্শন করতে হয়। একজন লেখক যুক্তিবিষয়ক জ্ঞান লাভ করতে পারবেন যদি তিনি মাওলানা আবুল আলা মওদুদীর রহ. এর রচনাগুলো গভীর অর্ন্তদৃষ্টি সহকারে পাঠ করেন। সঙ্গে সঙ্গে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী [র]-এর হুজাতুল্লাহিল বালিগাহ এবং অনুষঙ্গ হিসাবে মাওলানা আকরম খাঁ রচিত মোস্তফা চরিত, সাহাবা কেরাম রা.দের জীবনী ইত্যাদি পাঠ করেন।

পৃথিবীর সবকিছু নির্দিষ্ট বন্ধনের মধ্যেই প্রয়োজনীয় এবং কার্যকরী ও কল্যাণময় হয়ে ওঠে। পূর্ণ স্বাধীনতা কখনো কল্যাণ বয়ে আনে না। মানুষের চিন্তাকেও নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে থেকে ধাবিত করতে হয়। যতো বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসাবিদ, অঙ্কবিধ, যতো শ্রদ্ধাভাজন নেতা, সমাজসেবক সবাই চিন্তা করেছেন নির্দিষ্ট গন্ডিতে এবং সেই বন্ধনেই সফল হয়েছেন। যারা চিন্তার কোনো বন্ধন মানেন না তারা নিজেরা যেমন বিভ্রান্ত, অন্যকেও ভ্রান্ত পথে তারা চালাবার চেষ্টা করেন। আসলে তারা মানবতার জন্য অকল্যাণকর। বিক্ষিপ্ত মাটি তখনই কার্যকরী হয় যখন তা একটা নির্দিষ্ট বন্ধনের খাপে ভরে ইট তৈরি হয়। আমরা যা কিছু দেখি, ব্যবহার করি তার সবই নির্দিষ্ট বন্ধনে আবৃত। চিন্তাকেও একটা সত্য ও সঠিক বন্ধনের আওতায় লালন করলেই তা কার্যকরী, কল্যাণকর ও সৃজনশীল হয়ে ওঠে। আর সেই সত্য ও সঠিক বন্ধনটি হলো ইসলাম। পবিত্র কুরআন ও রাসূল [সা]-এর হাদিস।

উপরোক্ত আলোচনার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে এটুকু নিশ্চিন্তে ও নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, চিন্তা-ভাবনা, অনুভব, উপলব্ধি, অনুধাবন ক্ষমতা এবং মন-মস্তিষ্ক ও হৃদয়াবেগকে জাহেলিয়াতের বিক্ষিপ্ততা, বিশৃঙ্খলা ও সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত এবং পবিত্র করে ঈমানের চিরন্তন পবিত্র বন্ধনে বন্দি হতে হবে। ঈমানের ওপর ভিত্তি করেই পৃথিবীকে, মানুষকে, প্রাণী জগৎকে এবং বস্তুকে দেখতে হবে, ভাবতে হবে।

www.pathagar.com

আপাতত দৃষ্টিতে জাহেলিয়াতের কোনো কর্মপদ্ধতিকে ভালো বা কল্যাণময় মনে হতে পারে, কিন্তু সেই ভালোর মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে অকল্যাণের পাহাড়। ইসলামের ভালো ও কল্যাণময়তা দিয়েই তাকে যাচাই করে নিতে হবে, তবেই প্রকৃত ভালো ও কল্যাণময়তার সন্ধান পাওয়া যাবে। কারণ জাহেলিয়াতের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি আর ইসলামের সর্বব্যাপী উদার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে রয়েছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

ছোট্ট একটা মাত্র উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টির সঠিকরূপ ধরা পড়ে– যেমন নায়ক কোনো বস্তিতে গিয়ে খাদ্য বস্ত্র অর্থ বিলিয়ে দেয় গরিবদের মধ্যে [বাস্তবে রাজনীতিবিদরা যেমনটি করেন]–এর পরিণামে দেখা যায় দর্শকরা নায়কটিকে ভালোবেসে ফেলে। তার কান্নায় কাঁদে, তার হাসিতে হাসে, তার কষ্টে কষ্ট অনুভব করে। এমন কি নায়কের এমনসব কর্মে নায়িকাও তাকে ভালোবেসে ফেলে।

জাহিলী দৃষ্টিতে নায়কের এই কাজটি ভালো কাজ নিঃসন্দেহে। কারণ জাহিলি বুদ্ধিজীবী ও নেতারা বলেন, মানুষ এতে গরিবদের সেবা করতে প্রেরণা পাবে। গরিবরাও উপকৃত হবে, এই ধরনের নানাবিধ যুক্তি দেখিয়ে জাহিলি দার্শনিক বুদ্ধিজীবী ও শাসক নেতাদের মতামত পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। জীবনের সকল দিক এমনকি শিশু থেকে তাবৎ মানুষের মন-মস্তিষ্ক, চিন্তাধারার রঙ, রূপ, রস, আর্বতন ইত্যাদি নিয়ে যে মনোবিজ্ঞান নামক পুস্তকাদি রচিত হয়েছে যা কলেজ ভার্সিটিতে পড়ানো হয় তার মধ্যে মানুষের আনন্দ, বেদনা, দুঃখ, বিরক্তি, রাগ, হিংসা-বিদ্বেষ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা বিস্ত ারিত মতামত পেশ করেছেন, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। এমনিভাবে, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি বিষয়ক পুস্তকাদি এক কথায় মানুষের মানবিক নৈতিক ও আদর্শিক বিষয়ে যতো দিক আছে– যা ঐসব পুস্তকাদির মাধ্যমে ভালো, কল্যাণময় হিসেবে সর্বজন গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা চলছে বিগত তিন শতাব্দি থেকে, আপাতত দৃষ্টিতে তার কল্যাণকারিতা বিশেষ কিছু শ্রেণীর মধ্যে বিচরণ করলেও পৃথিবীর কোনো অংশেই বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর মধ্যে তার কল্যাণকারিতা চোখে পড়েনি। মানুষ শুধু আশায় থাকে হয়তো তাদের ভাগ্যেও কল্যাণকারিতা জুটবে। কিন্তু গভীরভাবে ইসলামী মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সংস্কৃতি বিষয়ক পুস্তকাদি অধ্যয়ন করলে বোঝা যাবে, জাহেলী সমস্ত মতবাদ ও নিয়ম-প্রথা, রসম-রেওয়াজ ভুল এবং ব্যর্থ। আজও ইসলামী মতবাদ, সভ্যতা-সংস্কৃতি, আইন-কানুন সফল এবং কেয়ামত পর্যন্ত সর্বশ্রেণীর সমাজে তা সফলতাই বয়ে আনবে। অহংকারী,

www.pathagar.com

লোভী, স্বার্থান্ধ, প্রভূত্বপ্রিয় এবং প্রতিহিংসাপরায়ণতার দোষে দুষ্ট ব্যক্তিরা সমাজের শত্রু, ইসলাম এদের শত্রুজ্ঞান করে এবং এরাও ইসলামকে শত্রুজ্ঞান করে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা চালায়।

নায়কের উদাহরণটিতে আবার ফিরে আসা যাক– নায়ক যে ভালো কাজ করলো তার ফলে কিছু দর্শক খুশি হলো, নায়িকা তাকে ভালোবাসলো। অর্থাৎ সবাই প্রত্যক্ষ বা পরক্ষভাবে নায়কটির মতো হতো চাইলো। নায়কটি পার্থিব স্বার্থ হাসিল করতে চেয়েছিলো অর্থাৎ নায়িকাকে পেতে চেয়েছিলো তা সে পেলো। এখন কেউ যদি বলে 'কই, নায়ক তো কোথাও বলেনি যে সে এই কাজ করে নায়িকাকে পেতে চায়, কিন্তু সে রকম উদ্দেশ্য তার ছিলো না।' কিন্তু যদি প্রশ্নকর্তাকে উল্টো প্রশ্ন করা হয় তাহলে নায়ক এমন দান-খয়রাত করলো কেনো? গরিবরা উপকৃত হবে বলে? সে নিজে তৃপ্তি পাবে বলে? লোকজন তাকে সম্মান দেবে বলে? প্রশ্নকর্তা হয় তো বলবেন, হ্যাঁ। যদি হ্যাঁ অথবা না যাই ধরে নেয়া যায় তার শেষমেষ ফল হবে এই যে, এতে দর্শক ও নায়িকার মনে জন্মাবে শিরক। কোনো বিশেষ মানুষের নিজস্ব আদর্শের ওপর শর্তযুক্ত অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা, যা পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করবে মানুষ এবং মাকড়সার জালের মতো ফিতনা জন্ম নেবে মানুষের অন্তরে। সমাজে তার প্রকাশ ঘটবেই। শিরকবাদী মানুষ শিরক উদ্ভুত ফ্যাসাদে লিপ্ত হবে। নেতাপূজা, ব্যক্তিপূজা, মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি, বিদ্বেষপরায়ণ জনগোষ্ঠি তৈরি, সঙ্কীর্ণ চিন্তার প্রসার, মানুষকে সফলতার মাপকাঠিতে শ্রদ্ধাভাজন করে তোলার পরও সংকীর্ণ স্বার্থ আদায়ই হয় তার মূল টার্গেট- নায়িকাকে পাওয়া, মানব সেবা নয়। বিচার করা হয় না মানুষটি কোন পথে কিভাবে সফল হলো। আদি রসাত্মক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদেরকে আদর্শ মনে করা তাদের মতো ইন্দ্রিয়পূজারী হতে চাওয়া, মানুষের অবাধ স্বাধীনতা স্বীকার করা, এর ফলশ্রুতিতে সমাজে অস্থিরতা ও হিংস্রতার ব্যপ্তি ঘটানো এসবই জাহিলি ভালো ও কল্যাণময়তার প্রকাশ্য রূপ এবং ফসল। দর্শক সহজেই শিখে যায় উদারতার ভান করে কী করে নায়িকাকে আকৃষ্ট করা যায়।

এখানে দেখা যাচ্ছে, নায়ক পার্থিব স্বার্থ হাসিলের শর্তে ভালো কাজ করছে। দ্বিতীয়ত: সাধারণ মানুষের শর্ত হলো তুমি এই ধরণের কাজ করলে আমরা তোমাকে বরণ করবো। অথচ ইসলাম এই কাজ করতে বলে 'শর্তহীন' চিত্তে, আল্লাহকে ভালবেসে, মানুষ ও মানবতার কল্যাণের জন্য। প্রত্যেক নবী-রাসূলই এই আহবান জানিয়েছেন এবং শর্তহীনভাবে ভালো কাজ করার শিক্ষা দিয়েছেন।

www.pathagar.com

আল্লাহর সন্তুষ্টির বাইরে হাজার রকমের লোক হাজার ধরনের ভালো ভালো কথা বললেও বা ভালো ভালো কাজ এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও তার ফল দাঁড়ায় এমন যে, পাত্র একদিকে ভরলে অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়, সেদিকে চাপলে এদিক দিয়ে উপচে পড়ে যায়। কোনোদিকেই সামাল দেয়া যায় না। বহুজাতিক কোম্পানির অষুধের মতো এক রোগ সারলেও অন্যরোগ ধরে।

জাহেলী মানুষের ভালোবাসার মধ্যেও কোনো কল্যাণকারিতা নেই। কারণ জাহেলিয়তের সব ভালো ও কল্যাণকারিতা ঈমানহীন ও স্বার্থান্ধ। উল্লিখিত নায়ক যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য দান খয়রাত করতো তবে নায়িকা এবং দর্শকরাও আল্লাহ আকবর বলে ধক্ষনি তুলতো। তারা আর শিরকে লিপ্ত হতো না এবং সবার মনে এই আগ্রহই জন্মাতো যে, তারা আল্লাহর জন্যই দান-খয়রাত করবে। তখন ব্যক্তি নায়ক পূজনীয় হতো না–আল্লাহই যে একমাত্র মালিক একথাই প্রতিষ্ঠিত হতো। আর এই কর্মের জন্য নায়ক নায়িকার রিপু তাড়িত ভালোবাসাকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতো। নায়িকা ভালোবাসতো আল্লাহকে, পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য দান খয়রাত করা কোনো ব্যক্তিকে নয়। এমনিভাবে সমস্ত দুনিয়ায় ঈমানের সঙ্গে সৎকাজ শুধু কল্যাণই ছড়ায়। ফিতনা ফ্যাসাদ দূরীভূত হয়। তখন হাজার কোটি লোকের হাজার কোটি ভালো কথা ও ভালো পদক্ষেপ নেবার দরকার হয় না– তখন একজন আবু বকর [রা] অথবা একজন হযরত ওমর [রা]-এর একটি কথাই ডালপালা বিস্তার করে সমস্ত পৃথিবীতে কল্যাণের শীতল বৃষ্টিপাত ঘটাতো এবং আজও ঘটাবে ইনশাআল্লাহ। জাহেলিয়াতের প্রতিটি ভালোকে গভীরভাবে চিন্তা করলে তার ভিতরের সমস্ত অকল্যাণকারিতা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে।

আমাদের বুদ্ধি বিবেচনা আর জ্ঞানের বাইরেও বহুবিদ মন্দ এবং অকল্যাণ রয়েছে যার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও আমাদের জ্ঞানের বাইরে, এখনো উদঘাটিত হয়নি এমন বহু ভালোর মধ্যে খারাপ রয়েছে। তাই এমন সব বিষয় নিয়ে লিখতে হলে সেখানে অন্ধভাবে ঈমান সহযোগে তা লিখতে হবে, যা আল্লাহপাক হুকুম করেছেন। তাহলে অবশ্যই সেইসব রচনার কল্যাণকারিতা প্রতিটি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে চিরন্তন স্পর্শ ফেলবে। শুধুমাত্র লেখককে চারটি বিষয় আস্থা রাখতে হবে।

১. আল্লাহ, আখেরাত ও রিসালাতের প্রতি পূর্ণ ঈমান

২. আল্লাহর সঙ্গে লেখকের নিজস্ব সম্পর্ক দৃঢ়তর করা

৩. রচনায় বা গল্পে, পরিবেশ, চরিত্র, ঘটনা ও সংলাপ রচনায় নীতিগত বৈশিষ্ট্য রক্ষায় আল্লাহর প্রতি ভয় পোষণ। যেমনঃ পুত্র কখনো পিতার কাঁধে হাত রেখে

www.pathagar.com

বলবে না– হ্যালো ড্যাড, আমি ঐ মেয়েকে ভালোবাসি। ইসলাম পিতাপুত্রের বন্ধুত্ব সম্পর্ক রক্ষার কথা বললেও সেখানে নৈতিকতার বন্ধন আছে। পুত্র পিতাকে সম্মান করবে, ভয় করবে, মান্য করবে এবং লজ্জা করবে– এটাই ইসলামী নৈতিকতা। জাহেলিয়াত এই নৈতিকতাকে অনুসরণ করে এসেছে দীর্ঘকাল। এখন জাহেলিয়াতের চাকচিক্যে সবকিছু ভুলে গিয়ে এই অনৈতিকতাকে ইসলাম অনুসরণ করতে পারে না। এ ধরনের অনৈতিকতায় পরিবার ও সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়।

৪. চরিত্রগুলির আচার-আচরণ, লেন-দেন, কথা-বার্তা সংযোজনে পরকালকে সামনে রাখতে হবে। মোটকথা, আল্লাহর আইনকে মান্য করা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা, তাকে সমর্থন করা, অনুসরণ করা একজন লেখকের অবশ্যই ফরজ। রাসূলুল্লাহ [সা] আল্লাহর প্রতিটি আইনের সামনে মাথা নত করে দিয়েছেন এবং মান্য করেছেন, প্রতিষ্ঠা করেছেন।

উক্ত বিষয়গুলি অধ্যবসায়, অনুশীলন ও সাধনার মাধ্যমে নিজের জীবনে প্রতিফলিত করতে পারলেই তার রচনার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে তা লক্ষ্য করা যাবে বা ফুটে উঠবে। লেখক হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য উপরোক্ত বিষয়গুলি একান্ত প্রয়োজন। এতোক্ষণ যে যে বিষয়ের ওপর আলোচনা হলো– যেমন সংস্কৃতি সংক্রান্ত গণমাধ্যমের জন্য চারটি মৌলিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য, চারটি প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ও চারটি বিষয় ভালো করে রপ্ত করা, বুঝা, অনুধাবন ও আত্মস্থ করার পর লেখককে ভাবতে হবে এই আদর্শকে তিনি প্রতিটি ব্যক্তিজীবনে, পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। কারণ আল্লাহপাকের ঘোষণা অনুযায়ী মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার মূলমন্ত্র অর্থাৎ আল্লাহর দীন পৌঁছে দিয়ে তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্বের পথে ডাক দেবার দায়িত্বে তিনি নিয়োজিত।

মনে মস্তিস্কে এই বিশ্বাস গেঁথে নেবার পর লেখার জন্য পাঁচটি মৌলিক উপাদান তাকে আত্মসমালোচনার মাধ্যমে বুঝে নিতে হবে।

১. পার্থিব জীবন সম্পর্কে লেখকের ধারণা।

২. লেখকের জীবনের চরম লক্ষ্য।

৩. লেখকের বুনিয়াদী আকীদা ও চিন্তাধারা।

৪. সংগঠনিকভাবে লেখক প্রশিক্ষিত কি না।

৫. সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে লেখকের সম্যক ধারণা আছে কি না।

www.pathagar.com

দুনিয়ার প্রত্যেক সংস্কৃতি এই পাঁচটি মৌলিক উপাদান দিয়েই গঠিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, ইসলামী সংস্কৃতিও সৃষ্টি হয়েছে এই উপাদানগুলোর সাহায্যই। [মাওলানা মওদূদী [র] ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা।]

প্রবন্ধের প্রথম থেকে আলোচিত গুণ বৈশিষ্ট্যগুলো এবং উপরোক্ত পাঁচটি উপাদানকে সমন্বয় ঘটিয়ে এক একজন লেখক যদি নিজেকে প্রস্তুত করেন তবে চলচ্চিত্র ও মিডিয়া ইসলামী সংস্কৃতির জোয়ার আনতে পারবে, যে জোয়ারে ভেসে যাবে জাহেলীয়াতের সমস্ত অপসংস্কৃতির শয়তানি খেলা।

আগ্রহী পাঠকদের সুবিধার্থে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উপরোক্ত পাঁচটি মৌলিক উপাদানের তিনটি উপাদানের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জানার জন্য তারা মাওলানা মওদূদী রচিত 'ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা' বইটি পড়তে পারেন। বাকি দুইটি উপাদান যথা 'ব্যক্তি সংগঠন' যা আমি 'সাংগঠনিকভাবে লেখক প্রশিক্ষিত কিনা' হিসেবে উল্লেখ করেছি এবং সমাজব্যবস্থা' সম্পর্কে জানার জন্য মাওলানা তাঁর রচিত 'হাকীকত সিরিজ' এবং 'ইসলামের জীবন পদ্ধতি' পুস্তকের নাম উল্লেখ করেছেন।

যারা চলচ্চিত্র বা মিডিয়ার জন্য লিখতে আগ্রহী তারা এই প্রবন্ধের অন্যান্য গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জনের পাশাপাশি অবশ্যই ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা, হাকীকত সিরিজ এবং ইসলামী জীবন পদ্ধতি পড়বেন, বারবার পড়বেন।

একজন লেখক যদি যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারে তবে মিডিয়ার জন্য তার লেখার মধ্যে কোনো বিকৃতি থাকবে না। আর যথার্থ জ্ঞান বলতে একমাত্র আল্লাহপাকের কুরআনের জ্ঞান। কুরআনের জ্ঞান ছাড়া অন্য কোনো উৎসের জ্ঞান ত্রুটিযুক্ত। ত্রুটিযুক্ত শিক্ষা ও সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে বলেই তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। কল্যাণ থাকলে ইসলামী জ্ঞানের প্রয়োজন হতো না। অতএব লেখককে কুরআন ও হাদিস বারবার অর্থসহ বুঝে পড়তে হবে।

আগেই বলেছি, জাহিলি চলচ্চিত্র বা মিডিয়ার প্রদর্শন ইসলামী মিডিয়ার মডেল বা মানদন্ড হতে পারে না। ইসলাম একটি আদর্শ একটি চিরন্তন জীবনব্যবস্থা। অন্ধকার নেমে এলে যেমন আলো জ্বালাতে হয়, জাহিলি সমাজে তেমনি ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হয়। আর ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যারা লিপ্ত তারা যা কিছু প্রচেষ্টা চালাবে তা ঐ ইসলামী আদর্শ মোতাবেক। ভিন্ন আদর্শে ইসলাম প্রতিষ্ঠা চলে না। অতএব আদর্শটিকে আমাদের ভালোভাবে বুঝতে হবে। আর শুধু বুঝলে হবে না– পূর্ণাঙ্গ ঈমানের সাথে বুঝতে হবে। মেনে নিতে হবে। পালন করতে হবে।

www.pathagar.com

আন্দোলনে শরিকদের শুধু প্রতিভা থাকাটাই যথেষ্ট নয় বরং ঈমানের সঙ্গে জেনে বুঝে প্রতিভার বিকাশ ঘটানো প্রয়োজন। এজন্য তাফহীমুল কুরআন, ইসলামী সাহিত্য, রসূল সা.-এর জীবন ও সংগ্রাম, সাহাবা রা.দের জীবন ও কর্ম গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে। এছাড়াও নিম্নের বইগুলো পড়া যেতে পারে।

১. আল জিহাদ
২. উপমহাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলন ও মুসলমান
৩. ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন
৪. ইসলমের রাজনৈতিক মতবাদ
৫. শান্তিপথ
৬. ইসলামের শক্তির উৎস
৭. ইসলাম ও জাহেলিয়াত
৮. মুসলমানদের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মসূচি
৯. ইসলামে নৈতিক দৃষ্টিকোণ
১০. পলাশী থেকে বাংলাদেশ
১১. পর্দা একটি বাস্তব প্রয়োজন
১২. ইসলামী বিপ্লবের পথ
১৩. সত্যের সাক্ষ্য
১৪. নির্বাচিত রচনাবলী
১৫. রাসায়েল মাসায়েল

অন্যান্য রচনাবলীর মধ্যে শেখ সাদী [রা]-এর গুলিস্তা, বোস্তা এবং ইমাম গাজ্জালী [রা] রচিত পুস্তকাদি লেখকের জন্য উপকারী গ্রন্থ। যদিও ইমাম গাজ্জালী [রা] রচিত পুস্তকাদীতে বর্ণিত কিছু হাদিস বিতর্কিত, তাই সুবিধার্থে সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করতে হবে।

মহান আল্লাহ পাকের কাছে সাহায্য চেয়ে উক্ত বিষয় এবং পুস্তকগুলো পড়ে যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হবে–সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে চলচ্চিত্র ও মিডিয়ার জন্য লেখালেখি করলে সেই লেখাগুলো ইসলাম সমর্থিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আল্লাহই একমাত্র সাহায্যকারী ও জ্ঞানদাতা এবং আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। #

www.pathagar.com

পরিত্রাণ

মাহমুদুল হাসান নিজামী

হিজাযের কাফেলা দূর মদিনার পথে চলেছে আজ
মজলুমানের পেশানীতে ছিল অত্যাচারের ভাঁজ
বদরের চাঁদ মহী আকাশে মা আমিনার ঘরে
জেগে ওঠোরে মুক্তিকামী নতুন দিনের তরে।

মানুষ নহে মানুষের দাস মানুষ আজি স্বাধীন
মানুষে মানুষে নেই ভেদাভেদ বাজলো সুরের বীণ
আরব আজম বিশ্ব জুড়ে এই বীণা সুর বাজে
রাসূলাল্লাহ এসেছেন গো মানবতার সাজে।

মোহাম্মাদুন্ আল আরাবী গাওরে পাখি গান
নবীন প্রভাত নবীন সুরে পাইবে পরিত্রাণ।

দু'টি কবিতা

নাজিব ওয়াদুদ

১. তোমার তুলনা তুমি

কার সাথে তোমার করব তুলনা বলো !
তোমার তুলনীয় কিছু নেই এই পৃথিবীতে...
খোদার রঙে রঙিন তুমি হে নবী–
তোমার তুলনা কেবল তুমিই নিজে !

পাহাড়ের মতো যদি বলি
পাহাড় শরম পায়।
মুক ও বধির সে
তথাপি দেখ না কীভাবে মুখ লুকায়!

www.pathagar.com

যদি বলি মহাসমুদ্রের মতো তুমি
তা-ও ভুল হয়।
কেননা বড্ড নোনা তার পানি– বিষের মতোন।
অথচ তোমার হৃদয়-মাঝে বহে যে সাগর
বেহেস্তী সুবাসে তা
গোলাপকেও হার মানায়।
তাকওয়ার প্রজ্ঞা তোমাকে পূর্ণিমার চাঁদের চেয়েও
উজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ করেছে–
তার কি তুলনা হয়?

খোদার রঙে রঙিন তুমি হে নবী–
তোমার তুলনা কেবল তুমিই তুমি।

২. আমাদের নবী

খেজুর পাতার মাদুর বিছিয়ে তাতে
ঘুমাতেন তিনি, শুকনা রুটিও জুটতো না তার পাতে
তাতেই শোকর করতেন যিনি
আমাদের নবী, দুই-জাহানের প্রিয় নেতা তিনি।
ঘুমহীন রাত চোখের পানিতে কাটতো প্রার্থনায়
উম্মত যেন ধন-জন-মোহে দিশা না হারায়।
সারারাত জেগে থাকতেন ঠায় দাঁড়িয়ে সালাতে
মুসলিম যেন মুষড়ে না পড়ে তাগুতি আঘাতে
ভুল ত্রুটি পাপ করলে কখনো করে না যেন সে দ্বিধা
ক্ষমা চেয়ে নিতে– চলে যেন পথ সিধা।
কালো কিবা ধলো মালিক চাকর নেই ভেদাভেদ
সমাজে রাষ্ট্রে ছড়াবে না ক্লেদ–এই ছিল তাঁর ব্রত
তওহীদবাণী নিরাময় করে মানবমনের ক্ষত।
তোমার এখন বড় বেশি প্রয়োজন
অমানুষের ভীড়ে হারিয়ে যাচ্ছে মানুষ যখন।

www.pathagar.com

কান্না-কাতর নিপীড়িত জন প্রার্থনা করে–
মুক্তির চাঁদ উঠুক আবার মানুষের ঘরে ঘরে
বাঁচাও আল্লা, জানমাল-ইজ্জত আমাদের,
পাঠাও তোমার সৈনিক জিহাদের।
শান্তি ও স্বস্তির সেনাদল
নিয়ে এলো মুক্তি ও কল্যাণ অবিরল
মন্ত্র শেখালো নবজীবনের তোমার আজান
যত্নে গড়লে শুষ্ক মাটিতে সবুজ বাগান।
জানি তুমি আর আমাদের মাঝে
আসবে না তাই সকালে ও সাঁঝে
চলেছি আমরা তোমার ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে রোজ
দল বেঁধে করি তোমার পথের অবিরত খোঁজ।
তুমি শেষ নবী, সকলের নেতা, আমাদের প্রিয়জন
আমাদের বুকে গুনগুন বাজে
কেবলি তোমার নামের গুঞ্জরণ।

অলিখিত দলিলে স্বাক্ষরিত জমিন

শরীফ আবদুল গোফরান

তোমার অলিখিত দলিলে স্বাক্ষর করেছি
এ দলিল আমার বিশ্বাসের দেয়াল
অন্ধকার দলিলে হাত রেখে খুঁজি
তীর্যক বিকিরণ, সুগন্ধি ঘ্রাণ।

জায়নামাজে বসে হৃদয়ের কপাট খুলে
শুনতে পাই দৃষ্টিহীন তসবিহদানার কণ্ঠ
তখন তোমাকে অনুভব করি হৃদয় দিয়ে
দীর্ঘ সিজদায় হাতিয়ে দেখি তোমার পদচিহ্ন।

অজস্র বেলিফুলের ম ম গন্ধে
অভিভূত হই, আন্দোলিত হই
সাঁতার কেটে কেটে অবসন্ন দেহে

www.pathagar.com

এসে গেছি মহা সমুদ্রের কিণারে
নয়ন মেলে অপেক্ষায় আছি।

মহাকালের অনন্ত জীবনে
ফেরত দিও আমার অলিখিত দলিলে স্বাক্ষরিত জমিন।

হজরত মুহাম্মাদ [সা]

খুরশীদ আলম বাবু

'সুদীর্ঘ সময় পার হওয়ার পর আল্লাহ তাঁর অঙ্গীকার
পূরণার্থে ও পরম্পর ধারা সমাপ্তি করে
মুহাম্মাদ [সা]কে রাসূল করে পাঠালেন।'
[হজরত আলী [রা], নাহজুল বালাগা]

অসংখ্য আলোর মত জ্যোতির্ময় হয়ে অবশেষে
ধরিত্রি ফাটিয়ে হলো তোমার পবিত্র আগমন।
এ সময় নীলে ঘেরা জাহেলের তামাম সময়
থেমে যায় অবসন্নতায় মদিনার পাদদেশে।
তোমার পূত মহিমা ঝরায় রশ্মি অবিকল
ভেঙে যায় শতাব্দীর যন্ত্রণার অসম শিকল।

তোমার জন্য বিশ্ব পূর্ণতা পেয়েছে বিশ্বাসের
স্রোতে গড়া পুণ্য ডালি। হে আলোর সওয়ার!
জাহেলী উদ্যত দিনে তুমি বজ্রতুল্য তলোয়ার,
এনেছ আলোর বিভা তমসা জীবনে আমাদের।

এ জীবন হতো না প্রদীপিত তোমার কণ্ঠস্বরে
যদি না ক্ষতের মলমের মত সেই মধুসুর
ধক্ষনি লা-শরীক আমি শুনতাম এই চরাচরে
নদী মাঠ ঘাট সব হয়ে ওঠে জান্নাতি নূপুর।

তোমাকে পেয়েই যেন মৃত্তিকার সব গাছ ঘাস
নুয়ে পড়ে সেজদায়। জ্বলে ওঠে নীলাকাশ।

www.pathagar.com

প্রতিনিয়ত তোমাকে ঘিরে তারা কত ছবি আঁকে।
তোমার তুলনা তুমিই। তুমি স্পর্শের শেষ অতীত।
আর যারাই বেঁধেছে বোধ তোমার চলিষ্ণু বাঁকে
আবু জেহেলের মতন গড়েছি তার ধ্বংসের ভিত।

তোমার নৈঃশব্দ্য যেন তুর পাহাড়ে মুসার চোখ।
নূরের ঢেউয়ে হয়ে যায় সব চোখের কাজল।
তোমার হৃদয় যেন গোলাপের শ্বেত স্বর্ণালোক
খরা মরা ও ঝঞ্ঝাতে অনিবার্য দয়ার আঁচল।

কলুষিত মেঘের নিচে আশ্চর্য নরম জলাশয়
নৈঃশব্দ্যের স্বরলিপি ছিঁড়ে আনে প্রাণের সাগর
[তুমি শুধু মানবিক। আর সব নিরেট পাথর!]
নিরুদ্দেশ নীলিমায় ঝরেছে পূর্ণতার সঞ্চয়
তোমার নৈঃশব্দ্য দেখি আজো করুণার আদর
তায়েফ গ্রানাডা পার হয়ে বাংলাদেশেও জ্যোতির্ময়।

সীরাতুন্নবী [সা.]

আহমদ মতিউর রহমান

পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ জমে আকাশে আকাশে
ফুল্ল ফুল্ল ঘ্রাণ আসে বাতাসে বাতাসে
গুল্মে গুল্মে পুষ্পে পুষ্পে পূর্ণ চারিধার
জাগে পৃথ্বি জাগে সৃষ্টি দৃষ্টি অনিবার।

কুঞ্জে কুঞ্জে হাসি রাশি আনন্দ অপার
শস্যে শস্যে ভরা ক্ষেত অকুল পাথার
মর্মে মর্মে সুরধ্বনি অবিশ্রান্ত ধারা
বিশ্ব ব্যাপে সাজ সাজ পড়ে যায় সাড়া।

সাজ সাজ শুধু আজ কার জন্য সবি
দিন এলো আজ সেই সিরাতুন্নবী

www.pathagar.com

কলগানে উদ্ভাসিত প্রতি জনপদ
সারা পৃথ্বি স্মরে আজ নবী মুহাম্মদ।

আল্লাহর করুণাধারা প্রতি পলে পলে
তাঁর প্রতি অবিশ্রান্ত বয়ে বয়ে চলে।

রাসূল [সা.] আমার

মহিউদ্দিন আকবর

নিঃসঙ্গ নীলাকাশ যেভাবে মিস করে দীপ্ত বালার্ক
চাঁদও দেখি মিস করে সুকোমল জোসনা-আলোক
অবারিত জলরাশি মিস করে উত্তাল উর্মিমালা
'চির উন্নত শির' পাহাড়েরা মিস করে ঝর্ণাধারা
সবুজ-শ্যামল মাঠ মিস করে বৃষ্টির স্নিগ্ধ পরশ
সাতরঙ ফুলগুলো প্রতিরোজ মিস করে মধুর সুবাস।

বর্ণিল রঙধনু মিস করে দুর্লভ রঙের বাহার
কস্তুরি মিস করে চঞ্চল সুনয়না চিত্রা-হরিণ
ঝাঁক বাঁধা মাছগুলো মিস করে পেরেশান ক্ষিপ্র ভোঁদর
কাশবন মিস করে দিগন্তে ছুটে চলা দামাল বাতাস
পূর্ণিমা মিস করে নীলাম্বরের কোটি তারাদের ঝাঁক
খুৎ-পিপাসায় কেউ মিস করে সুস্বাদু খাবার...

আমি ঠিক তেমনি করেই মিস করি, প্রিয়তম!
মিস করি তোমার জ্যোতি, মিস করি–
ভালোবাসা, মিস করি দরুদের রুহানী ফায়েজ...
তবু আশাহত ভাষাহারা হইনি আজও,
ফিরে দেখি বার বার 'সবুজ মিনার'–
আত্মাকে সপে দিয়ে দূর মদীনায়,
কায়াটাই পড়ে থাকে ফকিরী-ডেরায়।

www.pathagar.com

কেমন উম্মত ওরা

হারুন ইবনে শাহাদাত

আমার প্রিয়তম রাসূল মোহাম্মাদ, আল্লাহ তাঁর ওপর শান্তি করুন বর্ষণ
রহমানুর রাহীমের রহম দিয়ে গড়তে এই পৃথিবীতে তাঁর আগমন,
জগতস্রষ্টা তাঁকে করেছেন, রহমাতুললিল আলামীন
তাঁর ভালোবাসার আবাদে সুখ সমৃদ্ধি শান্তিতে ভরবে জমিন।

আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পিত বান্দার অন্তর জুড়ে রাসূলের ভালোবাসার বসবাস
প্রীতির বন্ধনে তারা শান্তির পৃথিবী গড়ে দূর হয় সন্ত্রাস,
মুসলিম উম্মাহ একটি দেহের উপমায় উদ্ভাসিত রাসূলের ভালবাসার আর্কষণে
সবাই মিলে লড়ে জগতের সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষের শান্তির অন্বেষণে।

কিন্তু একি দেখি আজ! লজ্জায় নত জেহাদি তাজ,
তালেবান আইএস জঙ্গি বহুরূপী সেজে কারা করছে নিজের দেহের রক্তপাত
কেমন উম্মত ওরা রাসূলের
কোন ইসলামের জেহাদী মুসলমানের কোন সে জাত?

www.pathagar.com

সর্বকালের সফল অর্থনীতিবিদ মুহাম্মাদ [সা.]

জাফর আহমাদ

মানুষ মাত্রই আরাম-আয়েশের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত ও কালাতিপাত করতে চায়। তাই 'মানব জীবনে অর্থনীতির গুরুত্ব অপরিসীম' এ কথাটি পৃথিবীর কোন ধর্মই অস্বীকার করতে পারেনি। এ কারণেই অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রত্যেকটি সভ্যতা-সংস্কৃতিই নিজের অনুসারীদের একটি অর্থনৈতিক মতাদর্শ দেয়ার চেষ্টা করেছে। তবে ইসলাম অর্থনীতির গুরুত্ব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য সবার চেয়ে এগিয়ে। কারণ অন্যান্য মতাদর্শগুলো অনেকটা একপেশে, প্রান্তিক ও চরমপন্থার নীতি সম্বলিত। বর্তমান পৃথিবীর পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু ইসলাম চরমপন্থার এ দুটি মতবাদের মাঝে মধ্যমপন্থার এক নির্ভুল সুষম অর্থনীতি উপহার দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানবজীবনের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ইসলামের এ মধ্যমপন্থা সার্বিক শান্তি ও সমৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি। আজ থেকে পনেরশত বছর পূর্বেও ঠিক এমনিভাবে 'মুযদাক'-এর সমাজতন্ত্রবাদ এবং তৎকালীন ইহুদীদের সুদী সমাজ ও প্রভাবশালীদের পুঁজিবাদ সমাজে এক মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। সেই পরিস্থিতিতে একমাত্র মুহাম্মাদ [সা] মানুষের প্রকৃত মুক্তির জন্য সফল ও সুষম অর্থনীতির বিপ্লবী পথ দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাসূলের [সা] কল্যাণমুখি অর্থনৈতিক বিপ্লব এবং অর্থনৈতিক মুক্তির পথ বুঝতে হলে প্রথমে আমাদেরকে রাসূলের [সা] আগমনপূর্ব ও তাঁর সময়কালীন 'জাযিরাতুল আরব' আরব উপদ্বীপ বা হিজায প্রদেশটির অর্থনৈতিক অবস্থার ইতিহাস জানতে হবে।

জাযিরাতুল আরবের অর্থনৈতিক অবস্থা

ভূ-গোলকের ওপর নজর বুলালে আমরা দেখতে পাবো, আরব উপদ্বীপ প্রাচীন বিশ্বের ঠিক কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত। হিজায প্রদেশ লোহিত সাগরের উপকূল ধরে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। হিজাযের তিনটি নগরী মক্কা, মদীনা ও তায়েফ বহু যুগ পূর্ব হতেই বিশ্ববাসীর কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য

www.pathagar.com

পথ ছিল এ তিনটি নগরীর বুক দিয়ে। নিম্নে তিনটি নগরীর অর্থনৈতিক গুরুত্ব তুলে ধরা হলো:

মক্কা : ভৌগলিক অবস্থানের দরুণ আদি যুগ থেকে মক্কা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। মরু বাণিজ্য-পথের একটি গুরুত্বপূর্ণ ষ্টেশন বিধায় এটা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। কিন্তু মক্কার আশেপাশে জমি ছিল চাষাবাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। বন-জঙ্গল এবং খনিজ-সম্পদও না থাকায় সেখানে সব সময় কাঁচামালের অভাব লেগে থাকতো। ঐ একই কারণে সেখানকার শিল্প বাণিজ্যেও উন্নতি হয়নি। মদীনার ন্যায় মক্কাতেও সুদী কারবারের প্রচলন ছিল। সিরিয়ার দিকে বাণিজ্য কাফেলা রওয়ানা হওয়ার সময় মক্কায় দীনারের চাহিদা বেড়ে যেত। মহাজনরা তাদেরকে সুদে ঋণ দিতো। মক্কার কন্যা সন্তানদের হত্যার বিভিন্ন কারণের মধ্যে অভাব-অনটনও একটি কারণ হিসাবে গণ্য হতো। বসতি সমস্যা, জান-মালের নিরাপত্তা, দাস প্রথা, দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধ ইত্যাদির সাথে অর্থনৈতিক দুরবস্থার একটি সম্পর্ক ছিল। মক্কার বাইরে এখানে সেখানে ছোট ছোট যাযাবর লোকেরা বসবাস করতো। তারা নিজেদের উট, ছাগল পালের চারণভূমির সন্ধানে বার মাসই একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াত। তাদের আহার্য ও পানীয় ছিল টিড্ডি বা পঙ্গপাল এবং মধু। [মক্কার শরীফের ইতিহাস] তারা অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে নিজেদের মধ্যে হরহামেশা মারামারি-কাটাকাটিতে লিপ্ত থাকত।

মদীনা : হিজাযের অপর নগরী মদীনার ঐতিহাসিক গুরুত্বও কম নয়। মদীনা ছিল কিষাণদের বসতি। এ কিষাণরা সাধারণত অভাব-অনটনের মধ্যেই দিনাতিপাত করতো। ইহুদী পুঁজিপতিরা মদীনায় বসবাস করতো। তারা অগাধ সম্পত্তির মালিক ছিল এবং সেখানকার চাষীদেরকে সুদী ঋণ দিতো। মদীনায় সূদের প্রচলন ছিল মক্কা ও তায়েফের তুলনায় আরো ব্যাপক ও অত্যন্ত মারাত্মক। ঐতিহাসিকদের ভাষ্যমতে সেখানে একটি জঘন্য পেশার প্রচলন ছিল এবং তাহলো দাসীদের দ্বারা অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন। অর্থাৎ দাসীদের দিয়ে পতিতাবৃত্তির [Prostitution] ব্যবসা চালানো হতো। লোকেরা তাদের যুবতী সুন্দরী দাসীদেরকে গলিতে বসিয়ে দিতো এবং তাদের উপার্জন ভক্ষণ করতো। [ইবনে জরীর তাবারী, তাফসীরে ইবনে কাসীর] এ জন্য অহ্ তা'আলা এ জঘন্য প্রথা উচ্ছেদের জন্য আয়াত নাযিল করলেন, 'বৈষয়িক স্বার্থে নিজেদের দাসীদেরকে বেশ্যাবৃত্তির জন্যে বাধ্য করোনা, যখন তারা নিজেরা এরূপ কাজ থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়।' [আন নূর:৩৩]

www.pathagar.com

তায়েফ : তায়েফ মক্কা নগরী থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রায় পঁচাত্তর মাইল দূরে অবস্থিত। তায়েফের জমি সাধারণত উর্বরা ও সুফলা। তায়েফবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনে দুটি জিনিষ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যথা (১) জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে মারামারি এবং (২) বিত্তশালী ও বিত্তহীনদের মধ্যে মতবিরোধ। ঐতিহাসিক বালাযুরীর মতে তায়েফের লোক ছিল অতিমাত্রায় সুদখোর। তাদের এ সুদী ব্যবসা শুধুমাত্র তায়েফে সীমাবদ্ধ ছিল না, মক্কাবাসীদেরকেও তারা সুদী ঋণ দিতো। সাকীফ সম্প্রদায়ের চার সহোদর ভ্রাতা-মাসউদ, আবদে ইয়ালীল, হাবীব এবং সাকাফী ভ্রাতারাই বনু মুগীরা সম্প্রদায়কে ঋণ দিতো। এদের সুদী কারবারের একটি মুকদ্দমা এতটাই দীর্ঘয়িত ছিল যে, শেষ পর্যন্ত এটাকে উপলক্ষ করে 'ওয়া যারু মা বাকিয়া মিনার রিবা' আয়াত নাযিল হয়।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে সাধারণ আরবদের অর্থনৈতিক অবস্থা অধ:পতনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়েছিল। ইবনে খালদুনের মতে, 'আরবদের দুহীতারা শুশুক, ফড়িং প্রভৃতি খেতো। এমনকি ক্ষুধায় অস্থির হয়ে তারা উটের লোম রক্তের সাথে মিশিয়ে গিলে ফেলত। কুরাইশদের অবস্থাও মোটামুটি একই ধরণের ছিল।' এমনকি রাসূলের [সা] সমসাময়িক মুসলমানদের অবস্থাও একই ধরণের ছিল। সাহাবায়ে কেরামের অর্থনৈতিক দুরবস্থার ইতিহাস মোটামুটি আমাদের নখদর্পণেই আছে।

রাসূলের [সা] অর্থনৈতিক বিপ্লব

কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পর আরবদের অবস্থা সচ্ছল হয়ে উঠল। রাসূল [সা] অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটালেন। ইসলামের এই অর্থনৈতিক বিপ্লবের মধ্যে রাজনৈতিক বিজয়ের অবদান ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু এটাই একমাত্র কারণ নয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলের মাধ্যমে আরবদের যে পথ দেখিয়েছেন, তাতে শুধু ধর্মীয় নয়, অর্থনৈতিক সাফল্যও নিহিত ছিল। আমাদের সকলেরই জানা আছে যে, অন্যান্য নবীয়ে আকরামগণ তাঁদের উম্মতদের মাগফিরাত ও হিদায়াত কামনা করেছেন, আর মানবতার মুক্তির দিশারী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম এগুলোর সাথে সাথে এ দোয়াও করেছেন, 'হে পরোয়ারদিগার! এরা পায়ে হেঁটে চলে, এদের সওয়ার দাও। হে পরোয়ারদিগার! এরা উলঙ্গ, এদের কাপড়ের ব্যবস্থা করো। হে প্রভু! এরা ভুখা, এদের পেটভরে খাবার দাও।' [সুনানে আবু দাউদ] রাসূল [সা] আরবদের চারিত্রিক অধপতন দেখে যতটুকু কষ্ট পেতেন, অর্থনৈতিক দুরবস্থা দেখেও ততটুকু কষ্ট পেতেন। সহিহ মুসলিম শরীফে হযরত জরীর বিন আবদুল্লাহ [রা] বর্ণিত দীর্ঘ রেওয়াতের কিয়দাংশ হলো, 'আমরা একদিন রাসূলুল্লাহর [সা]

www.pathagar.com

সাথে ছিলাম। হঠাৎ একটি সম্প্রদায়ের লোক কম্বল উড়িয়ে, তরবারি ঝুলিয়ে, খালি পায়ে রাসূলের খেদমতে এসে হাযির হলো। ওদের দুরবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহর [সা] চেহারার রং বদলে গেল। তাঁর কাছে ঐ অবস্থা এতই অসহনীয় ছিল যে, তিনি প্রথমে ঘরের ভেতরে চলে যান।

কিন্তু সেখানে এই দু:স্থদের সাহায্য করার মতো কোন জিনিস না পেয়ে ব্যথিত অবস্থায় ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন। তখন তিনি বেলালকে ডেকে পাঠিয়ে আযান দিতে বললেন। যদিও সেটি জুমাবার ছিল না তবু তিনি মিম্বরে আরোহন করে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়লেন, 'হে লোক সকল, তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় করে চলো, যিনি তোমাদেরকে একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন।' [আন নিসা: ১]

এভাবে তিনি আরো কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন। দেখতে দেখতে দানের বারিবর্ষণ শুরু হলো। রাসূলুল্লাহর [সা] চেহারার ফিকে রং আবার ঝলমলিয়ে উঠলো।' একজন পূর্ণাঙ্গ মহামানব হিসাবে তাঁকে শুধুমাত্র কোন একটি বিশেষ দিকে নিয়ে গিয়ে মূল্যায়ন করা হলে তাঁর প্রতি, মানবতার প্রতি, সর্বোপরি ইসলামের প্রতি জুলুম করা হবে।

মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মাদ [সা] দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের দিশারী ছিলেন। তিনি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড থেকে পৃথক করে মানুষের আত্মার উন্নয়নের চেষ্টা করেননি। বরং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ঘিরেই মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধির চেষ্টা করেছেন এবং সকল ক্ষেত্রেই তিনি সফল হয়েছেন। ইসলামের সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক বিবেচনায় আনলে আমাদের মানসপটে যেমন একজন সফল ও পূর্ণাঙ্গ সমাজ সংস্কারক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের চেহারা ভেসে আসে, তেমনি ইসলামের অর্থনৈতিক দিক পর্যালোচনা করলে আমরা একজন সফল ও কল্যাণমুখী অর্থব্যবস্থাপকের চেহারাই দেখতে পাবো। তিনি সম্পদের সুষম ও ইনসাফপূর্ণ বন্টন [Equitable distribution] ও বিকেন্দ্রীকরণের [Dcentralization] জন্য নৈতিক মানে উন্নীত করণের সাথে সাথে কতগুলো মূলনীতি ও নৈতিক পন্থা [Tools] চালু করেন যা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণে ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ :

নৈতিক শিক্ষা

আয়-উপার্জন মানুষের জীবনের বিশাল অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে বিধায় ইসলাম আয়-উপার্জনকে কখনো নিরুৎসাহিত করেনি। বরং রাসূল [সা]-এর অসংখ্য

www.pathagar.com

বাণীতে রুজি-রুজগারের ব্যাপারে উৎসাহ দানের পাশাপাশি হালাল-হারামের সীমারেখাও জানিয়ে দিয়েছেন। অর্থ-সম্পদের মোহ শাশ্বত। কিন্তু অতিরক্তি মোহ মানুষকে দূর্নীতির দিকে ঠেলে দেয়। তাই রাসূলে আকরাম [সা] বলেছেন, ধনী হওয়া সম্পদের প্রাচুর্যের নাম নয় বরং প্রকৃত সম্পদশালী সেই, যার অন্তর সম্পদশালী। অবৈধভাবে আহরিত সম্পদ অপবিত্র। তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ পবিত্র। পবিত্র জিনিস ব্যতীত তিনি অন্য কিছু গ্রহণ করেন না।' বৈধভাবে যতটুকু সম্পদ অর্জন করা হয়, ততটুকুতেই আল্লাহর অবারিত বরকত নিহিত থাকে। অবৈধ বা হারামভাবে আহরিত সম্পদে আল্লাহ্ বরকত দান করেন না। তিনি মানুষকে তাওহীদ, রেসালাত, আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং আল কুরআনের অঙ্কিত আখিরাতের ভয়াবহ দৃশ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে ধন-সম্পদের প্রতি মোহকে সীমিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল আত্মার পবিত্রতা সাধন, মন-মানসে মলিনতা, শোষণ, জৈবিক ও পাশবিক পঙ্কিলতা প্রক্ষালন করে মানুষের নৈতিক চরিত্রকে উজ্জীবিত করা। তিনি অর্থপূজা, বৈষয়িক অর্থসম্পদের প্রতি আসক্তি এবং প্রাচুর্যের অহমিকাকে এমনভাবে নিরুৎসাহিত করেছেন যে, প্রতিটি নাগরিক তাদের প্রয়োজন পূরণ ব্যতীত অতিরিক্ত সম্পদের প্রতি লোভ-লালসার দুষ্ট চিন্তাকে দূরে ঠেলে দিয়েছিলেন। এমনকি অতিরিক্ত সম্পদ কোনক্রমে এসে গেলেও রাসূলের [সা] নৈতিক শিক্ষার প্রভাবে তাঁরা অন্য অভাবীদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। অভাবীরাও নৈতিক শিক্ষার প্রভাবে এতটুকুই সংযম ও ধৈর্য অবলম্বল করেছিলেন যে, চরম ক্ষুধার্ত অবস্থায়ও তাঁরা তাঁদের অভাব প্রকাশ করতেন না। এভাবে তিনি নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মাঝে মধ্যমপন্থার এক অর্থ ব্যবস্থা কায়েম করেন।

মধ্যমপন্থার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা

রাসূল [সা] প্রথমত মানুষকে মধ্যমপন্থার জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা চালান। তিনি বলেছেন, 'দারিদ্র্য ও প্রাচুর্য উভয় অবস্থায়ই অর্থব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে।' একদিকে অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যমনীতি ও মিতব্যয়িতা, অন্যদিকে সংকীর্ণতা-কৃপণতা বর্জনের নির্দেশ দেন। একটি ভারসাম্যপূর্ণ জাতির নেতা হিসাবে আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁর রাসূল [সা]কে এ ধরনের নসিহতই করেছেন, 'তোমার হাত গলার সাথে বেঁধে রেখো না, আর একেবারে খোলা ছেড়েও দিও না, অন্যথায় তুমি তিরস্কৃত ও অক্ষম হয়ে যাবে।' [বণী ইসরাঈল: ২৯]।

এর অর্থ হলো, লোকদের মধ্যে এতটুকু ভারসাম্য থাকতে হবে যাতে তারা কৃপণ হয়ে অর্থের আবর্তন রুখে না দেয় এবং অপব্যয়ী হয়ে নিজের অর্থনৈতিক শক্তি

www.pathagar.com

ধক্ষংস না করে ফেলে। এর বিপরীত পক্ষে তাদের মধ্যে ভারসাম্যের এমন সঠিক অনুভূতি থাকতে হবে যার ফলে তারা যথার্থ ব্যয় থেকে বিরত হবে না । আবার অযথা ব্যয়জনিত ক্ষতিরও শিকার হবে না। এ ভারসাম্য শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, মুসলমানদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য। রাসূলের [সা] শিক্ষা হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজের আর্থিক সঙ্গতির মধ্যে থেকেই অর্থ ব্যয় করে। আবার সে যেন নিজের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের তুলনায় অনেক কম খরচ করার মতো কার্পণ্যও না দেখায়।

একদিকে খরচ করতে করতে নিজের আয়ের অংককে ছাড়িয়ে যায় এবং নিজের আজেবাজে খরচের জন্য ঋণ করতে বাধ্য হয়। অবশেষে ঋণ পরিশোধ করার সঙ্গতি না থাকায় নিজের শেষ সম্বল হাতছাড়া হয় এবং তাকে ফকীর-মিসকীনের খাতায় নাম লিখাতে হয়। যাকে অপব্যয়ীর পরিণাম বলতে পারি।

অন্যদিকে নিজের আয় ও অর্থনৈতিক উপায় উপকরণের সীমার মধ্যে থেকে ব্যয় করার অর্থ এ নয় যে, সে ভালো আয় উপার্জন করলে নিজের সব টাকা পয়সা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত আয়েশ আরাম ও ভোগ বিলাসিতায় উড়িয়ে দেবে, আর অন্যদিকে তার আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়াপ্রতিবেশীরা চরম সংকটের মধ্যে দিন যাপন করবে।

এ উভয় ধরণের বাহুল্য ও স্বার্থান্ধকে রাসূল [সা] দূর করেন। শুধু নৈতিক শিক্ষা দিয়ে ক্ষান্ত হননি বরং কার্পণ্য ও অমিতব্যায়িতার চুড়ান্ত অবস্থা প্রতিরোধের জন্য আইন প্রণয়ন করেন। মোট কথা, নৈতিক শিক্ষা ও আইন কানুনের মাধ্যমে মানুষকে মধ্যপন্থা তথা সহজ-সরল-অনাড়ম্বর জীবন যাপনের নির্দেশ দেন এবং উপার্জিত সম্পদে নিজের অপারগ ভাইদের সাহায্য করার নির্দেশ দেন। এ মধ্যমপন্থাকে কার্যকর করার জন্য আল্লাহর নির্দেশে তিনি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কতগুলো পন্থা [Tools] কায়েম করেন। যার মধ্যে যাকাত, উশর, মিরাস, খারাজ ও সাধারণ কর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা:

সম্পদ যাতে শুধু ধনীদের মাঝে আবর্তিত না হয়, সে জন্য যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ধক্ষংস করে একটি ন্যায়নীতির অর্থব্যবস্থা কায়েমের জন্য যাকাত সর্বপ্রধান হাতিয়ার। ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাত যদিও ধনী ব্যক্তির প্রতি ফরয করা হয়েছে, কিন্তু মূলত এটি একটি সামাজিক ও জাতীয় কল্যাণ ব্যবস্থা। জাবির বিন আব্দুল্লাহ [রা] বলেন, আঁমি নবী করীমের [সা] কাছে বাই'আত গ্রহণ করেছি নামায কায়েম করার জন্য যাকাত দেয়ার জন্য এবং প্রতিটি মুসলমানের কল্যাণ কামনার জন্য। [বুখারী-

www.pathagar.com

মুসলিম]। রাসূল [সা] যাকাতের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের কথা এত বলিষ্ঠভাবে বলে দিয়েছেন যে, এটা আদায় না করলে সম্পদ বেড়ে তা ধক্ষংসে পরিণত হবে। হযরত আয়েশা [রা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে [সা] বলতে শুনেছি, যে সম্পদের সাথে যাকাতের সংমিশ্রণ ঘটে তা সম্পদকে ধক্ষংস করে দেয়। [বুখারী]।

যাকাত কল্যাণ ফান্ডের প্রধান উৎস। যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে যাকাত আদায়ের নিদের্শ এলো তখন রাসূলে করীম [সা] বিভিন্ন প্রকার সম্পদের জন্য একটি বাস্ত বসম্মত নিসাব [যে সর্বনিম্ন পরিমাণের উর্ধে যাকাত অপরিহার্য] পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। অত:পর নিসাব পরিমাণ বা তদূর্ধ বিভিন্ন প্রকার সম্পদের ওপর যাকাতের বিভিন্ন হার নির্ধারণ করেছেন। সোনা, রূপা ও নগদ টাকা পয়সার ওপর শতকরা আড়াই ভাগ এবং কৃষি উৎপাদনের ওপর সেচ ব্যবস্থার আওতাধীন জমি হলে শতকরা ৫ ভাগ ও সেচ ব্যবস্থার আওতা বহির্ভূত জমি হলে শতকরা ১০ ভাগ ব্যবসায়িক পণ্যের ওপর শতকরা আড়াই ভাগ, খনিজ দ্রব্যাদি [নিজস্ব মালিকাধীন] ও গুপ্তধনের ওপর শতকরা বিশভাগ যাকাত ধার্য করেছেন। এভাবে তিনি ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত গবাদি পশু প্রভৃতি চতুস্পদ প্রাণীর ওপর বিভিন্ন হারে যাকাত ধার্য করেছেন।

মিরাসী আইন

সম্পদ একস্থানে পূঞ্জীভূত হয়ে যে পুঁজিবাদের সৃষ্টি করে, ব্যক্তির মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তা নানাভাবে খণ্ড-বিখণ্ড ও বিভক্ত হয়ে অসংখ্য হস্তে বিক্ষিপ্ত করে দেয় যে ব্যবস্থা, তার নাম ইসলামের মিরাসী আইন। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানার যে অধিকার রয়েছে, তা ব্যক্তির নিজ জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা উত্তরাধিকার সুত্রে বংশানুক্রমিকভাবে অনন্তকাল চলতে থাকবে। ধন-সম্পদ বন্টনের যত নিয়ম ও পন্থা রয়েছে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক নির্ভূল ও কার্যকরী ব্যবস্থা হলো মিরাস ব্যবস্থা। তাই এ ব্যবস্থার গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে নবী করিম [সা] বলেছেন, 'উত্তরাধিকার আইন নিজেরা শিখ, অন্যকে শিক্ষা দাও। কারণ এটি ইসলাম সম্পর্কীয় যাবতীয় জ্ঞানের অর্ধেক।' নবী আকরাম [সা] মিরাসী আইন অনুযায়ী ধন-সম্পদ বন্টন করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'ধন-সম্পদকে তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বণ্টন কর।' [সহীহ মুসলিম]।

তাছাড়া ইসলামের ইসলামের উত্তরাধিকার আইন জায়গীরদারী এবং জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত করার একটি মোক্ষম হাতিয়ার। তাই বলে সমাজতান্ত্রিক আইনের মত কৃষককে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে উচ্ছেদ করে না। উত্তরাধিকার ছাড়াও অন্যান্য উপায়ে সম্পদ মানুষের মাঝে বন্টিত হতে পারে। যেমন

www.pathagar.com

ওসিয়ত, ওয়াক্‌ফ, হেবা, উদ্বৃত্ত সম্পদে অন্যদেরকে স্বত:স্ফূর্তভাবে অংশীদার করা, লুকতা [রাস্তা-ঘাটে পতিত জিনিস], উমরা ও রুকবা [স্থাবর সম্পত্তি কাউকে আজীবন ভোগের জন্য প্রদান]। এ সবগুলোর জন্য আল্লাহর রাসূলের হাদীস রয়েছে। কলেবর বৃদ্ধির জন্য এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হলো না।

দান খয়রাতে উদ্বুদ্ধকরণ

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় পেশাদার ভিক্ষুকের কোন স্থান নেই। তবে কোন ব্যক্তি হয়তো ঘটনাচক্রে বিপদগ্রস্ত হয়ে সওয়াল করতে পারে, তার জন্য ইসলাম সুপারিশ করেছে যে, 'আর প্রার্থীকে তুমি ফিরিয়ে দেবে না।' [সুরা দোহা] সমাজে এমন লোক আছে যারা বাহ্যত সুখী স্বচ্ছল বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে তারা স্বচ্ছল নয়; আত্মমর্যাদাবোধ তাদেরকে অন্যের নিকট হাত পাততে দেয় না। ইসলাম এ সমস্ত জনগোষ্ঠীর সাহায্যার্থে বিত্তশালীদেরকে নির্দেশ দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন, তোমার ওপরে সায়েলের অধিকার আছে– চাই সে ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়েই আসুক।'[আবু দাউদ]।

সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

সুদ অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি সর্বোপরি মানব সভ্যতার জন্য জঘন্য একটি প্রথা। প্রাক-হিজরী যুগে ইহুদীদের আর্থিক শোষণের শিকার ছিল দরিদ্র আনসারগণ। সুদ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থারও শোষণের এক কার্যকরী হাতিয়ার। সুদ অর্থের আবর্তন ও ঘুর্ণায়মানকে বন্ধ করে দেয় বিধায় সাধারণ মানুষের হাত থেকে অর্থ গুটিকয় মানুষের হাতে গিয়ে পুঞ্জিভূত হয়। ফলে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে যায়। নতুন নতুন শিল্প-কলকারখানা প্রতিষ্ঠার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। ফলে প্রোডাকশন বন্ধ হয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পথও বন্ধ হয়ে যায়।

এভাবে সুদ অর্থনীতির ওপর সুদুরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। সম্পদ শুধু একদিকে চলে এবং সমাজে বিনিয়োগের প্রবাহ কমে যায়। সম্পদ বৃদ্ধির পরিবর্তে কমে যেতে থাকে। সুদী সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ বলতে কিছুই থাকে না। যে সমাজে এ মরণব্যধি সুদ প্রচলিত, সে সমাজের বাহ্যিক রূপ দেখে যতই সুস্থ্য–সবল ও সুন্দর মনে হোক না কেন, ভেতরে ভেতরে দুষ্ট কীট কুড়ে কুড়ে সে সমাজটিকে শেষ করে দেয়।

বর্তমান বিশ্বের আধুনিক রাষ্ট্রগুলো তার সাক্ষী। সে সব সমাজের মানুষগুলোর সামাজিক বন্ধন খুব নড়বড়ে। এর প্রধান কারণ হলো সুদ। সুদখোর ব্যক্তি টাকার পিছনে পাগলের মতো ছুটে ভারসাম্যহীন ব্যক্তিতে পরিণত হয়। নিজের স্বার্থপরতার মাত্রা এতটুকু বৃদ্ধি পায় যে, সে তখন পৃথিবীর কোন কিছুই পরোয়া করে না। তার সুদখোরীর কারণে এক পর্যায়ে মানবিক প্রেম-প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও

www.pathagar.com

সহানুভূতির মাত্রা শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। তখন সে তার নিজের লোককেও চরম বিপদের সময়ে বিনা সূদে ধার দিতে কুণ্ঠাবোধ করে। সুদ তাকে এতটুকু অন্ধ করে তুলে যে, জাতীয় সামষ্টিক কল্যাণের ওপর কোন ধ্বক্ষংসকর প্রভাব পড়লো এবং কত লোক দুরবস্থার স্বীকার হলো এসব বিষয়ে তার কোন মাথাব্যথাই থাকে না। রাসূল [সা] বলেছেন, 'সুদ যাই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তার পরিমাণ কম হতে বাধ্য।' [ইবনে মাযাহ, আহমাদ]। তাই সুদমুক্ত অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূলের [সা] ভূমিকা ছিল অত্যন্ত জোরালো। সহীহ মুসলিমে হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ [রা] হতে বর্ণিত এক হাদীসে তিনি সুদদাতা, সুদগ্রহীতা, সূদের লেখক এবং সুদী লেনদেনের স্বাক্ষীদ্বয়ের প্রতি লানত করেছেন। তিনি বলেছেন, তারা সকলেই সমান অপরাধী।

তিনি আরো বলেছেন, সূদের সত্তর প্রকার গুনাহ রয়েছে। এর সর্বনিম্ন গুনাহ হলো নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবার সমতুল্য। [ইবনে মাযাহ]। বিদায় হজ্বের ভাষণে তিনি বলেছেন, 'জাহিলী যুগের সমস্ত সুদও বাতিল করা হলো [এখন আর কেউ কারো কাছে সুদ দাবী করতে পারবে না]। সর্বপ্রথম আমি নিজ খান্দানের সুদ-আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের সুদ বাতিল করে দিলাম।'

এভাবে তিনি সুদী ব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়ে অর্থের আবহ চালু করে দেন। কায়েম হলো সুদমুক্ত অর্থনীতি। কায়েম হলো ভ্রাতৃত্বমূলক দরদী সমাজ। ফলে মানুষ সকল স্বার্থপরতাকে ভুলে গিয়ে পারস্পরিক পরম বন্ধু ও কল্যাণকামী মানুষে পরিণত হলো। আমরা আনসার ও মোহাজিরদের হিজরত পরবর্তী দুরবস্থার সময় তাদের পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা থেকে এর বাস্তব উদাহরণ দেখতে পাই। যেই সমাজ ছিল মানুষের জান-সম্পদের চরম শত্রু, রাসূলের [সা] নৈতিক শিক্ষা ও সুষম অর্থনীতি চালুর বদৌলতে তারা হয়ে গেলো পারস্পরিক জান-সম্পদের পরম বিশ্বস্ত পাহারাদার।

ভূমি মালিকানা বন্টন

রাসূলুল্লাহ [সা]-এর নীতি ছিল যে, ইসলাম গ্রহণকালে যে ব্যক্তি যে সম্পদের মালিক ছিল তা তারই মালিকানায় থাকবে। যাদুল মা'আদে আল্লামা ইবনে কাইয়েম [রা] বলেন, যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি কিন্তু সন্ধির মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত হয়ে বসবাস করাকে মেনে নিয়েছে; এদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ [সা] যে নীতি নির্ধারণ করেন, তা এই যে, যেসব শর্তের ভিত্তিতে সন্ধি হয়েছে তার কোন রদবদল হবে না। রাসূলুল্লাহ [সা] অনাবাদী জমি আবাদ করার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। মালিকানাহীন জমি ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন, যে ব্যক্তি তা আবাদ করে সে-ই তার মালিক। এ ধরণের জমি দুইভাগ বিভক্ত ছিল। এক–'মাওয়াত' অর্থাৎ অনাবাদী ভূমি। 'আদিউল আবাদ' [যে জমির মালিক মরে

www.pathagar.com

গেছে] বা যার কোন মালিকই ছিল না, অথবা যে ভূমি ঝোপঝাড়, কাদা মাটির ফাঁক এবং পাবনের নীচে পড়ে গেছে তা-ই হচ্ছে মাওয়াত। দুই–'খালিসা' ভূমি বা খাস জমি। যার ওপর সরকারী মালিকানা ঘোষণা করা হয়েছিল। মাওয়াত-এর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ [সা] প্রাচীন রীতিই বহাল রাখেন যার ভিত্তিতে দুনিয়ার জমির মালিকানার সূচনা হয়েছে। অর্থাৎ যেখানে যে আছে, সে জায়গা তার। হযরত আয়েশা [রা] বলেছেন, রাসূলে করীম [সা] বলেছেন, যে ব্যক্তি মালিকানাধীন কোনো জমি আবাদযোগ্য করে, সে ব্যক্তিই সে জায়গার হকদার। [বুখারী, নাসাঈ, আহমাদ]। মাওয়াত [পতিত] ও খালিস [খাস] উভয় প্রকারের ভূমি থেকে প্রচুর পরিমাণ জমি রাসূলে করীম [সা] নিজে মানুষকে দান করেছেন। আবাদ জমি চাষাবাদ করার জন্য রাসূল [সা] উৎসাহ দান করে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি চালু করেছেন।

সম্পদ উৎপাদনে উৎসাহ দান

ইসলাম মানুষকে অর্থোপার্জনের পুরোপুরি স্বাধীনতা দিয়েছে এবং তাদের জন্য সম্পদ উৎপাদনের বিভিন্ন পথ নির্দেশ করেছে, যাতে তারা সম্পদ উৎপাদন করে নিজেদের কাজে লাগায় এবং অন্যদেরকেও তা থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দেয়। রাসূলুল্লাহ [সা] তাঁর অনুসারীদেরকে শিক্ষা দিতেন যেন তারা আল্লাহর সম্পদ থেকে উপকৃত হয়। এ ক্ষেত্রে অতি সামান্য বিষয়েও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। 'রাসূলুল্লাহ [সা] একবার একটি মৃত বকরী দেখতে পেলেন, যা মায়মুনার কোন দাসকে দেয়া হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ [সা] বললেন, তোমরা এর চামড়া থেকে ফায়দা নিচ্ছ না কেন? লোকেরা বলল, এটি তো মৃত। তিনি বললেন, 'কেবলমাত্র এটি ভক্ষণ করাই তো হারাম।' [সহীহ বুখারী, মুসলিম,মুয়াত্তা]।

বেকার সমস্যা দূরীকরণ

রাসূলের [সা] জীবন চরিত অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, তিনি মানুষের কর্মসংস্থানের বিভিন্ন পদ্ধতি বলে দিতেন। তাঁর কার্যধারা থেকে এ ধরণের অসংখ্য নজির আমরা দেখতে পাই। বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদের বর্ণিত জনৈক বেকার আনসারীর হাদীসটি উজ্জল নিদর্শন হয়ে আজো আমাদের প্রেরণা যোগায়। একমাত্র সহায় তার কম্বলখানি বিক্রি করে একটি কুঠার খরিদ করে দেন এবং নিজের হাতে একটুকরা কাঠের হাতল লাগিয়ে দিয়ে জঙ্গলে কাঠ কেটে জীবন নির্বাহের আদেশ দেন। আবু হোরায়রা [রা] বলেন, রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন, 'তোমাদের যে কোন লোকের জন্য মানুষের নিকট হাত পাতার চাইতে রশি নিয়ে জংগলে গিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে জীবিকা অর্জন করা অনেক ভাল।' [বুখারী]। আবু হোরায়রা [রা] নবী [সা] থেকে বর্ণনা করেছেন, 'আল্লাহর নবী

www.pathagar.com

দাউদ [আ] নিজের হাতে কাজ করে উপার্জিত খাদ্য গ্রহণ করে জীবন ধারণ করতেন। [বুখারী]। এভাবে তিনি মানুষকে কাজের জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। যার কারণে মানুষ রুজি-রোজগারে দৈহিক পরিশ্রম লেগে গিয়েছিল। আয়েশা [রা] বর্ণনা করেছেন, 'রাসূলুল্লাহ [সা]-এর সাহাবীগণ রুজি উপার্জনের জন্য নিজেরাই দৈহিক পরিশ্রম করতেন। এ কারণে তাদের শরীর থেকে ঘামের গন্ধ আসত। তাই তাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা গোসল করলে ভাল হত।' [বুখারী]।

দারিদ্র্য বিমোচন

নবী করীম [সা] ব্যক্তি তথা গোটা সমাজ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যক্তিকে নৈতিক বলে বলিয়ান করেন। নৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ হিসেবে পরবর্তী জীবনে গৌরবের সাথে কাল কাটাবার বন্দোবস্ত করেন। এটিই ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি। নবী [সা] এ নীতির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। নৈতিক এ বলের মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজের অংশ হিসাবে অন্য ব্যক্তির সুখ-দুঃখ ও সুবিধা-অসুবিধায় সহযোগিতা করা নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসেবে গণ্য করা হয়। ফলে গোটা সমাজ থেকে দারিদ্র্য বিতাড়িত হয় এবং দৈনন্দিন জীবনে সুঃখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়। এ জন্য তিনি রাষ্ট্রীয়ভাবে জনগণের অতিরিক্ত আয় থেকে যাকাত, সাদকা, ট্যাক্স ইত্যাদি আদায়ের ব্যবস্থা করেন।

ভিক্ষাবৃত্তির উচ্ছেদ

ভিক্ষাবৃত্তিকে রাসূল [সা] পছন্দ করতেন না বিধায় তিনি তা উচ্ছেদে যথাযথ ভূমিকা রাখেন। তিনি বলেছেন,'সেই আল্লাহর কসম, যার মুঠোয় আমার প্রাণ, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ, যে জঙ্গলে যায় এবং কাঠ কেটে তা পিঠের ওপর বয়ে নিয়ে বিক্রি করে ঐ ব্যক্তি হতে, যে অন্যের কাছে গিয়ে সওয়াল করে এমতাবস্থায় যে, সে তাকে কিছু দিতেও পারে কিংবা নাও দিতে পারে।'

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় বৈরাগ্যবাদকে যেমন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে তেমনি ভিক্ষাবৃত্তিকেও একটি জঘন্যতম পেশা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রাসূল [সা] ভিক্ষা দ্বারা অর্জিত সম্পদকে 'জাহান্নামের উত্তপ্ত পাথর' বলে আখ্যা দিয়েছেন। 'তারা [ভিক্ষুক] জাহান্নামের অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত পাথর চিবাবে।' [বুখারী]। 'তোমাদের মধ্যে যে ভিক্ষা করে সে যখন আল্লাহর সামনে যাবে তখন তার চেহারায় মাংসের একটি টুকরাও থাকবে না। [বুখারী, মুসলিম]। এভাবে তিনি ভিক্ষাবৃত্তিকে কঠোর হস্তে দমন করে কর্মঠ স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ফলে হাজরা থেকে সানায়া মাউত পর্যন্ত একজন ভিক্ষুক খোঁজে পাওয়া যেত না। এমনকি মানুষ যাকাতের টাকা নিয়ে মানুষের দ্বারে ঘুরে বেড়াত কিন্তু কোন যাকাত গ্রহণকারী খোঁজে পাওয়া যেত না।

শোষণমুক্ত অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা

www.pathagar.com

হযরত মুহাম্মাদ [সা] বিবদমান, বিভক্ত উপজাতি, শহরবাসী ও দুরবর্তী অঞ্চলের বেদুঈনদের নিয়ে এমন এক সমাজ [উম্মাহ্] প্রতিষ্ঠা করলেন যার ভিত্তি 'ঈমান'। দুর হলো দ্বন্দ্ব ও কলহ। গোষ্ঠীগত আভিজাত্য, বংশগৌরব, ধন ও ঐশ্বর্যের প্রাধান্য বিলিন করে দিয়ে তিনি ঘোষণা করলেন 'এক ভাই অপর ভাইকে শোষণ করতে পারে না; একজন অপরজনকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না।' এ জন্য তিনি শোষণের কার্যকরী হাতিয়ার সুদকে সমাজ থেকে সমূলে উচ্ছেদ করেন।

ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ

রাসূল [সা] নিজে একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসায়ীক উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। তিনি মুদারাবা [শরীকানা] বিনিয়োগের আওতায় হযরত খাদিজা [রা]-এর সাথে ব্যবসা করেছেন। এ ব্যবসায় এক পক্ষের থাকবে পুঁজি যাকে সাহিবুল মাল বা পুঁজি বিনিয়োগকারী বলে অপর পক্ষ তার বিশ্বস্ততা, মেধা, শ্রম ও সময় দান করে ব্যবসা পরিচালনা করবে যাকে মুদারিব বা ব্যবসা পরিচালনাকারী বলে। উভয়পক্ষ পূর্বচুক্তি অনুযায়ী লাভ-লোকসান ভাগ করে নিবে। এ ব্যবসায় রাসূলে করীম [সা] ছিলেন মুদারিব তথা ব্যবসা পরিচালনাকারী এবং খাদিজা [রা] ছিলেন সাহিবুল মাল বা পুঁজি দাতা। রাসূলে আকরাম [সা] তাঁর বিশ্বস্ততা, সততা, শ্রম, মেধা ও সময় দান করে ব্যবসা পরিচালনা করেছেন। হযরত খাদিজাকে [রা] প্রচুর লাভ দিয়েছেন। তাঁর ব্যবসায়ীক বিশ্বস্ততা ও সততার কারণেই ধনাঢ্য মহিলা তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব প্রদান করেন। ব্যবসার করার জন্য তিনি জনগণকে অনেক উৎসাহ ও উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন,'বিশ্বস্ত সত্যাশ্রয়ী ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে অবস্থান করবে।' [ইবনে মাযাহ্]।

রাসূল [সা] ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সকল প্রকার অন্যায় আচরণ দূর করেছিলেন। তিনি ব্যবসা বাণিজ্যে থেকে বিভিন্ন অন্যায় কাজ তথা খাদ্যদ্রব্য সহ অন্যান্য জিনিষে ভেজাল মেশানো, মজুদদারীর মাধ্যমে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে ফায়েদা লুটা, প্রতারণাপুর্ণ দালালীর মাধ্যমে উচ্চ দাম হাঁকানো, মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের নিমিত্তে লোভনীয় কৃত্রিম কোন উপায় অবলম্বন করা, মিথ্যা শপথের মাধ্যমে বিক্রয় করা, বিক্রিত মালামালের দোষ ত্রুটি গোপণ করা, চোরাই ব্যবসা করা, মাপে বা ওজনে কমবেশী করা ইত্যাদি সকল প্রকার কাজ ও কর্ম উচ্ছেদ করেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর [রা] থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী [সা]-এর নিকট বলল যে, 'ক্রয় বিক্রয়ে সে প্রতারিত হয়। তিনি বললেন, যখন তুমি খরিদ করবে তখন বলবে, যেন ধোঁকা না দেওয়া হয়।' [বুখারী]। আবু হোরায়রা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ [সা]কে বলতে শুনেছি, 'মিথ্যা

www.pathagar.com

শপথের দ্বারা পণ্য সামগ্রী বিক্রি হয়ে যায় বটে কিন্তু এতে বরকত বা কল্যাণ ধক্ষংস হয়ে যায়।' [বুখারী]।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবু আওফা [রা] হতে বর্ণিত। 'এক ব্যক্তি তার পণ্যদ্রব্য বিক্রির জন্য বাজারে নিয়ে মুসলমানদের কাউকে ফাঁদে ফেলার জন্য আল্লাহর নামে শপথ করে-ঐ মাল সে যত দামে কিনেছে তা এখনও কেউ বলেনি। তখন এ আয়াত নাযিল হয় 'যারা আল্লহর সাথে কৃত চুক্তি ও নিজেদের শপথ তুচ্ছ মুল্যে বিক্রয় করে।' [বুখারী] হযরত উমার [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, 'নবী [সা] প্রতারণাপূর্ণ দালালী করতে নিষেধ করেছেন।' [বুখারী]। হাকিম ইবনে হিজাম [রা] থেকে বর্ণিত, নবী [সা] বলেছেন, 'ক্রেতা এবং বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় শেষে পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া ক্রয়বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার থাকে। যদি তারা উভয় সত্য কথা বলে এবং দোষ বর্ণনা করে, তাহলে এ ক্রয়-বিক্রয়ে উভয়কেই বরকত দান করা হয়ে থাকে। কিন্তু যদি মিথ্যা কথা বলে ও দোষ গোপন করে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।' [বুখারী]। আবু হোরায়রা [রা] হতে বর্ণিত। নবী [সা] বলেছেন, 'তোমরা [বিক্রয়ের পূর্বে] উষ্ট্রী ও বকরীর বাঁটে দুধ জমিয়ে রেখো না।' [বুখারী]।

এভাবে তিনি ব্যবসায় জুলুম, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা, ঠগবাজি, মুনাফাখোরী, কালোবাজারী এবং হারাম জিনিস যেমন- মাদকদ্রব্য, শূকর, মূর্তি. প্রতিকৃতি ব্যবসা করা হারাম বলেছেন। নবী করীম [সা] একদিন সালাতের জন্য বের হয়ে দেখতে পেলেন লোকজন কেনাবেচা করছে। তখন তিনি তাদেরকে ডেকে বলেন, 'হে ব্যবসায়ী লোকেরা! কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীরা মহা-পাপীরূপে উঠবে; তবে তারা নয়, যারা আলাহকে ভয় করবে, সততা ও বিশ্বস্তা সহকারে ব্যবসা করবে। [তিরমিযি, ইবনে মাযাহ্]।

রাসূল আরো বলেছেন, হে ব্যবসায়ীরা! তোমরা মিথ্যা কথা ও মিথ্যা কারবার থেকে অবশ্যই দূরে থাকবে।' [তিবরানী]। ইসলামে ব্যবসার নীতির মূল কথা হলো সামষ্টিক কল্যাণ। রাসূল [সা] ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা এবং দীনি দাওয়াত ও মসজিদ নির্মাণ করেছেন, তেমনি তিনি মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য মদীনাতে একটি ইসলামী বাজার বানিয়েছিলেন। বনু কাইনুকার এ বাজারটির দায়িত্বও তিনি নিয়েছিলেন।

উপসংহার

সর্বকালে সফল একজন অর্থনীতিবিদ হিসাবে রাসূলকে [সা] জানতে হলে হুজুরে আকরাম [সা]-এর জন্মের সমসাময়িক যাযিরাতুল আরবের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কথা আমাদের সর্বাগ্রে জানতে হবে। একটি সুস্থ অর্থনীতির জন্য সংশিষ্ট এলাকার সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থীতিশীলতা

www.pathagar.com

একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু রাসূলের [সা] জন্মের সময় মক্কা ও তার আশপাশের সার্বিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক ও ভয়াবহ। জন্মের পরপরই তিনি দেখতে পেলেন বংশ পরম্পরায় দীর্ঘ মেয়াদী অন্যায় যুদ্ধ, সন্ত্রাস, কাটাকাটি, মারামারি, খুনখারাপী ও রাহাজানি। একটি সুস্থ ও গতিশীল অর্থনীতির জন্য এ সবগুলোই অন্তরায়। যদিও এ অবস্থার জন্য তৎকালীন মানুষের অর্থনৈতিক দূরবস্থা কোন অংশে কম দায়ী ছিল না তথাপি এগুলোর জন্য অর্থনীতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার ছিল।

হযরত মুহাম্মাদ [সা] মানবতার মুক্তির দূত হিসাবে আবির্ভূত হলেন। ফলে মানুষের সার্বিক অবস্থার সাথে সাথে বদলে গেল অর্থনৈতিক অবস্থাও। এ মহামানবের অর্থনৈতিক আদর্শ ছাড়া আজো মানুষের মুক্তির চিন্তা করা মানে একটি পরীক্ষিত জলজ্যন্ত বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই নয়। বর্তমানের অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত এ পৃথিবীই এর প্রধান সাক্ষী। খুব নিকট ইতিহাসে ঘটে যাওয়া দুটি অর্থনৈতিক মতবাদ মানুষের ওপর প্রয়োগ করে পরীক্ষা বা এক্সপেরিমেন্টাল করা হয়েছে। মানুষের জীবনে শান্তি তো আসে-ইনি বরং উল্টো মানুষের জীবন হয়ে উঠেছে দূর্বিসহ।

এর একটি হলো সামাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা, যা মানুষের সকল যোগ্যতাকে মই দিয়ে সমান করে গরুর খোয়ারের ন্যায় একই খাদ্য পরিবেশন করা হলো, তখন মানুষ চটকদারী মতবাদের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে মুক্তির জন্য নাড়া দিয়ে উঠলো। ফলে মতবাদটি নিজ দেশেই আত্মহনন করতে বাধ্য হলো। বর্তমান পৃথিবীর এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত দাবড়িয়ে চলেছে আরেক মতবাদ পূঁজিবাদ বা মুক্তবাজার। রাক্ষুসে ঘোড়া নামক এ মতবাদটিও মানুষের জীবনকে দূর্বিসহ করে তুলেছে। পূঁজিবাদ নামক এ শোষণ নীতিরই ফল হলো বর্তমান পৃথিবীর অন্যায় ও আমানবিক যুদ্ধগুলো। অন্যের সম্পদ লুট করার জন্য পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের সকল নিয়ম-কানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে অন্যের সীমার মধ্যে অন্যায়ভাবে প্রবেশ করা হচ্ছে। জনপদের পর জনপদ ধক্ষংস করা হচ্ছে। এসব গুলোই পূঁজিবাদের ফল।

এভাবে মানবরচিত বা মানুষের মস্তিস্ক প্রসূত বিভিন্ন আইন ও কানুন দিয়ে পৃথিবী নামক ছোট্ট গ্রহটিতে শান্তি আনয়নের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে– সাধনা করা হচ্ছে। কিন্তু শান্তি তো দূরের কথা বরং মানুষ এসব মতবাদের চাপায় পড়ে শুধু শুধুই পিষ্ঠ হচ্ছে। কিন্তু রাসূলের [সা] অর্থনৈতিক চিন্তা-চেতনার দিকে নযর দেয়া হচ্ছে না। আমরা কুরআন ও রাসূলের চরিত অনুযায়ী নামায, রোযা, হজ্ব পালন করছি কিন্তু আল কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করছি না।

www.pathagar.com

ফলে মানুষের মস্তিস্ক তৈরী অর্থনৈতিক মতবাদ ও কর্মকাণ্ড বিশ্বব্যাপী সামাজিক বিদ্বেষ, হানাহানি ও বিভেদের বিষবৃক্ষ বপন করছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হলো রাসূলের জীবন চরিতের কাছে ফিরে আসা। সর্বকালের সফল অর্থনীতিবিদ মুহাম্মাদ [সা]-এর অর্থ ব্যবস্থার প্রচলন করা। #

একটি ঐতিহ্যবাহী মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান

প্রধান কার্যালয় : নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম, ফোন : ৬৩৭৫২৩, ০১৭১১-৮১৬০০২
মতিঝিল কার্যালয় : ১২৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, পিএবিএক্স : ৯৫৬৯২০১, ৯৫৭১৩৬৪, ৯৫৫৯৭৫৩, ০১৭১১-৮১৬০০১
বিক্রয় কেন্দ্র : ১৫০-১৫২ নিউমার্কেট ঢাকা, ফোন : ৯৬৬৩৮৬৩ ☐ ৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা) বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোন: ৯৫৭৪৫৯০

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

E-mail : booksocietyltd@yahoo.com

بسم الله الرحمن الرحيم

অর্থনৈতিক লেনদেনে সুদ: মহানবী [সা]-এর মৌলিক দর্শন

এ কে আজাদ

বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সুদ একটি অতি পরিচিত শব্দ। সুদ শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো "Interest" [ইন্টারেষ্ট] বা Usury [ইউজারি]। অক্সফোর্ড এ্যাডভান্স লারনার্স ডিকশনারীতে ইন্টারেস্ট শব্দের অর্থ করা হয়েছে Money Charged for borrowing money or paid to sb who invests money. [ধারণকৃত অর্থের ওপর আরোপিত অতিরিক্ত অর্থ কিংবা যিনি অর্থ লগ্নি করেন তাকে প্রদত্ত অতিরিক্ত অর্থ]। আর Usury [ইউজারি] শব্দের অর্থ করা হয়েছে The practice of lending money at excessively high rates of interest. [অতি উচ্চ হারে অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে অর্থ ধার প্রদানের প্রথা]।

অপরদিকে সুদের আরবী প্রতিশব্দ হলো রিবা; এর সংজ্ঞায় আল্লামা আবু ইসহাক [র] বলেছেন, 'কুল্লু করজিন ইউখাজু মিনহু ফাহুয়ার রিবা' অর্থাৎ প্রত্যেক ধারের বিপরীতে অতিরিক্ত বা বেশী যে অর্থ গ্রহণ করা হয় তাই সুদ।

তাফসীরে তাবারীর ৩য় খন্ডে রিবার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'রিবা হচ্ছে সেই বাড়তি অর্থ যার বিনিময়ে ঋণদাতা ঋণ পরিশোধের সময় আরও কিছু দিনের জন্য বাড়িয়ে দেয়'। অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য বা অর্থের বিপরীতে শর্ত অনুসারে পূর্ব নির্ধারিত হারে সময়ের ব্যবধানে যে অতিরিক্ত পরিমান পণ্য বা অর্থ আদায় করা হয় তাই সুদ।

পবিত্র কুরআন শরীফে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সুস্পষ্ট ঘোষণা- 'অথচ আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম'। [সূরা: বাকারা ২৭৫]। এভাবে পবিত্র কুরআন শরীফের ৪টি সূরার মোট ১২টি আয়াতে সুদ নিষিদ্ধের ব্যাপারে বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে। সুদকে তিরষ্কার ও নিরুৎসাহিত করে পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মাদ [সা] বক্তব্য প্রদান করেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর শাসনামলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুদের ব্যবহার পরিহার ও নিষিদ্ধ করেও অর্থনীতির এক সফল বাস্তবায়ন তিনি দেখিয়েছেন।

www.pathagar.com

সুদ সম্পর্কে মহানবী [সা] বলেছেন, 'যে কর্জ দ্বারা লাভ হয় তাই রিবা বা সুদ'। [জামে সগীর]। তিনি আরও বলেন, 'সোনার বদলে সোনা, রূপার বদলে রূপা, গমের বদলে গম, যবের বদলে যব, খেজুরের বদলে খেজুর, লবণের বদলে লবণ লেনদেন করলে তা সমান ও নগদ হতে হবে। কেউ বেশী দিলে বা নিলে তা হবে সুদ। গ্রহণকারী ও প্রদানকারী এতে সমপর্যায়ভূক্ত।' [মুসলিম শরীফ]। সুদ এতটাই নিকৃষ্ট ও হীন কাজ যে সুদের সাথে জড়িত হওয়া মানে আল্লাহ রাব্বুল আমীনের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা। পবিত্র কুরআন শরীফে সুদ সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আমীন বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা কিছু বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ কর যদি তোমরা ঈমানদার হও। আর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও।' [সূরা বাকারা- ২৭৮]। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের এই ঘোষণা থেকে বুঝা যায়, সুদ কত বড় মারাত্মক অপরাধ। বোধ করি সে কারণেই সুদের পাওনা থাকলে তা পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সুদে ঋণ প্রদান করাই শুধু যাবে না বরং ঋণ প্রদানের পর যে সুদ পাওনা আছে বলে হিসাব করা হয় তাও পরিত্যাগ করতে হবে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] বলেছেন, 'জেনে শুনে সুদের এক দিরহাম গ্রহণ করা ছত্রিশ বার যেনা করার [ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার] চেয়েও মারাত্মক অপরাধ।' [মুসনাদে আহমদ, তাবারানী]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ [রা] হতে বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূল [সা] বলেছেন, 'সুদের সত্তরটি গুনাহ্। তার মধ্যে সর্বনিম্ন গুনাহ্ হলো নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সমতুল্য। [বায়হাকী ও ইবনে মাজাহ]।

সুদ সম্পর্কে মহানবী [সা]-এর মৌলিক দর্শন জানতে মহানবী [সা]-এর মুখ নি:সৃত আরও কয়েকটি হাদীসের আলোকপাত আমরা এখানে করতে পারি।

১. হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ [রা] হতে বর্ণিত, এক হাদীসে বলা হয়েছে, 'রাসূল [সা] সুদ গ্রহিতা, সুদ দাতা, সুদের লেখক এবং সুদ লেনদেনের স্বাক্ষীদ্বয়ের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। আর তিনি বলেছেন [পাপের দিক থেকে] তারা সকলেই সমান অপরাধী।' [মুসলিম, তিরমিজী, মুসনাদে আহমদ]।
২. হযরত আবু হুরায়রা [রা] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূল [সা] বলেছেন, মিরাজ রজনীতে আমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম যাদের পেট ছিল একটি ঘরের ন্যায় বিস্তৃত। তাদের পেট ছিল সাপে ভরা। সাপগুলো বাইরে থেকে দেখা

www.pathagar.com

যাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিবরাইল! এরা কারা? তিনি বললেন, তারা হলো সুদখোর।' [মুসনাদে আহমদ ও ইবনে মাজাহ]।

৩. হযরত আলী [রা] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল [সা] সুদ গ্রহিতা, সুদ দাতা এবং সুদের ঋণপত্র লেখকের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। তিনি আরও অভিসম্পাত করেছেন দান খয়রাতে বাধা দানকারীর প্রতি। আর তিনি নিষেধ করেছেন মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে ক্রন্দন করতে।' [নাসায়ী]।

৪. হযরত আবু হুরায়রা [রা] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল [সা] বলেছেন, আল্লাহতায়ালা চার ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ না করানোর জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তাদেরকে জান্নাতের কোন নিয়ামত ভোগ করার সুযোগও দেবেন না। এরা হলো (১) মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি (২) সুদখোর (৩) অন্যায়ভাবে ইয়াতিমের মাল ভক্ষণকারী এবং (৪) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান।' [মুসতাদরাকি হাকীম]।

৫. হযরত আবু হুরায়রা [রা] থেকে বর্ণিত, রাসূল [সা] বলেছেন, 'ক্ষতিকর ৭টি বিষয় থেকে তোমরা বেঁচে থাকবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে রাসূল [সা]! সে সাতটি বিষয় কী? জবাবে তিনি বললেন–(১) আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা (২) জাদু বিদ্যা শিক্ষা ও প্রদর্শন করা (৩) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা যা আল্লাহতায়ালা নিষেধ করেছেন (৪) সুদ ভক্ষণ করা (৫) ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ করা (৬) যুদ্ধের দিন পলায়ন করা এবং (৭) কোন সতী-স্বাধক্ষী রমণীকে অপবাদ দেয়া।' [বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ী]।

৬. হয়রত আবু হুরায়রা [রা] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল [সা] বলেছেন, 'সুদখোর লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' [মুসতাদরাকি হাকীম]

৭. হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব [রা] থেকে বর্ণিত, রাসূল [সা] বলেছেন, 'আজ রাতে [মিরাজ রজনীতে] আমি স্বপ্নে দু'জন লোককে দেখলাম। তারা আমার নিকট এসে আমাকে নিয়ে একটি পবিত্র ভূমিতে গেল, অত:পর আমরা চলতে চলতে একটা রক্ত নদীর তীরে পৌঁছে গেলাম। নদীর মাঝখানে একজন লোক

www.pathagar.com

দাঁড়িয়েছিল, আর নদীর তীরে একজন দাঁড়িয়েছিল যার সামনে ছিল কিছু পাথর। এরপর নদীর মাঝে দাঁড়ানো ব্যক্তি তীরের দিকে অগ্রসর হলে তীরে দাঁড়ানো লোকটি তার মুখমন্ডল লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করল এবং সে আগে যেখানে ছিল সেখানে ফিরে যেতে বাধ্য হলো। এভাবে যখনই সে উঠে আসার চেষ্টা করছে তখনই তীরের লোকটি তার মুখ লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ে মারছে, যার ফলে সে [পূর্বের স্থানে] ফিরে যাচ্ছে এবং পূর্ববৎ অবস্থান গ্রহণ করছে। নবী [সা] বললেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই লোকটি কে? কি কারণে তার এ শাস্তি হচ্ছে বা তার এ অবস্থা কেন]? তারা [আমার সাথের দু'জুন] বলল, নদীর মধ্যে দাঁড়ানো যে লোকটিকে দেখলেন সে একজন সুদখোর।' [বুখারী]।

উপরোক্ত হাদীসগুলো উদৃত করার পরে সুদ সম্পর্কে রাসূল [সা]-এর দৃষ্টি ভঙ্গি কি, আর এ বিষয়ে তাঁর মৌলিক দর্শনই বা কী, তা বোধকরি আর নতুন করে ব্যাখ্যা করার দরকার আছে বলে মনে হয় না। উপরোক্ত আলোচনা একথাই প্রমাণ করে যে অর্থনৈতিক লেনদেনে সুদ প্রথা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং হারাম। এমনকি বৈধ পন্থায় অর্জিত হালাল সম্পদ সুদের মাধ্যমে খাটানো বা সুদ পাওয়া যায় এমন অর্থেনৈতিক প্রতিষ্ঠানে জমা রেখে বা লগ্নি করে সুদের আয় দিয়ে জীবন যাপন করাও হারাম ভক্ষণেরই নামান্তর। যুক্তিতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, সুদের টাকায় অর্জিত খাবার ভক্ষণই শুধু হারাম নয়, সুদের টাকায় উৎপন্ন কাপড় পরিধান করাও হারাম। আর হারাম খাবার খেয়ে এবং হারাম কাপড় পরিধান করে ইবাদত বন্দেগী করাও আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় নয়। কেননা হালাল ভক্ষণ হলো ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত। এ প্রসঙ্গে মহানবী [সা]-এর একটি হাদীস এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সহীহ্ মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত বিশিষ্ট সাহাবী ও মশহুর হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আবু হুরায়রা [রা] থেকে বর্ণিত উক্ত হাদীসে রাসূল [সা] বলেছেন, 'আল্লাহ নিজে পবিত্র এবং পবিত্র বস্তুই কেবল তিনি গ্রহণ করে থাকেন। আর আল্লাহ মুমিনদেরকে সেই নির্দেশই দিয়েছেন যা তিনি দিয়েছেন রাসূলগণকে। আল্লাহ্ বলেছেন, হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে খাদ্য গ্রহণ কর এবং নেক আমল কর। অনুরূপভাবে তিনি মুমিনদেরকে বলেছেন, হে ঈমানদারগণ! আমার দেয়া পবিত্র খাদ্য হতে আহার কর। অত:পর রাসূল [সা] এমন এক ব্যক্তির প্রসঙ্গ উল্লেখ করলেন যিনি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ধূলিমলিন অবস্থায় [কোন পবিত্র স্থানে হাজির হয়ে] দু'হাত

www.pathagar.com

আকাশের দিকে তুলে [দোয়া করে আর] বলে, হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! অথচ তার খাদ্য, পানীয় ও পোশাক সব কিছুই হারামের, এমনকি সে এ পর্যন্ত হারাম খাদ্য দিয়েই জীবন ধারণ করছে। সুতরাং তার দোয়া কবুল হবে কী করে?

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক লেনদেনে মহনবী [সা]-এর মৌলিক দর্শন কি তা বোধকরি বুঝতে আর বাকী থাকে না কারোরই। সুদ যে মানুষের অর্থনৈতিক নৈতিকতার ক্ষেত্রে এক ধ্বক্ষংসকারী উপাদান সে কথা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। শুধু তাই নয়, সুদ প্রথা মানুষের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও এক বিষক্রিয়ার নাম। আর মানবতার কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক মুক্তির দিশারী মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] এই বিষক্রিয়াকে নিশ্চিহ্ন করতে পেরেছেন সহজেই। তাই তো সুদের বিরুদ্ধে তিনি ঘোষণা করেছেন জিহাদ। আর তাঁর বাস্তব জীবনে মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করতে সুদকে করেছেন পরিহার।

তাই আমরা বলতে পারি, সুদ সম্পর্কে মহানবী [সা]-এর এই দর্শন মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যেমন ভূমিকা রাখতে পারে, তেমনি মানুষের ইহকালীন জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন এবং পরকালীন জীবনে হতে পারে মুক্তির মূলমন্ত্র। #

www.pathagar.com

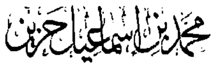

মহানবীর [সা] মহান শিক্ষা আন্দোলন

ড.আহসান হাবীব ইমরোজ

'ইকরা' [পড়]; মহাবিশ্বের মহান স্রষ্টা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেশতা জিবরাইল আমীনের মাধ্যমে বিশ্বের সর্বোত্তম মানুষ হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর কাছে সর্বপ্রথম এই শব্দটিই নাজিল করেন। ৬১০ খ্রিস্টাব্দের কোন এক সুন্দর দিনে মরুময় আরবের অন্ধকার পাথুরে হেরা গুহায় যখন এই শব্দটিসহ কুরআনের পাঁচটি আয়াত নাজিল হয় ঠিক তখনই শুরু হয়ে যায় মহানবীর [সা] মহান শিক্ষা আন্দোলন। এরপর পঁচিশ হাজার মাইল পরিধির এই পৃথিবীতে শুরু হয় মানব সভ্যতার এক প্রোজ্জল পরিক্রমা। বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক টমাস কার্লাইলের ভাষায়, 'মুহাম্মাদ [সা]-এর আবির্ভাব জগতের অবস্থা ও চিন্তাস্রোতে এক অভিনব পরিবর্তন সংঘটিত করে। যেন একটি স্ফুলিঙ্গ তমসাচ্ছন্ন বালুকাস্তূপে নিপতিত হল। কিন্তু এই বালুকারাশি বিস্ফোরক বারুদে পরিণত হয়ে দিল্লি হতে গ্রানাডা পর্যন্ত আকাশমণ্ডল প্রদীপ্ত করল।'

সমসাময়িক শিক্ষার অবস্থা

মহানবীর [সা] আবির্ভাবের প্রায় এক হাজার বছর আগে এথেন্সে হেমলক পানে আত্মত্যাগ করেন সক্রেটিস। অত:পর এই সহস্র বছরে রোমান এবং পারস্য সভ্যতা থিতিয়ে আসে। এই সময়টাকে ইউরোপে অন্ধকারের যুগ বলা হয়।

ভারতবর্ষে কিছুটা জ্ঞানচর্চা থাকলেও আরবে ছিল তখন আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগ। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর ভাষ্য মতে সে সময়ে আরবে মাত্র হাতেগোনা আঠারোজন মানুষ লেখাপড়া জানতো।

রাসূল [সা]-এর মহান শিক্ষা আন্দোলন

'ইকরা' [পড়] শব্দ ধারণ করে যিনি নবী হলেন সেই মুহাম্মাদ [সা] নবুয়ত পাওয়ার পরই শিক্ষা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি ছিলেন একজন উম্মি [অক্ষরের ধারণাহীন] কিন্তু তিনিই হলেন জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ধারক। মূলত কুরআনকেন্দ্রিক জ্ঞানের তিনি এতটাই চর্চা করতেন যে তাঁর শিক্ষক স্বয়ং আল্লাহতায়ালা তাঁকে বলেছেন, 'তুমি এত সাধনা করে শেষাবধি নিজকে ধক্ষংস করে ফেলো না।' তাঁর প্রেরণায় আবুবকর, ওমর, ওসমান, আলী, আ: রহমান,

www.pathagar.com

তালহা, যোবায়ের এরা হলেন এক একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানতাপস। আলী [রা] তো সেই সময়কার একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও বিজ্ঞানী ছিলেন। মহানবী জ্ঞানের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন, 'জ্ঞানার্জন করা প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ।' এর সময়সীমা সম্পর্কে বলেছেন, 'তোমরা দোলনা হতে কবর পর্যন্ত জ্ঞানার্জন কর।' এর বিস্তৃতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন 'এর জন্য প্রয়োজনে চীন দেশে যাও।' রাসূল [সা]-এর সাধনার চিত্রকে পূর্ণরূপে তুলে ধরে প্রখ্যাত প্রাচ্য ভাষাবিদ জার্মান পণ্ডিত ইমানুয়েল ডিউস বলেন, 'কুরআনের সাহায্যে আরবরা মহান আলেকজান্ডারের জগতের চাইতেও বৃহত্তর জগত, রোম সাম্রাজ্যের চাইতেও বৃহত্তর সাম্রাজ্য জয় করে নিয়েছিলেন। কুরআনের সাহায্যে একমাত্র তারাই রাজাধিপতি হয়ে এসেছিলেন ইউরোপে, যেখানে তিউনিসিয়রা এসেছিল ব্যবসায়ী রূপে, ইহুদিরা এসেছিল পলাতক বা বন্দী রূপে।'

জ্ঞানের এক মহান জাগরণ

রাসূলের [সা] এই মহান আন্দোলন সাহাবী থেকে তাবেয়ী এবং তাবেতাবেয়ী পর্যন্ত প্লাবনের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। পরবর্তী মহান পুরুষদের জীবনে আমরা সেই চিত্র দেখতে পাই।

ইমাম আবু হানিফার দাদা ছিলেন একজন ইরানী ক্রীতদাস। তার পিতা একজন সামান্য কাপড়ের ব্যবসায়ী থেকে একজন সওদাগরে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। তিনি তার পুত্রের মেধাকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন তাই তাকে ব্যবসায়ে না লাগিয়ে উচ্চ শিক্ষাদানে মনোযোগী হন। আবু হানিফা অল্প বয়সেই কুরআনে হাফেজ হন। আরবি ভাষা-সাহিত্যে তার ছিল অসামান্য দখল। তিনি জ্ঞানের তুলনায় ধনসম্পদ বা পদবিকে কোনই গুরুত্ব দিতেন না। তাই তার সুনাম শুনে কুফা নগরীর স্বেচ্ছাচারী গভর্নর ইবনে হুরায়রা তাকে কুফার কাজীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু জ্ঞানের পাগল আবু হানিফা তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। কোনভাবেই রাজি করাতে না পেরে অবশেষে সেই বর্বর গভর্নর তাকে বেঁধে বেত মারার আদেশ দেন। কথিত আছে, এগার দিন ধরে প্রত্যহ দশ ঘা করে দোররা মেরেও তাকে রাজি করানো যায়নি। দাম্ভিক খলিফা আল মনসুর তাকে ক্ষমা করেননি। আবু হানিফার অপরাধ ছিল তার নির্ভীক স্পষ্টবাদিতা। তিনি মানুষের ওপর খলিফার জুলুম এবং তার অনৈসলামিক কাজের সমালোচনা করতেন। এই অপরাধে আল মনসুর তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। জনসাধারণ তাকে এতই সম্মানের চোখে দেখতো যে, তার মৃত্যুর পর প্রায় দশ দিন ধরে তার জানাজার নামাজ হতো এবং প্রত্যেক দিন গড়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক এই

www.pathagar.com

নামাজে শামিল হতো। ইমাম আবু হানিফা মুসলিম জুরিসপ্রুডেন্স বা ব্যবহার শাস্ত্রের জন্মদাতা। তার শিষ্যদের ভিতর মুহাম্মাদ, আবু ইউসুফ ও জাফরের নাম আজ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। এই মশহুর শিষ্যত্রয়সহ চল্লিশজন শিষ্য নিয়ে আবু হানিফা একটি কমিটি গঠন করেন, মুসলিম ব্যবহার শাস্ত্র প্রণয়ণের জন্য একটি কমিটি প্রায় দীর্ঘ ত্রিশ বছর সাধনা করে মুসলিম আইন মহাকোষ প্রণয়ন করেন। এই সাধনায় বিমুগ্ধ হয়ে মশহুর জার্মান পণ্ডিত ভনক্রেমার বলেছেন, 'এটি ইসলামের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও বুদ্ধির ধারণাতীত ফল।' অপরদিকে ফিহরিস্ত নামক বিখ্যাত গ্রন্থসূচি প্রণেতা মোহাম্মদ ইবনে নাদিমের মতে জাবির ইবনে হাইয়ান দুই হাজারেরও অধিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। শুধু চিকিৎসা-বিষয়কই তার পাঁচ'শ গ্রন্থ ছিল। আর বিজ্ঞানের ওপরও তার সমসংখ্যক বই ছিল যার ভিতর একখানি ছিল দুই হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত। চৌদ্দশত আঠারো শতক পর্যন্ত তার লিখিত গ্রন্থগুলি ইউরোপ ও এশিয়ার বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিমিয়া বা রসায়নের ওপরই তার একশত গ্রন্থের সন্ধান মেলে। আর তাই তাকে রসায়ন শাস্ত্রের জন্মদাতা বলা হয়। তিনি জ্ঞানের জন্য এতটাই পাগলপারা ছিলেন যে, বলিষ্ঠভাবে বলেছেন, 'আমার ধনদৌলত, টাকাকড়ি, আমার ছেলেরা, ভাইয়েরা ভাগ করে নিয়ে ভোগ করবে। কিন্তু জ্ঞানের দরজায় বারবার আঘাত করে আমি যে শিক্ষা দিয়ে গেলাম, তাই আমার তাজ হিসাবে চিরকাল শোভা পাবে।'

আব্বাসীয় খলিফা আল মামুনের শাসনকালকে মুসলিম জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনের জন্য দেশ বিদেশের মশহুর চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক, গাণিতিক, জ্যোতির্বিদ, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, কবি, আইনজীবী, মোহাদ্দেস, তাফসিরকারকদের নিজের দরবারে জড়ো করেন। অত:পর তাদের নিয়ে দারুল হিকমা তথা বিজ্ঞান নগরী প্রতিষ্ঠিত করে তাদের গবেষণার সর্বাধিক সুযোগ ও পরিবেশ দান করেন। আল মামুন তাদের সমবেত প্রচেষ্টায় হিব্রু ও গ্রিক জ্ঞানভাণ্ডারকে উজাড় করে আরবিতে অনুবাদ ও রূপায়ন করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ঠিক এমন এক প্রেক্ষাপটেই ৭৮০ খ্রিস্টাব্দে মুসা আল খারিজ্মী জন্মগ্রহণ করেন। যার সিদ্ধান্তগুলি মধ্যযুগের গণিতশাস্ত্রকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তার পিতা প্রথম জীবনে, একজন ডাকাত ছিলেন, তিনি খোরাসানের সড়কে রাহাজানি করে বেড়াতেন। অত:পর তার মানসিকতার পরিবর্তন হয় এবং বাগদাদে একমনে জ্ঞান চর্চা করেন। তারই তিন পুত্র মুহাম্মদ, আহম্মদ, আর হাসান আরব বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। সেই সময়েই তাদের বাড়িতে একটি নিজস্ব গবেষণাগার ছিল এবং

www.pathagar.com

তারা সেখানে দিনরাত জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা চালাতেন। এদের ভিতর মুহাম্মাদ তথা মুসা আল খারিজমী সর্বাধিক মেধাবী ছিলেন। তিনি বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি শুধু আরবি নয় বরং হিব্রু, গ্রিক ও সংস্কৃতি ভাষারও সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি একাধারে ভৌগোলিক, জ্যোতির্বিদ্যা, গাণিতিক ও দার্শনিক ছিলেন। আর মামুনের প্রচেষ্টায় তিনিসহ সত্তরজন ভূ-তত্ত্ববিদ মিলে 'সুরত আল আরদ' বা পৃথিবীর প্রথম গ্লোব তৈরি করেন। এটাই পরবর্তীতে পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কনে মডেল হিসাবে গৃহীত হয়। ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের মতে খারিজমীই আজকের বীজগণিতের জনক।

আল কুরআনের পরই সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থটির নাম বুখারী শরীফ। ইমাম বুখারীর পুরো নাম আবু-আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী। অল্প বয়সেই তিনি পিতাকে হারান। কিন্তু স্নেহময়ী মা ছিলেন একজন অত্যন্ত ধার্মিক ও বিদূষী মহিলা। বরাবরই তিনি পুত্রের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার দিকে নজর রাখতেন। তাই ইমাম বুখারী ছোটবেলা থেকেই এমনভাবে গড়ে উঠেছিলেন যে কোন হাদিস একবার মাত্র শুনলেই তার সনদসহ নির্ভুলভাবে সারা জীবন মনে রাখতে পারতেন। প্রায় কুড়ি বছর বয়সে বুখারী মাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাসহ মক্কায় হজ পালন করেন এবং পরিশেষে সেখানে কুরআন হাদিসের ব্যাপক জ্ঞান চর্চায় লিপ্ত হন। সেই বয়সেই মক্কায় অবস্থানকালে তিনি রাসূলের [সা] রওজার পার্শ্বে বসে বসে অক্লান্ত পরিশ্রম করে জ্যোৎস্না রাতসমূহে সারা রাত জেগে 'কাদায়া আল সাহাবা ওয়াল তাবেয়িন' ও 'আল তারিক আল কবির' নামক দুটি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন। ইতিহাসে তার গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি বলতেন, 'এমন কোন নাম ইতিহাসে নেই যার সম্বন্ধে কোন বিশেষ কাহিনী আমার জানা নেই।' অত:পর তিনি দেশ ভ্রমণে বের হন এবং প্রায় চল্লিশ বছর আজকের মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করে সেখানকার প্রায় এক হাজারেরও বেশি জ্ঞানীদের সুহবত লাভ করেন এবং তাদের নিকট থেকে ব্যাপকভাবে হাদিস সংগ্রহ করেন। তিনি সাকুল্যে প্রায় ছয় লক্ষ হাদিস সংগ্রহ করেন যার ভিতর প্রায় দুই লক্ষ তার কণ্ঠস্থ ছিল। এই বিরাট সংগ্রহের ভিতর অনেক যাচাই বাছাই করে তিনি মাত্র নয় হাজার হাদিস সহীহ হিসাবে গ্রহণ করে আল জামী আল সহীহ নামে তা সংকলন করেন। মাত্র একটি হাদিস সংগ্রহের জন্য তিনি কয়েকশত মাইল সফর করেন। তিনি খুবই আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন ছিলেন। একবার বোখারার শাসক তার পুত্রদের শিক্ষা দেয়ার জন্য বুখারীকে তলব করেন, কিন্তু বুখারী এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, 'শিক্ষা গ্রহণ করতে হলে শাহজাদাদেরকেই আমার পর্ণ কুটিরে আসতে হবে।'

www.pathagar.com

আলকিন্দী মুসলিম জগতের 'আল ফাইলাসুফ' বা শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হিসাবে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। পাশাপাশি মৌলিক বিজ্ঞান সাধনায়ও তার নাম আরব জগতে সবচেয়ে বিখ্যাত। তার পুরো নাম ছিল আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আলকিন্দী। তিনি ৮১৩ সালে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। আলকিন্দী একাধারে কুরআন, হাদিস, ফিকাহ, ইতিহাস, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, রাজনীতি, চিকিৎসাবিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান, অংকশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যায় বিশারদ ছিলেন আর সঙ্গীতেও তার আকর্ষণ কম ছিল না। এরকম বারোটি স্বতন্ত্র বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার পরও তিনি আরবি, গ্রিক, হিব্রু, ইরানী, সিরিয়ান এমনকি সংস্কৃতসহ ছয়টি ভাষাতে অসাধারণ বুৎপত্তি অর্জন করেন। ষোল শতক পর্যন্ত জগতে যে সব মহা মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের শ্রেষ্ঠ বারোজনের ভিতর একজন হিসাবে আলকিন্দীকে গণ্য করা হয়। তিনি দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, রাজনীতি, অংকশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা এবং সঙ্গীতের ওপর প্রায় দু'শত পঁয়ষট্টিখানা গ্রন্থ রচনা করেন। আজও ইউরোপে আলকিন্দীকে দর্শনের প্রথম পরিচায়ক ও ভাষ্যকার হিসাবে শ্রদ্ধা করা হয়।

তিবিক্ষয়া বা চিকিৎসা-শাস্ত্রে মুসলিমদের ভিতর সর্বাপেক্ষা প্রথম উল্লেখযোগ্য সাধক ছিলেন আলী ইবনে সহল-রব্বান আল্-তাবারী। তিনি সম্ভবত আট দশকের শেষের দিকে তাবারীস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আরবি ছাড়াও সিরীয়ান, ফারসি, হিব্রু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। আলী তাবারী চিকিৎসা বিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে 'ফিরদৌস আল হিকমাহ ফি আল-তিব্ব' বা 'ঔষধের স্বর্গ' নামক গ্রন্থটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এটিকে আরবি চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রথম বিশ্বকোষ বলা যেতে পারে।

বর্তমান ইরানের রাজধানী তেহরানের অন্তর্গত রায় নগরে ৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে আবুবকর মোহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া জন্মগ্রহণ করেন। ১২২০ সালে মোঙ্গলদের হাতে ধক্ষংসের আগে এ শহরটি মুসলিম জাহানে জ্ঞানবিজ্ঞানের জন্য বিখ্যাত ছিল। সেই জন্য আবুবকর জন্মভূমির নামানুসারে নিজের নিসবা আলরাযী গ্রহণ করেন। তিনি আলকেমী নিয়ে গবেষণা করতেন কিন্তু তার সবচেয়ে বড় অবদান চিকিৎসাশাস্ত্রে। তিনি নানা বিষয়ে কমপক্ষে দুইশত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তার ভিতর চিকিৎসাশাস্ত্রেই প্রায় একশত। তার সবচেয়ে বড় কীর্তি হচ্ছে বসন্ত ও হাম রোগ সম্বন্ধে 'আল জুদারি ওয়াল হাসাবাহ্' নামক পুস্তকটি। এই গ্রন্থটি ল্যাটিন ও ইউরোপীয় সকল ভাষাতেই তরজমা করা হয়। শুধু ইংরেজি ভাষাতেই ১৪৯৮ সাল থেকে ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত এটি চল্লিশবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। তার আরেকটি শ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে 'আল-হাবী' সর্বপ্রকার রোগ সম্বন্ধে বিস্তৃত

www.pathagar.com

আলোচনাসহ চিকিৎসার প্রণালী ও ঔষধের ব্যবস্থা সম্বলিত একখানি আভিধানিক গ্রন্থ। এটি কুড়ি খণ্ডে সমাপ্ত হয়, বর্তমানে এর দশটি খণ্ডের অস্তিত্ব আছে। 'আল-হাবী' ইউরোপীয় চিন্তারাজ্যে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেন। ১৪৮৬ সালের পর থেকে ইউরোপের প্রত্যেক দেশেই এই বইটি ক্রমাগত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতে থাকে। এর নবম খণ্ডটি ইউরোপের প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ষোলশতক পর্যন্ত নির্দিষ্ট ছিল। আল্-রাজীর জ্ঞানার্জনে কেমন আগ্রহ ছিল সেটি তার নিম্নোক্ত বক্তব্য হতেই বুঝা যায়: 'যারা আমার সাহচার্যে এসেছেন, কিংবা আমার খোঁজ রাখেন, তারাই জানেন জ্ঞান-আহরণে আমার কি আকুল আগ্রহ, কি তীব্র নেশা। কিশোর কাল থেকেই আমার সকল উদ্যম এই একটি মাত্র নেশায় ব্যয়িত হয়েছে। যখনই কোন নতুন বই হাতের কাছে পেয়েছি, কিংবা কোন জ্ঞানীর সন্ধান পেয়েছি, তখনই অন্য সকল কাজ ফেলে, বহু আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করেও নিবিষ্ট মনে সে বইখানা পাঠ করেছি কিংবা সেই জ্ঞানীর নিকট যথাসাধ্য শিক্ষাগ্রহণ করেছি। জ্ঞান সাধনায় আমার এমন অদম্য উৎসাহ ও অসাধারণ সহিষ্ণুতার ফলেই মাত্র এক বছরে আমি কুড়ি হাজার পৃষ্ঠার মৌলিক রচনা লিখেছি [প্রতিদিন প্রায় ষাট পৃষ্ঠা করে] এবং তাও তাবিজ লেখার মতোই ঝরঝরে অক্ষরে। প্রায় পনের বছর আমি ব্যয় করেছি আমার বিরাট চিকিৎসাভিধান লিখতে। দিনরাত এমন কঠোর পরিশ্রম করেছি যে, শেষে আমি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলি। কিন্তু এখনও আমার জ্ঞান পিপাসা মিটেনি। আজও আমি অন্যকে দিয়ে বই পড়িয়ে শুনি কিংবা আমার রচনা লেখাই।'

আবু জাফর মোহাম্মদ ইবনে জরীর আল-তাবারী ছিলেন জাতিতে ইরানী। তিনি ইরানের সবচেয়ে গীরিসংকুল স্থান তাবারিস্থানে ৮৩৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আরবি ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, তর্কশাস্ত্র ও ভূতত্ত্বে গভীর জ্ঞানার্জন করেন। এ সময় তার সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ ছিলো কুরআনের তাফসির ও হাদিসে। তিনি জ্ঞানীদের সংস্পর্শে গিয়ে সরাসরি জ্ঞানার্জনের জন্য আরব ছাড়াও মিসর, সিরিয়া, ইরাক, ইরান প্রভৃতি দেশে কয়েক বছর সফর করেন। এ সময় তাকে বহুদিন অর্ধাহারে এমনকি অনাহারেও কাটাতে হয়েছে। একবার অবস্থা এতই শোচনীয় হয়ে ওঠে যে, উপর্যুপরি কয়েকদিন অনাহারে কাটিয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য নিজের জামার দু'টি হাতার বিনিময়ে তাকে রুটি সংগ্রহ করতে হয়েছিল। আল-তাবারী ইসলামের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন একজন শ্রেষ্ঠ তাফসিরে কুরআন এবং একজন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক হিসাবে। তার তাফসিরের নাম 'জামি আল বয়ান্ ফি তাফসির আল কুরআন'। এটি বর্তমানে

www.pathagar.com

সুবৃহৎ ত্রিশটি খণ্ডে প্রকাশিত। তাবারীর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থের নাম 'আখবার আল-রাসূল ওয়াল মুলুক' অর্থাৎ পয়গাম্বর ও রাজাদের ইতিহাস। বর্তমানে ইতিহাসখানি মাত্র পনের খণ্ডে প্রকাশিত হয়। কিন্তু পণ্ডিতদের বিশ্বাস যে, আসল ইতিহাসখানি এর কমপক্ষে দশগুণ ছিল। কথিত আছে যে, একশত পঞ্চাশ খণ্ডে সমাপ্ত এই বিশাল ইতিহাস যখন তার ছাত্ররা পড়তে অস্বীকার করে, তখন তিনি আক্ষেপ করে অধুনা-প্রকাশিত পনেরো খণ্ডের সার সংকলনটি করেছিলেন। এই বিরাট গ্রন্থে সৃষ্টির আদি কাল থেকে ৯১৫ সাল পর্যন্ত বিশ্ব ইতিহাসের বর্ণনা আছে। জ্ঞানানুশীলনে তার জীবনকে তিনি কিভাবে উৎসর্গ করেছিলেন তার পরিচয় মেলে যখন আমরা জানতে পারি যে, তিনি ক্রমাগত চল্লিশ বছর যাবত দৈনিক চল্লিশ পৃষ্ঠা করে মৌলিক লেখা রচনা করতেন। অর্থাৎ এ সময়ে তিনি রচনা করেন প্রায় পাঁচ লক্ষ চুরাশি হাজার পৃষ্ঠা।

৮৫৮ সালে হাররান অঞ্চলে আল-বাত্তানী জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি বাগদাদের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষালাভ করেন। মাত্র উনিশ বছর বয়সেই আল-বাত্তানী বাগদাদ ত্যাগ করে ফোরাত নদীর পূর্ব উপকূলস্থ আল-রাক্কা নামক স্থানে গমন করেন এবং সেখানে আমৃত্যু গবেষণায় লিপ্ত থাকেন। এখানে তার নিজস্ব গবেষণার উপযোগী প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ছিল। তিনি গণিতশাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিদ্যায় একজন মৌলিক গবেষক ছিলেন। এ দু'টি বিষয়ে তিনি অনেক মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তার অধিকাংশই আজ কালের করালগ্রাসে হারিয়ে গেছে। দশ-শতকের মাঝামাঝি একজন শান্ত প্রকৃতির ক্ষুদ্রাকৃতি তুর্কি পোশাক-পরা বৃদ্ধলোক আলেপ্পোর হামাদানি আমীর সায়েফউদ্দৌলার দরবারে উপস্থিত হন। তাকে আট-দশটি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে দেখে এবং ইসলামী ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, এমনকি কবিতা ও গানে তার অগাধ পাণ্ডিত্য ও পারদর্শিতা দেখে গুণগ্রাহী আমীর তাকে সসম্মানে আপন দরবারে স্থান দেন। এর কিছু দিনের ভিতরই তাকে সভাপণ্ডিতদের মর্যাদা দান করেন। এই জ্ঞানী লোকটিই প্রাচ্যের 'মুয়াল্লিম-সানী' বা দ্বিতীয় শিক্ষাগুরু আবু নসর মুহাম্মদ আল ফারাবী। তিনি আকৃতিতে ক্ষুদ্র, চক্ষুতারকা আরো ক্ষুদ্র এবং সামান্য কয়েকগাছি শ্মশ্রু শোভিত পুরুষ ছিলেন। তিনি বিবাহ করেছিলেন কিনা বা তার পুত্র-কন্যা ছিল কিনা, কিছুই জানা যায় না। কিন্তু অদম্য জ্ঞানস্পৃহা তাকে জন্মভূমি ত্যাগ করতে প্রলুব্ধ করে। কাজীর মতো সম্মানিত পদে ইস্তফা দিয়ে পঁচিশ বছর বয়সে তৎকালীন জ্ঞানবিজ্ঞানের কেন্দ্রভূমি বাগদাদে তিনি গমন করেন। প্রায় সত্তরটি বিরাট নোটবুকে দর্শনশাস্ত্রের সারাংশ তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। ফারাবী

www.pathagar.com

অ্যারিস্টটলের আত্মা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থটি একশতেরও বেশি বার এবং পদার্থবিদ্যা বিষয়টি চল্লিশবার পাঠ করেছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচ্যের সুধী সমাজে এরিস্টটল মুয়াল্লিম-আউয়াল বা আদিগুরু ও ফারাবি মুয়াল্লিম সানী বা দ্বিতীয় গুরু হিসাবে পরিচিত। মুসলিম দার্শনিকদের পিরামিডে তার নাম সর্বোচ্চে। তিনিই ইসলামের প্রথম বিশ্বকোষ-রচয়িতা ও মুসলিম তর্কশাস্ত্রের জন্মদাতা।

ঐতিহাসিক ও ভূতাত্ত্বিক হাসান আলি আল মাসুদী বাগদাদে সম্ভবত নয় শতকের শেষের দিকে জন্মগ্রহণ করেন। আল মাসুদী বাল্যেই উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হন। ইতিহাস, দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র, ভূগোল, জ্যোতিষশাস্ত্র ও প্রাণীতত্ত্বেও তার অসাধারণ বুৎপত্তি জন্মে। সাহিত্য-সঙ্গীত ও কবিতা রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি সমসাময়িক আলেমদের মতোই বিশ্বাস করতেন 'আর-রিহ্‌লাহ্‌ ফিতালাব আল ইলম' অর্থাৎ সফর করলে জ্ঞানবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। তাই পথের মোহে যৌবনেই তিনি ভ্রমণে বহির্গত হন ও প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী তৎকালীন দুনিয়া চষে বেড়ান। আল মাসুদী তার দীর্ঘ সফরের অভিজ্ঞতা থেকে শেষ জীবনে সুবৃহৎ গ্রন্থ 'মরূয-আল যাহাব ওয়া-মাআদিন আল-জওহর' বা 'সোনালী ময়দান হীরার খনি' প্রণয়ণ করেন। এই বিরাট ইতিহাস ভূগোলের বিশ্বকোষখানি ত্রিশটি খণ্ডে সমাপ্ত। এই জন্য তাকে মুসলিম ঐতিহাসিকদের ভিতর হেরোডোটাস বলা হয়। উক্ত গ্রন্থের উপক্রমণিকায় মাসুদী নিজেই বলেছেন, 'ইতিহাস রচনার পূর্বে তিনি পঞ্চাশজন মশহুর ঐতিহাসিকের গ্রন্থ পাঠ করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।' তার আরেকটি বিরাট গ্রন্থের নাম 'মিরাতুল যামান' বা 'আখবার-উয-যামান'। এটির অসম্পূর্ণ অংশ ত্রিশ খণ্ডে ভিয়েনার গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

বিশ্বসভ্যতায় রাসূলের [সা] শিক্ষা আন্দোলনের অবদান

রাসূল [সা]কে আল্লাহতায়ালা প্রজ্জলিত সূর্যের সাথে তুলনা করেছেন। তাই তার প্রভাব ও অবদান সকল কাল ও স্থানের গণ্ডি পেরিয়ে শাশ্বত ও অসীম। আমরা ক্ষুদ্র মানুষ সেটি উপলব্ধি করতে চাইলে একটি নির্দিষ্ট সময় এবং এলাকাকে বেছে নিতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা ৭ম থেকে ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের এলাকাটিই বেছে নিতে চাই।

ইসলামপূর্ব ইউরোপের করুণ অবস্থা

ইসলামের আবির্ভাবের সময় ইউরোপীয়রা অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। তাদের নিজস্ব কোন সুসংগঠিত ভাষা ছিল না। কুঁড়েঘর ও মাটিরঘর ছাড়া সমস্ত ইংল্যান্ড ফ্রান্সে দালানবাড়ির সংখ্যা ছিল নিতান্ত নগণ্য; লন্ডনের রাস্তাগুলি ছিল জলাভূমি।

www.pathagar.com

সে সব স্থানে বুনো হাঁস ও পাখি ইতস্তত: বিচরণ করতো। উইলিয়াম ড্রেপারের ভাষায়, 'ইউরোপীয়রা তখনও বর্বর বুনো অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাদের শরীর অপরিষ্কার, মন কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। অধিবাসীরা ঝুপড়িতে বাস করতো। মেঝেতে নলখাগড়া বিছিয়ে দেয়ালে মাদুর টাঙ্গিয়ে রাখতে পারলেই তা বিত্তবানের লক্ষণ বলে ধরা হতো। সীম, বরবটি গাছের মূল এমনকি গাছের ছাল খেয়ে তারা মানবেতর জীবনযাপন করতো। [J.W. Draper - History of Intellectual Development of Europe- p.27-28]

যখন আমাদের স্যাক্সন পূর্ব পুরুষরা কাঠের কুঠরিতে বাস করতো; ময়লা খড়ের উপরে বিশ্রাম করতো; যখন আমাদের ভাষা অসংবদ্ধ ছিল এবং পড়াশুনা শুধু কয়েকজন মঠবাসী পাদরির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তখন সমস্ত ইউরোপ বর্বর অজ্ঞতায় ও বুনো ব্যবহারে নিমজ্জিত ছিল।

পোপেরা টাকার বিনিময়ে যে সার্টিফিকেট দিতো তা স্বর্গের গেটের প্রবেশপত্র বলে ধরে নেয়া হতো। পোপদের মতে যে কোন ধনবান খ্রিস্টানেরা স্বর্গে যেতে পারতো। অঢেল সম্পদের মালিক ছিল এই পোপেরা। এছাড়াও এরা ছিল সব চেয়ে বেশি প্রভাবশালী। ভ্যাটিকানের পোপ ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী ও ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি। ইউরোপের সব দেশের রাজাদের ভাগ্য নির্ভর করতো এই পোপের সিদ্ধান্তের ওপরে। পোপের সিদ্ধান্তের প্রতি সংশয় প্রকাশ করায় জনৈক জার্মান সম্রাটকে প্রচণ্ড শীতের মধ্যে তিনদিন গীর্জার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। পোপের আদেশ অমান্য করলে সাধারণ লোককে পুড়িয়ে মারা হতো। ফ্রান্সের রাজা ফিলিপকে পোপ যে অপমান করেছিল তাতে ক্ষোভে দু:খে তিনি বলেছিলেন, 'হায় সালাদিন, তুমিই সুখী; তোমার ওপরে পোপ নেই, আমিও মুসলমান হয়ে যাবো।' প্রকৃতঅর্থে, পোপদের অত্যাচারের কোন সীমা ছিল না। কুমারী মেয়েদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হতো হেরেমে। কেউ পোপের আইন অমান্য করলে তাকে জীবন্ত দগ্ধ করা হতো।

সামন্তরাজ এবং তার অনুচরদের জন্য মেয়ে সরবরাহ করতো এই লাঠিয়ালেরা। পাদ্রিরা মত দিতো যে, কোন অভিজাত সম্প্রদায়ের সদস্যদের শয্যাশায়িনী না হয়ে যদি কোন কুমারী মেয়ের অন্য কোন সম্প্রদায়ের ছেলের সঙ্গে বিবাহ হয় তবে সে বিয়ে ধর্মমতে সিদ্ধ হবে না। এ ছাড়াও অভিজাত সম্প্রদায়ের জারজ ছেলেমেয়েরা পূর্ণ সামাজিক মর্যাদা ও সমান অধিকার পেতো বলে অনেক ভূমিদাসদের সুন্দরী স্ত্রী ও কুমারী মেয়েরা স্বেচ্ছায় অভিজাতদের শয্যাশায়িনী হতো। আর স্বেচ্ছায় না গিয়ে উপায়ও ছিল না। লাঠিয়াল বাহিনীর লোকেরা

www.pathagar.com

তাদের মালিকের জন্য প্রত্যহ নতুন নতুন মেয়ে ধরে নিয়ে যেতো। তাই, কোন মতেই কুমারীত্ব, সতীত্ব রক্ষা করা সম্ভব ছিল না।

সাবানের ব্যবহার অজানা থাকায় এবং অপরিষ্কার থাকা ধর্মপ্রীতির লক্ষণ বলে বিবেচিত হওয়ায় খ্রিস্টানরা সারা বছরেও একবার গোসল করতো কিনা সন্দেহ। একবার এক সন্নাসী সুদীর্ঘ সত্তর বছর গোসল না করে রেকর্ড সৃষ্টি করেন। খ্রিস্টানরা ধর্মগ্রন্থ পাঠের সময়ে শুধু আঙ্গুলের অগ্রভাগে পানি স্পর্শ করে পবিত্র হতো।

সহস্র সহস্র মানুষ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যেত। প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাবে সমগ্র ইউরোপ একবার জনমানব শূন্য হয়ে গিয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েও প্যারিসের রাজপথে শূকরের পাল চরে বেড়াতো। বৃষ্টি হলে রাস্তায় একহাঁটু কাদা জমতো। লন্ডনের অবস্থাও ছিল এমনি।

সে সময়ে ধর্মীয় আদালত প্রায় দেড়লক্ষ ইয়াহুদিকে মৃত্যুদণ্ডসহ বিবিধ কঠোর দণ্ড দেয়। প্রকৃত অর্থে ধর্ম বলতে ইউরোপে তেমন কিছু ছিল না। স্বয়ং পোপেরা পর্যন্ত নাস্তিক ছিল। পাদ্রিরা মদের নেশায় বেসামাল হয়ে নগ্ন অবস্থায় রাস্তায় নাচতো।

ইউরোপে তখন শিক্ষা বলতে ধর্মীয় শিক্ষাকেই বুঝাতো। আর এই শিক্ষা শুধু সীমাবদ্ধ ছিল মুষ্টিমেয় কিছু পাদ্রী ও সন্নাসিদের মধ্যে। এমনকি অনেক পাদ্রী পর্যন্ত কোন কিছু লিখতে বা পড়তে পারতো না।

ব্যাভেরিয়ার রাজা একখানা পাণ্ডুলিপির বিনিময়ে একটি নগর ছেড়ে দিতে চেয়েও তা পাননি। একখানা উপাসনা পুস্তক ধার করার জন্য ফ্রান্স রাজাকে বহু মূল্যবান দ্রব্য গচ্ছিত রাখতেও অভিজাতদিগকে জামিন দিতে হয়েছিল। প্যারিসের বিশপ পিটারের বৃহৎ লাইব্রেরিতে মাত্র আঠারোখানা পুস্তক ছিল। রানী ইসাবেলা দুইশ একখানা গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন তন্মধ্যে সাতষট্টি খানাই ধর্মপুস্তক। আর এটিই ছিল তৎকালীন খ্রিস্টান ইউরোপের সবচেয়ে বড় লাইব্রেরি।

মুসলিমদের ইউরোপ বিজয় অভিযান

যদি ইউরোপের বুকে মুসলিমদের আগমন না ঘটতো তবে হয়তো আজও বিশ্বের বুকে ইউরোপীয়রা সবচেয়ে অনুন্নত, অজ্ঞ ও হীন জাতি হিসেবে বিবেচিত হতো। হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর ওফাতের [৬৩২ খ্রি] পূর্বেই বিভিন্ন দিকে আরব মুসলিমদের বিজয় অভিযান শুরু হয়েছিল। মুসলমানেরা এবার ইউরোপ অভিযানের জন্য তৈরি হলেন। প্রথমে তারা কনস্টানটিনোপল অবরোধ করলেন। কিন্তু এর দৃঢ় নৈসর্গিক অবস্থানের জন্য বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না।

www.pathagar.com

কিউটা দুর্গের অধিপতি জুলিয়ান এবং স্পেনের রাজা রডারিকের মধ্যে এক বিবাদ শুরু হলো আর এই বিবাদের সুযোগ নিয়েই মুসলমানরা স্পেনে প্রবেশের সুযোগ গ্রহণ করলেন।

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী স্পেনের অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা তাদের মেয়েদেরকে পাঠাতেন রাজ দরবারে। উদ্দেশ্য হলো যে, তাদের মেয়েরা রাজকীয় আইন-কানুন শিক্ষা করবে সেখানে। দুর্গাধিপতি জুলিয়ানও তার মেয়েকে রডারিকের দরবারে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সুন্দরী কন্যা ফ্লোরিন্ডার রূপে মোহিত হলেন রডারিক। কামনা চরিতার্থ করতে গিয়ে সতীত্ব হারালো ফ্লোরিন্ডা।

জুলিয়ান ছিলেন সিংহাসনচ্যুত রাজা উইটিজারের জামাতা। রডারিক উইটিজারকে সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন বলে পূর্ব থেকেই রডারিকের প্রতি জুলিয়ানের ক্ষোভ ছিল।

রাজধানী টলেডো ত্যাগ কালে রডারিক জুলিয়ানকে কিউটা থেকে কয়েকটি শিকারী বাজপাখি পাঠিয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। কিউটায় পৌঁছতেই জুলিয়ান রডারিককে উচিৎ শাস্তি দেয়ার জন্য উত্তর আফ্রিকার সেনাপতি মূসা বিন নুসাইর-এর দরবারে হাজির হয়ে সজল চোখে তার মেয়ের দুর্দশার কাহিনী বর্ণনা করলেন এবং রডারিককে শাস্তি দেয়ার জন্য মূসার সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

প্রথমে পরীক্ষামূলক অভিযানের জন্য মূসা বিন মালিককে চারশো পদাতিক, একশো অশ্বারোহী সৈন্য এবং চারখানা যুদ্ধ জাহাজের দায়িত্ব দিয়ে জুলিয়ানের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন।

প্রথম অভিযানে কৃতকার্য হয়ে মূসা তারিক বিন জিয়াদ নামক নবদীক্ষিত বার্বার মুসলিম লেফটেন্যান্টকে পাঁচ হাজার আফ্রিকান ও বার্বার সৈন্য এবং দুই হাজার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর একদলে চারটি যুদ্ধ জাহাজে করে পুনরায় স্পেন অভিযানে পাঠালেন। তারিক ভূ-মধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে যে পাহাড়ে অবতরণ করেন তা আজও জবালুত তারিক বা জিব্রাল্টার নামে অভিহিত। তিনি তীরে ভিড়েই তার সবগুলি জাহাজে আগুন ধরিয়ে দিলেন আর মুসলিম মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আমাদের দুটি পথই খোলা রয়েছে, একটি হলো যুদ্ধে জয়লাভ করা আর অপরটি হলো মৃত্যুবরণ করা। পালাবার কোন পথ নেই'।

ইতিমধ্যে আফ্রিকা থেকে আরো পাঁচ হাজার সৈন্য এসে তারিকের সৈন্যের সংখ্যা দশহাজারে উন্নীত করেছিল। অন্যদিকে রডারিকের সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ।

www.pathagar.com

৭১১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ শে জুলাই উভয়পক্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। রডারিকের সৈন্য সংখ্যা দেখে মুসলিম বাহিনী প্রথমে কিছুটা ভগ্নোদ্যম হয়ে পড়লো। তারিক তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'প্রিয় সৈন্যগণ! তোমাদের সম্মুখে শত্রু, পিছনে সমুদ্র, পালাবার কোন পথ নেই। সাহস ও আশার সঙ্গে যুদ্ধ না করলে বাঁচার কোন আশা নেই।' মুসলিম বাহিনীর প্রবল তেজের মুখে খ্রিস্টান বাহিনী পশ্চাদাপসরণ করলো। হাজার হাজার সৈন্য মারা গেল এ যুদ্ধে। রডারিক উপায়ান্তর না দেখে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলো।

এদিকে মুসীন নামের এক কর্মচারীর অধীনে কয়েকশো অশ্বারোহী সৈন্যের এক দল কর্ডোবা বিজয়ের জন্য অগ্রসর হলো। রাতের আঁধারে কেউ তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে পারলো না। হঠাৎ শিলাবৃষ্টি শুরু হওয়ায় ঘোড়ার পায়ের আওয়াজও শোনা গেল না। কর্ডোবা নগর প্রাচীরের পাশে এসে মুসলিম বাহিনী সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলো। খোদার তরফ থেকে সাহায্য এলো। একজন মেষপালক তাদেরকে নগর প্রাচীরের একটি ভাঙ্গা অংশ দেখিয়ে দিল। মুসীন প্রাচীর সংলগ্ন ভাঙ্গা অংশে লাফিয়ে পড়লো। নিজের পাগড়ি সে ঝুলিয়ে দিল নিজের যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে।

এদিকে মুরসিয়ার শাসনকর্তা থিওদেমির আত্মরক্ষা করার এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করলেন। শহরে পুরুষরা কেউ ছিল না, কারণ যুদ্ধে অনেকে মারা গিয়েছিল, অবশিষ্ট পুরুষরাও পালিয়ে গিয়েছিল। থিওদেমির শুধু তার বালক ভৃত্যকে নিয়ে শহরে অবস্থান করছিলেন। তিনি শহরের মেয়েদেরকে একত্রিত করে তাদের যোদ্ধার পোশাকে সাজালেন। তাদের চুলগুলোকে সামনে এনে এমনভাবে চিবুকের পাশে স্থাপন করলেন যেন দেখে দাঁড়িওয়ালা সৈনিক বলে ভ্রম হয়। এবার ছদ্মবেশী সৈন্যদের দেখিয়ে তিনি মুসলিম সেনাপতিকে বললেন, 'ঐগুলো হলো আমার সৈন্য, ওদের দ্বারাই আমি নগর রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছিলাম। আসলে আমার সৈন্য বলতে কেউ নেই'। তার অপূর্ব বুদ্ধিমত্তা ও সাহসের পরিচয় পেয়ে মুসলিম সেনাপতি অত্যন্ত খুশি হলেন এবং থিওদেমিরকে পুনরায় মুরসিয়া প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন।

সেনাপতি মূসা তাঁর নিজ সন্তান আবদুল আজিজকে স্পেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। সেভিল স্পেনের রাজধানী নির্বাচিত হলো।

প্রকৃতপক্ষে এই সময় হতে ইউরোপে রেনেসাঁর সূত্রপাত হয়। শুধু স্পেনে নয় ফ্রান্স এবং ইউরোপের কেন্দ্রভূমিতে এই নব জাগরণের ঢেউ প্রবাহিত হয়।

নব্বোনের শাসনকর্তা আবদুর রহমান ফ্রান্সের বিরাট অংশ দখল করে নিলেন। তিনি ফরাসি সেনাপতি চার্লসের সঙ্গে এক চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী যুদ্ধে লিপ্ত হলেন।

www.pathagar.com

ইউরোপ খ্রিস্টানের থাকবে, না মুসলমানের হবে; ভাবী নটরডেম গীর্জা হবে না মসজিদ হবে– এই যুদ্ধে তাই মীমাংসিত হওয়ার কথা।
এই যুদ্ধ এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, ঐতিহাসিক গীবন স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, এই যুদ্ধে মুসলমানরা জয় লাভ করলে আরবের নৌবহর বিনা বাঁধায় টেমস নদীতে প্রবেশ করতো। অক্সফোর্ডের শিক্ষালয়গুলোতে বাইবেলের পরিবর্তে আজ কুরআনের ভাষ্য পড়ানো হতো। সেখানকার গীর্জাগুলো উদাত্তস্বরে ইসলামের মহিমা ঘোষণা করতো।
অত:পর হাকামের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবদুর রহমান [২য়] স্পেনের সুলতান নিযুক্ত হলেন। তিনি কিছুটা স্বস্তির সঙ্গে স্পেন শাসন করেন। তিনি কর্ডোবার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। তার সময়ে দেশ সুখ সমৃদ্ধিতে ভরে ওঠে।
আবদুর রহমানের মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র তৃতীয় আবদুর রহমান মাত্র একুশ বছর বয়সে স্পেনের সিংহাসনারোহণ করেন। ইতিমধ্যেই তৃতীয় আবদুর রহমানের বিচক্ষণতা এবং বুদ্ধিমত্তা স্পেনীয় জনগণকে মুগ্ধ করেছিল। সেই আবদুর রহমান সিংহাসনের অধিকারী হলে স্পেনের জনগণ তাঁকে বিপুল সমর্থন জানায়।
পূর্বপুরুষদের হারানো রাজ্য উদ্ধার করতে আবদুর রহমানের সুদীর্ঘ আঠারো বছর লাগলো। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই সুলতানদের বশ্যতা স্বীকার করলো। বহুদিনের গণ্ডগোল ও অরাজকতার পর স্পেনে আবার শান্তি সমৃদ্ধি ফিরে এলো। খলিফা বিখ্যাত য়াহুদি চিকিৎসক হাসাদাইকে সংকোর চিকিৎসার্থে পাঠালেন। হাসাদাই যেমন চিকিৎসক ছিলেন তেমনি ছিলেন একজন বিখ্যাত কূটনীতিবিদ। তিনি সংকোর খলিফাকে ১০টি দুর্গ ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। ৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর সত্তর বছর বয়সে আবদুর রহমান মারা যান। আবদুর রহমান মুসলিম স্পেনের শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। তিনি স্পেনকে ধক্ষংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। তাঁর শাসনামলে সমগ্র দেশ সুখ শান্তিতে ভরে ওঠে। প্রথম শ্রেণীর আশিটি নগর এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর তিনশো নগর তাঁর সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। তাঁর দেশের লোকসংখ্যা তিন কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বার্ষিক রাজস্ব পাওয়া যেতো তিরিশ কোটি ডলারেরও বেশি। আবদুর রহমান আয্ যোহরা প্রাসাদ নির্মাণ করেন।
হাকাম জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং নিজেও বিদগ্ধ পাঠক ছিলেন। তার সভায় বহু জ্ঞানী বিদ্বান ব্যক্তির আশ্রয় হয়েছিল। শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি কর্ডোবাতে সাতাশটি অবৈতনিক উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং কর্ডোবা বিশ্ববিদ্যালয়কে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রদান করেন। তার লাইব্রেরিতে চার লক্ষ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হয়েছিল।

www.pathagar.com

স্থাপত্য শিল্পে স্পেন

কর্ডোবার মসজিদ স্থাপত্যের এক অত্যুজ্জল নিদর্শন। ৭৮৪ সালে আবদুর রহমান এই মসজিদটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এর ক্ষেত্রফল ছিল ২৬,৫০০ বর্গগজ। দৈর্ঘ্য ১৪০ গজ, প্রস্থ ১৯৫ গজ। উত্তর দিকের প্রাচীরের উচ্চতা ৩০ ফুট এবং নদীর তীরের দিকে এর উচ্চতা ছিল ৭০ ফুট। মসজিদের ছাদের ভিতরের দিকে ছিল প্রায় এক ইঞ্চি পুরো সীসার পাত। মসজিদের স্তম্ভের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৪০০টি। মেঝে সাদা পাথরের তৈরি। খিলানের সম্মুখভাগ ছিল রক্তবর্ণ ইটের তৈরি।

মুসলিম স্পেনে শিক্ষা

মুসলিম স্পেনে শিক্ষা ছিল সার্বজনীন। কোন মুসলমান অশিক্ষিত থাকলে তা তার জন্যে অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার ছিল। প্রত্যেকটা মসজিদের সঙ্গেই ছিল বিদ্যালয় ও মক্তব। একমাত্র কর্ডোবাতে এরকম স্কুলের সংখ্যা ছিল ৮০০টি। ইয়াহুদি, খ্রিস্টান, মুসলিম সকলে একই সঙ্গে একই স্কুলে পড়তে পারতো। দ্বিতীয় পোপ সিলভারস্টার জারবার্ত এর শিক্ষালাভ ঘটেছিল কর্ডোবা বিশ্ববিদ্যালয়ে। নবম শতাব্দীতে কর্ডোবা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল এগার হাজার। এখানকার শিক্ষকদের অনেকেই ছিলেন ইয়াহুদি ও খ্রিস্টান। মুসলিমদের গৌরবের যুগে স্পেনে ছিল সত্তরটি সাধারণ গ্রন্থাগার। এছাড়াও প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের বাড়িতে সাধারণ গ্রন্থাগার ছিল। শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে কার কতগুলো মূল্যবান ও দুস্প্রাপ্য বই আছে তা নিয়ে প্রতিযোগিতা চলতো। আল মেরিয়ার উজীর ইবনে আব্বাসের পুস্তকালয়ে অসংখ্য পত্রপত্রিকা ছাড়াও চার লক্ষ বই ছিল। সুলতান হাকামের পুস্তক তালিকা পঞ্চাশ খণ্ডে বিভক্ত ছিল এবং তার প্রতিখণ্ডে পঞ্চাশ তা কাগজ ছিল। শোনা যায় জনৈক মুসলিম চিকিৎসককে সমরকাণ্ডে আমন্ত্রণ জানানো হলে তিনি সেখানে যেতে পারেননি। কারণ তার সমস্ত বই বহন করতে চারশো উটের প্রয়োজন ছিল। সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল এবং প্রত্যেকখানা পুস্তক সুদক্ষ নকলনবীশের নিপুণ হস্তে লিখিয়ে নিতে হতো, তখন মিশরের সুলতান মোস্তানসিরের লাইব্রেরিতে আশী হাজার, ত্রিপোলীর লাইব্রেরিতে দুই লক্ষ, স্পেনের খলিফা দ্বিতীয় হাকামের লাইব্রেরিতে ছয় লক্ষ ও কায়রোর ফাতেমিয়া খলিফাদের লাইব্রেরিতে দশ লক্ষ পুস্তক ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দিতে হালাকুর হস্তে যখন বাগদাদ নগর ধ্বংস হয় তখন, নিক্ষিপ্ত পুস্তকের কালিতে তাইগ্রিস নদীর বুক আচ্ছন্ন ও তার জলরাশি কালো হয়ে যায় আর এর চেয়ে বেশি পুস্তক বর্বর মঙ্গোলেরা অগ্নিতে দগ্ধ করে।

www.pathagar.com

আন্দালুসিয়ার [স্পেনের] বিজ্ঞানের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেই বলা যায় যে, তারা জ্ঞানার্জনে কত আগ্রহী ছিল। তারা একজন জ্ঞানী ও আরেকজন নিরক্ষর লোকের মধ্যে কে বেশি সম্মানের অধিকারী তা ভাল করে জানতো। বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষাকে এত গুরুত্ব ও সম্মান দেয়া হতো যে, যে লোক খোদা প্রদত্ত প্রতিভা না নিয়ে জন্মগ্রহণ করতো সে যাবতীয় উপায়ে তার প্রতিভা বিকাশের চেষ্টা করতো এবং জনগণের কাজে তার অজ্ঞতা গোপন করতো। কারণ একজন অজ্ঞ লোক সব সময়েই বিতৃষ্ণার বস্তু বলে প্রমাণিত হতো। এজন্যে জ্ঞানী লোকদের মধ্যে প্রায়ই শিক্ষামূলক প্রতিযোগিতা হতো। কে কত ভাল কবিতা বা সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে কিংবা কার লাইব্রেরিতে কতটি দুস্প্রাপ্য ও মূল্যবান পুঁথি সংগৃহীত হয়েছে এ নিয়ে প্রতিযোগিতা চলতো। তাঁর অসমাপ্ত চল্লিশ খণ্ড ক্যাটালগে বিভক্ত লাইব্রেরী নানা রকমের দুস্প্রাপ্য ও মূল্যবান পুস্তকে পরিপূর্ণ ছিল। তেরশ শতাব্দির প্রথম দিকেই প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ভাষায় শিক্ষাদান শুরু হয়। আবু রুশদ, আবু পাজা, ইবনেস তোফায়েল, ইবনে যোহর, কাবালা ও মেইমনিদ এর গ্রন্থসমূহ ইউরোপের বিভিন্ন শিক্ষালয়ে পড়ানো হতো। ফরাসি ও স্পেনীয় ভাষার ওপরেও আরবি ভাষার প্রভাব পড়ে। হাজার হাজার আরবি শব্দ এই ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে ভাষার লালিত্যে। আরবিতে যেমন 'ট' ও 'ড' শব্দ নেই, ফরাসি ও স্পেনীয় ভাষাতেও তেমনি 'T' তে 'D' তে পরিণত হয়েছে। এই দুই ভাষার অধিকাংশ শব্দই এসেছে আরবি থেকে। কর্ডোবার আল মুতাসফফীর কন্যা ওয়াদাল্লাহ ছিলেন একজন প্রথম সারির মহিলা কবি। ছন্দ প্রকরণে তার অসম্ভব ব্যুৎপত্তি ছিল। অলংকরণ শাস্ত্রেও তিনি ছিলেন সুনিপুণা। তাঁর প্রতিভা এত উজ্জ্বল ছিল যে, সারা বিশ্বে তিনি 'আরবের সফো' নামে পরিচিত। কর্ডোবার রাজপুত্র আহমদ এর মেয়ে আয়েশা ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ মহিলা বক্তা। সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাঁর বক্তৃতামালা কর্ডোবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হতো। তিনি ছাত্র ও সাধারণ শ্রোতাদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তাঁর বাড়িতে এক বিশাল ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ছিল। দার্শনিক লাবানা একজন স্পেনীয় মুসলিম রাজকন্যা ছিলেন। তিনি তাঁর যোগ্যতার বলে স্পেনীয় খলিফার ব্যক্তিগত সচিব হতে পেরেছিলেন।

জ্ঞান বিজ্ঞানে স্পেনের অবদান

জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে স্পেনীয় মুসলমানরা আশ্চর্যজনক উন্নতি সাধন করেন। তারাই ইউরোপে প্রথম মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সৌরজাগতিক গবেষণার জন্য জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ জাবির ইবনে আফলাহ ১১৯৪ সালে সেভিলের বিখ্যাত জিরাল্ডা স্তম্ভটি স্থাপন করেন। মুসলিম রাজত্বের অবসানে মূর্খ খ্রিস্টানরা এই স্ত

www.pathagar.com

ঘুটি গীর্জার ঘণ্টা দেয়ার জন্য ব্যবহার করত। রসায়নবিদ হিসাবে জাবিরের নাম অমর হয়ে রয়েছে। তিনি সোনা গলানোর জন্য Aqua regia এবং যক্ষ্মার দ্রাবক আবিষ্কার করেন। স্পেনীয় মুরোরাই প্রথম কামানের গোলা আবিষ্কার করেন। মুসলিম রসায়নবিদের আনুকূল্যেই সাবান, সিরাপ, জোলাপ ও জৈবরসায়নের উৎপত্তি হয়। কর্ডোবা এবং অন্যান্য শহরে বোটানি বা উদ্ভিদবিদ্যার ছাত্রদের জন্যে 'বোটানিক্যাল গার্ডেন' ছিল। প্রতিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যা শিক্ষা দেয়া হতো। মুসলিম চিকিৎসকরাই সর্বপ্রথম চিকিৎসা পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করেন এবং চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইবনে সীনার চিকিৎসা পদ্ধতি ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আয়ুর্বেদীয় শাস্ত্রের পাঠ্য ছিল। এসকল কলেজে অনেক খ্যাতনামা চিকিৎসক স্পেনে বসতি স্থাপন করেন। তাঁদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতায় ইউরোপের সর্বাপেক্ষা সুশিক্ষিত ও মানসিক শক্তি সম্পন্ন সমাজে শ্রেষ্ঠ মনীষীদের যুগ, যুগান্তরের অধ্যয়ন ও পরীক্ষালব্ধ বিপুল জ্ঞান ভাণ্ডারের সমৃদ্ধি সাধিত হয়। তেহরান ও কায়রোর কলেজে গৃহীত হবার পূর্বেই কর্ডোবার ছাত্ররা ইবনুল হায়ছাম ও আলী ইবনে ঈসার গ্রন্থাবলী ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। খলিফাদের লাইব্রেরিতে প্রত্যেক প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পুস্তকই পাওয়া যেতো। জানা যায় শুধু কর্ডোবাতেই পঞ্চাশটি হাসপাতাল ছিল।

সে সময় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নগরী : কর্ডোবা

কর্ডোবার সুরম্য অট্টালিকা, বিলাসবহুল বাগান, পণ্যে ভরা বাজার সব কিছুই আধুনিক সভ্য জগতের হিংসার বস্তু। আবদুর রহমানের স্থাপিত রাজধানী কর্ডোবা নগরী ইউরোপের মুকুটে পরিণত হয়। এর বিশালত্ব ও সৌন্দর্যের সুনাম এর শত শত মার্বেল নির্মিত বাড়িঘর, এর তিনটি উপশহর, সূর্যের নিচে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী জনতার ভীড় সবকিছুই পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে গিয়েছিল। উমাইয়ারা কর্ডোবাকে বানিয়েছিল পাশ্চাত্যের সব বিজ্ঞান ও কলার কেন্দ্রস্থল। স্ট্যানলি লেনপুলের ভাষায়, তার অধ্যাপক এবং শিক্ষকরা একে ইউরোপীয় কৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে। ইউরোপের সকল অংশের ছাত্ররা তার শিক্ষকদের অধীনে পড়তে আসতো।

তৃতীয় আবদুর রহমানের সময়ে কর্ডোবার লোকসংখ্যা ৫ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। নগরটি একই সঙ্গে ছিল বুরোক্র্যাটিক, সংস্কৃতমনা, শিক্ষিত এবং বাণিজ্যলক্ষী। কর্ডোবা নগরী ছিল দৈর্ঘ্যে দশ মাইল, পরিধিতে সাড়ে সাত মাইল। উত্তর দক্ষিণে এটা ছিল দুই মাইল বিস্তৃত। অন্যান্য মতে শহরতলীসহ কর্ডোবার আয়তন ছিল ৫১ মাইল। রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল দুই বর্গমাইল জায়গা জুড়ে।

www.pathagar.com

সমস্ত শহরকে ৫টি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রত্যেক অংশ সুউচ্চ দেয়াল ও স্তম্ভ দিয়ে ঘেরা ছিল। সাতটি তোরণ দিয়ে বিভিন্ন অংশে যাতায়াত করা যেত। এ পাঁচটি পাড়ার একটিতে বাস করতো ইয়াহুদিরা। অন্যটিতে বাস করত খ্রিস্টানরা এবং বাকি তিনটিতে বাস করতো মুসলমানেরা। কর্ডোবার আশেপাশে ২১টি শহরতলী ছিল। এসব শহরতলীতে ন্যূনাধিক পাঁচ লক্ষ লোক বাস করতো। এসব শহরে ছিল বাজার, মসজিদ, হাসপাতাল ও শিক্ষাকেন্দ্র। আটটি শহর এবং তিন হাজারেরও বেশি ছোট ছোট শহর কর্ডোবার অধীনে ছিল। প্রতি বছর রাজস্ব পাওয়া যেত আঠারো কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা। শহরে তিনটি রাস্তার ধারে রাত্রে সরকারি বাতি জ্বলতো। অথচ এর সাতশো বছর পরেও লন্ডনের রাজপথে কোন বাতির চিহ্ন ছিল না। রাজকর্মচারীদের প্রাসাদ ছাড়াও সাধারণ লোকদেরই ১,১৩,০০০ প্রসাদ, ৩,৮০০ মসজিদ, ৯০০ স্নানাগার ও ৮৪,০০০ দোকান ছিল। আধুনিক কোন ইউরোপীয় শহরও এত সমৃদ্ধশালী কিনা সন্দেহ। কর্ডোবার বিজ্ঞানীরাই প্রথম জলঘড়ি আবিষ্কার করেন। পানির বিন্দু পড়ার সাথে সাথে কিভাবে ঘড়ির কাটা আবর্তিত হতো তা আজো আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়ের ব্যাপার। টেলিগ্রাম, কম্পাস, ৩২ ফুট ওপরে পানি তোলার উপযোগী নলকূপ ইত্যাদি তৈরি করেন এই কর্ডোবার বৈজ্ঞানিকরাই।

স্পেনের করুণ পতন

৭১২ সালে এক সেনাপতি মূসা যে রাজ্যের পত্তন করেন ৭৮০ বছর পরে ১৪৯২ সালে ঐ নামের আরেক সেনাপতির হাতে একই রাজ্যের পতন ঘটে। আর সেই সঙ্গেই স্পেনের মুসলমানদের ভাগ্যে নেমে আসে বিড়ম্বনা, দুর্ভোগ ও বিপর্যয়। দীর্ঘ দু'মাস দুর্গের মধ্যে আবদ্ধ থাকার পরও তুরস্ক ও মিসরের সুলতানের কাছ থেকে যখন কোন সাহায্য এল না তখন ১৪৯২ সালে ৩রা জানুয়ারি তারিখে বু-আবদিল ফার্দিনান্দকে নগর ছেড়ে দিলেন। বু-আবদিল সকণ্ঠে গাইলেন করুণ সঙ্গীত :

'বিদায় হে মোর সাধের গ্রানাডা, হিস্পানিয়ার পুষ্পবন
বু-আবদিল চলিল আজি লভিবারে চির নির্বাসন'।

তাঁর জননী আয়েশা পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি তাঁকে ভর্ৎসনা করে বললেন, 'পুরুষের মত যা রক্ষা করতে পারোনি, মেয়ের মতো তার জন্য ক্রন্দন করা তোমার মতো রাজারই উপযুক্ত কাজ বটে।' বিদায়ের দিনে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে বু-আবদিল জন্মভূমির জন্য কেঁদেছিলেন সে জায়গাটি আজও অল আলতিমো সমপিরো দেল মুর, বা মুরের শেষ দীর্ঘশ্বাস নামে পরিচিত। মুসলিমদেরকে ধর্মত্যাগ করার প্রথম কাজ হিসেবে ধরপাকড় শুরু হলো। খ্রিস্টানদের প্রতি

www.pathagar.com

দুর্ব্যবহারের অভিযোগে কয়েকজন মুসলিমকে গ্রেফতার করা হলো। ফার্দিনান্দ মুসলিম জনগণের ওপরে অত্যাচারের স্টিমরোলার চালান। তিনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মুসলমানদেরকে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ কিংবা মৃত্যু গ্রহণ এই মর্মে আদেশ জারি করলেন। এর ফলে লক্ষ লক্ষ মুসলমান ঘরবাড়ি, বিষয় সম্পত্তি সব ত্যাগ করে আল বাশারতের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। খ্রিস্টানরা সেখানে আক্রমণ করে মুসলিম আবালবৃদ্ধবনিতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। মসজিদ পরিণত হয় মানুষের কসাইখানায়, ঘরবাড়ি পরিণত হয় নরহত্যা পরীক্ষাগারে। এত নির্যাতনের মুখেও যারা আত্মগোপন করেছিল তারা কোনদিনই তাঁদের মহান দীক্ষা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'– এই অমোঘ মন্ত্র থেকে বিচ্যুত হয়নি। মুসলিম মেয়েদের কোল থেকে শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় খ্রিস্টান মিশনারিতে। খ্রিস্টান ধর্মমত ছাড়া বিবাহ নিষিদ্ধ হয়। অবশ্য মুসলিমরা নিজ বাড়িতে এসে পুনরায় মুসলিম মতে বিয়ে করতো। কিন্তু খ্রিস্টানরা এটা জানতে পারলে তাঁদেরকে ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে জীবন্ত দগ্ধ করতো। পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ, এজন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ও গোসল করা নিষিদ্ধ করা হলো। আরবি ভাষায় কুরআন নাজিল হয়েছে বলে তা বাতিল করা হলো; অথচ স্পেনে তখনো ভাষা সু-সংগঠিত হয়নি। বর্তমান স্প্যানিস ভাষাও আরবি কর্তৃক প্রভাবিত। মুসলিমরা বিশ্বাস করে 'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানার্জন' এবং 'জ্ঞানার্জনের জন্য প্রয়োজনে চীনে গমন' করতে হবে- এই জন্য স্পেনে জ্ঞানার্জনের সব পথ বন্ধ করা হলো। মাদ্রাসা, মক্তব, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, পাঠাগার, গ্রন্থাগার সব পুড়িয়ে দেয়া হলো। মানমন্দির, গবেষণাগার ও বিজ্ঞানাগার লুট হলো। পরবর্তীতে পাশ্চাত্য ইতিহাসবিদরা পর্যন্ত আর্তনাদ করে বলেছেন, 'হে খ্রিস্টান, এই তোদের মানবিক মূল্যবোধ, এই তোদের পরধর্ম সহিষ্ণুতা! বিপথগামী স্পেনীয়রা জানতো না যে তারা কি করছে। তারা বুঝতে পারেনি যে, তারা তাদের স্বর্ণপ্রসবিনী রাজহংসীকে হত্যা করছে। বহু শতাব্দী ধরে স্পেন সভ্যতার কেন্দ্র শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষা দীক্ষার পীঠস্থান ছিল। ইউরোপের কোন দেশই মুরদের এই সুসভ্য রাজ্যে সমান হতে পারেনি। মুরেরা একদিন যে ক্ষেতে ইক্ষু জলপাই ও হরিৎ শস্যের জন্ম দিত তা আজ অনুর্বর ও বিরান অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। যেখানে জ্ঞান ও বুদ্ধির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল আজ সেখানে অজ্ঞ ও নির্বোধের উপস্থিতি।' ১৬০৯ সালে মরিসকোদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে স্পেনের শিল্পের ক্ষতি হয়, দ্রব্যমূল্যও বেড়ে যায়। মুসলিম বহিষ্কারের জন্যে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে স্পেনের রাজস্ব মাত্র তিনলক্ষ ডলারে নেমে আসে, অথচ সাতশো বছর আগে তৃতীয় আবদুর

www.pathagar.com

রহমানের রাজস্বের পরিমাণ ছিল এর চেয়ে হাজার গুণ বেশি। ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে শুধু কাস্তাইলের লোকসংখ্যা ছিল ৬,৭০০,০০০ অথচ ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র স্পেনের লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ৬,০০০,০০০। ১৭৮৮ সালে আইবেরিয়ায় ১৫০০টি পরিত্যাক্ত নগর ছিল। ফসল উৎপাদনের অনুপযোগী বলে ১৫৯১ সালে কর্ডোবার চতুর্দিকস্থ এলাকা বিক্রি করে দেয়া হয়। অথচ মুর শাসনের সময়ে এসব এলাকাই সুস্বাদু ফল ও শস্যের ফলনক্ষেত্র ছিল।

এই বিয়োগান্ত ঘটনাসমূহ ইতিহাসের সকল পাঠকেরই জানা। ইসলামের সুমহান দাওয়াতের চাইতে দুনিয়া বেশি ব্যস্ততা,পারস্পারিক হানাহানী ইত্যাকার কারণে মুসলিমদের পরাজয় অনিবার্য হয়ে উঠে। পরবর্তীতে খ্রিস্টানরা কর্ডোবার মসজিদগুলিকে গীর্জায় পরিণত করে; রাজপ্রাসাদগুলিকে ধুলোর সাথে মিশিয়ে দেয়। মানমন্দিরগুলিকে গীর্জার ঘণ্টা ঘর হিসাবে ব্যবহার করে; লাইব্রেরির লক্ষ লক্ষ বই পুস্তকে আগুন ধরিয়ে দেয়। মুসলিম ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ হেতু ওরা মুসলিম কীর্তির সব কিছুই ধক্ষংস করে। কিন্তু এতে করে স্পেন নিজেও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। একসময় যে স্পেন ছিল সভ্যতার তীর্থ মুসলিম বিতারণের পরিণামে আজ কর্ডোবা অজানা, অখ্যাত ও অনুন্নত একটি শহর মাত্র। তাই দেড় হাজার বছরের মুসলিম ইতিহাস পর্যালোচনা করে এটি দৃঢ়তার সাথে বলা যায়; আবার জেগে উঠতে চাইলে সেই‘ ইকরা’তেই ফিরে যেতে হবে, ধারণ করতে হবে কোরআনের প্রথম বাণী ‘পড়’। #

(Stanley Lanepool, The Moors in Spain.)

www.pathagar.com

বিচারপতি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সা]

মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম

কোন সরকার ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য কতগুলো নির্দিষ্ট বিভাগের একযোগে কাজ করা অত্যাবশ্যক। নচেৎ তা ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এর মধ্যে বিচার বিভাগ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। প্রতিটি দেশের বিচার বিভাগই আইনের সঠিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের নির্দেশ করে থাকে। এ আইনের আওতায় রাষ্ট্রের পক্ষে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, সংহতি, অগ্রগতি ও আখিরাতের মুক্তি নির্ভর করে এই আইনের বাস্তবায়নের ওপর। কোন সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত সে সমাজে সুবিচার নিশ্চিত করা। একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার যতগুলো দিক ও বিভাগ প্রয়োজন সে সবগুলো দিক ও বিভাগ দিয়েই সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের জন্য দ্বীন ইসলাম নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ [সা] ছিলেন সে সমস্ত বিভাগের একজন দক্ষ মহামানব। একজন পূর্ণাঙ্গ মহামানব হিসাবে তিনি যেমন একজন ন্যায়পরায়ণ প্রশাসক, তেমনি তিনি ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ বিচারপতি। মদীনা সনদের আলোকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সা] মাদীনা রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করেন। তিনি মসজিদে নববীতে বসে রাষ্ট্রীয় অন্যান্য কাজের পাশাপাশি বিচারকার্যও পরিচালনা করতেন। দক্ষতার সাথে তিনি যেমন প্রশাসন পরিচালনা করেছেন, তেমনি তিনি ন্যায় ও ইনসাফের সাথে বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করেছেন।

তিনি তাঁর জীবদ্দশায় আল্লাহর বিধান অনুয়ায়ী অনেক বিচার-ফায়সালা করেছেন। পক্ষপাতিত্ব, প্রভাবিত, আবেগতাড়িত হয়ে কোন বিচার কার্য পরিচালনা করেছেন এমন একটি ছোট ঘটনাও তার বিচারপতি জীবনের ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। তিনি ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করতে গিয়ে কোনদিন নিজের আহাল, আত্মীয়-পরিজন ও প্রখ্যাত কোন সাহাবীর পক্ষও অবলম্বন করেননি। তিনি বলতেন, 'যদি মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমাও চুরি করে, তবে

www.pathagar.com

আমি তার বেলায়ও হাত কাটার নির্দেশ দিবো।' এ জন্য তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে একজন শ্রেষ্ঠতর মহামানবের সাথে সাথে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বিচারপতিও বটে। তাঁর এ ন্যায়বিচারের কারণেই সান'আ থেকে হাজরা মাউত পর্যন্ত সুন্দরী তনয়া, মূল্যবান অলঙ্কার পরিহিতা, একাকিনী দিনে-রাতে পথ চলেছেন, কেউ তাকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করবে তো দূরের কথা, তার দিকে চোখ তুলে তাকাবারও সাহস করতো না। তাঁর জীবদ্দশায় কয়টি বিচার তাঁর আদালতে এসেছে জানা না থাকলেও অবশ্যই তা নগন্যই হবে। কারণ, সমাজ ও সভ্যতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, অপরাধ প্রবণতা একেবারেই কমে গিয়েছিল। মানুষ অপরাধ করলে বিবেকের অবিরত কষাঘাত সহ্য করতে না পেরে নিজের মামলা নিজেই দায়ের করতো।

প্রসিদ্ধ সেই মহিলার ঘটনা আমরা জানি যে যিনা করে রাসূলুল্লাহ [সা]-এর বিচারালয়ে নিজের কৃত অপরাধের বিচার প্রার্থনা করলেন। বিচারপতি রাসূলুল্লাহ [সা] প্রথমত সন্তান প্রসব, দ্বিতীয়ত আড়াই বৎসর দুগ্ধ পান করাবার নির্দেশ দিলেন। মহিলা কেঁদে কেঁদে এই ভয়ে চলে গেলেন যে, এ সময়ের মধ্যে যদি আমি বিনাবিচারে মৃত্যুবরণ করি তবে আহকামুল হাকিমিন মহান আল্লাহর বিচারের কাঠগড়ায় কি জবাব দেবো। এই ছিল একজন শ্রেষ্ঠ বিচারপতির ন্যায়বিচারের সামজিক প্রভাব। রাসূলুল্লাহ [সা] কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি সে আলোকে বিচারক নিয়োগ দান, আদালতের মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণ, বিচারকদের জন্য উচ্চ বেতন নির্ধারণ, বিচারকদের আদল ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহ প্রদান, বিচার ব্যবস্থার সুদৃঢ় ভিত্তি অর্জন, বিচারের বিবরণ শুনানী ও রায়দানের সুষ্ঠু নীতিমালা প্রতিষ্ঠাকরণ, কেন্দ্রে রাসূল [সা] স্বয়ং কাজীর দায়িত্ব পালন, প্রদেশে প্রাদেশিক বিচারপতি নিয়োগ করণ, আইনের চোখে সকলেই সমান, বিচারালয় হিসেবে মসজিদকে ব্যবহার, ন্যায়বিচার লাভের পথের যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা অপসারণ, পক্ষপাতহীন বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং ধনী-দরিদ্র, নিঃস্ব ও ধনাঢ্যের মধ্যে পূর্ণ সমতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ [সা] মসজিদে নববীতে বসে রাষ্ট্রীয় অন্যান্য কাজের পাশাপাশি বিচারকার্যও পরিচালনা করতেন। জনগণের মধ্যে একবিন্দু বৈষম্যমূলক আচরণ প্রদর্শন না করার জন্য দায়িত্বশীল কর্মচারীদের প্রতি তিনি কঠোর নির্দেশ দিয়ে রাখতেন। তিনি নিজে কোন তোষামোদ ও তারীফ-প্রশংসা পছন্দ করতেন না। কুরআনের বিধান 'কিসাস' কার্যকরী করেন। জনগণকে সমালোচনার অবাধ অধিকার দানে একজন সাধারণ নাগরিকও খলীফার সমালোচনা করতে বিন্দুমাত্র

www.pathagar.com

পরোয়া করতেন না। কেবল পুরুষ নাগরিকগণই নয়, নারীসমাজও এক্ষেত্রে আগ্রণী ছিল। অমুসলিমদের জন্য সতন্ত্র ব্যবস্থা চালু ও ইনসাফভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।

রাসূলুল্লাহ [সা]-এর ন্যায়বিচারের অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে– যেমন বিভিন্ন প্রদেশ ও জেলার কাজীগণ ভুল সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকলে রাসূলুল্লাহ [সা]-এর দরবারে আপীল করার এবং এভাবে ভুল সংশোধনের ধারা চালু করেন। ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসা বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর ও বিচারকদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ তিনি জনগণ থেকে শুনতেন এবং সাথে সাথে তা ব্যবস্থাও নিতেন। বিচারের নামে কেউ অবিচার বা শাসনের নামে কেউ অপশাসন করেছেন প্রমাণিত হলে তিনি কঠোরভাবে তার বিচার করতেন। রাসূলুল্লাহ [সা] বিচার পদ্ধতির উন্নতি সাধনে বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনে সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে বিচারককে সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাগিদ দেন।

মুসনাদে আহমাদ ইবন হাম্বল গ্রন্থে একটি হাদীসে এসেছে, 'প্রমাণ চাওয়া ছাড়াই যদি বাদীর বক্তব্য শুনেই বিচারকার্য সম্পন্ন করা হয়, তাহলে লোকজনের জানমাল নিরাপদ থাকবে না। বিনা বিচারে আটক নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। মুলত: ইসলামে উপযুক্ত বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত ছাড়া কোন সরকার কোন নাগরিককে শাস্তি দিতে পারে না, আর না পারে তাকে বন্দী করে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করতে। রাসূলুল্লাহ [সা] তদন্ত ও সাক্ষ্য সাপেক্ষে বিচারের ওপর জোর দিতেন। প্রাচীনকাল থেকে আরবে এ উদ্দেশ্যে গণক-জ্যোতিষী, ফার, অদৃশ্য শক্তি প্রভৃতির সাহায্যে অপরাধী সাব্যস্তের যে অবৈজ্ঞানিক পন্থা চালু ছিল, রাসূলুল্লাহ [সা] সেগুলোকে তো বটেই, বিচারকের নিজের ব্যক্তিগত জানাশোনার ভিত্তিতে বিচারকেও অকার্যকর ঘোষণা করেন।

কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ, 'তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে তা করবে।' আরো ইরশাদ হচ্ছে, 'কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, তোমরা সুবিচার করবে; এটি তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।' [আল-কুরআন, ৫: ৮]। প্রভাবশালী ও দূর্বলের বিচার ফয়সালা প্রসঙ্গে বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, একবার মাখজুমী গোত্রের এক কুরাইশী মহিলা চুরি করে ধরা পড়ে। রাসূলুল্লাহ [সা] তার হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। নির্দেশ শুনে লোকজন খুব পেরেশান হয়ে পড়লো। কারণ সেই মহিলা ছিল সম্ভ্রান্ত গোত্রের। তারা বলাবলি করতে লাগল, উসামা ইবন যায়িদ ছাড়া আর কে আছে, যাকে আল্লাহর রাসূল [সা] অত্যাধিক ভালবাসেন। তারা উসামা [রা]-কে সুপারিশের জন্য রাসূলুল্লাহ

www.pathagar.com

[সা]-এর কাছে পাঠালেন। যখন তিনি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ [সা]-এর সাথে কথা বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ [সা] বললেন, 'হে উসামা! তুমি কি আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা না করার সুপারিশ করতে এসেছো?' তখন উসামা ইবন যায়িদ ভয় পেয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে মাফ করে দিন। আমার ভুল হয়েছে।' অত:পর রাসূলুল্লাহ [সা] মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন। প্রথমে আল্লাহর হামদ ও সানা পেশের পর বললেন, 'হে লোক সকল! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকজন এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী লোক চুরি করতো তখন তারা তাকে ছেড়ে দিতো এবং দূর্বল লোক চুরি করলে তাকে শাস্তি দিতো। ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আজ যদি মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমাও চুরি করতো তবে আমি তার বেলায়ও হাত কাটার নির্দেশ দিতাম।'

মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাকে বর্ণিত হয়েছে, 'রাসূলুল্লাহ [সা]-এর নিকট এক ক্রীতদাসকে হাজির করা হলো, যে চুরি করেছিলো। তাকে চার বার রাসূলুল্লাহ [সা]-এর কাছে আনা হলে চার বারই তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। পঞ্চমবার তাকে হাজির করা হলে তখন রাসূলুল্লাহ [সা] হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। পরে ষষ্ঠ বার হাজির করা হলে তার একটি পা কেটে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। সপ্তম বার তার অপর হাত কাটার আদেশ দিলেন। অষ্টম বার তার দ্বিতীয় পা'টি কেটে দেয়ার নির্দেশ দেন।'

রাসূলুল্লাহ [সা] আদালতের উল্লেখিত দু'টি বিচার এখানে উল্লেখ করার অর্থ হলো তাঁর বিচার ব্যবস্থায় সমাজের প্রভাবশালী বা দূর্বল কোনটিই প্রভাব ফেলতে পারতো না। যা ন্যায়সঙ্গত, যা সঠিক তাই সেখানে বাস্তবায়িত হতো। কিন্তু আজ আমাদের বিচার ব্যবস্থায় কি পরিলক্ষিত হয়? সবলের জয়ধ্বনি আর দূর্বলের মূর্ধাধ্বনি। নিজ দলের দন্ডপ্রাপ্তদের ক্ষমা করার নজিরও দেখা যায়। কিন্তু আল্লাহর দরবার থেকে কাকে কে ছাড়িয়ে আনবে?

বাকপটুতার দ্বারা রায় নিজের পক্ষে নেয়া মানে আগুনের টুকরা নেয়া। তাই বাকপটুতা দিয়ে বিচারককে প্রভাবিত করে নিজের পক্ষে বিচারের রায় টেনে নেয়ার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন রাসূলুল্লাহ [সা]। এভাবে প্রভাবিত হয়ে বিচারক যদি কারো পক্ষে রায় দিয়েও দেন, তা হলে তা গ্রহণ করা নিজের জন্য অগ্নিপিণ্ড গ্রহণ তুল্য হবে বলে তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন। বুখারীর এক বর্ণনায় এসেছে, 'যাকে আমি [ভুল বুঝে] মুসলমানের সম্পদের মালিক বানিয়ে দেবো, তা আগুনের টুকরা মাত্র। ইচ্ছে করলে সে নিতে পারে অথবা ত্যাগ করতে পারে।'

www.pathagar.com

মুয়াত্তা, বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, নবী [সা] বলেছেন, 'আমি তো একজন মানুষ। দু'জন ঝগড়াকারী এসে আমার কাছে অভিযোগ করলে, যে অপেক্ষাকৃত বেশী বাকপটু আমি তার দিকে রায় দিতে পারি। এই মনে করে যে, সে সত্য বলেছে। সাবধান! তোমাদের কেউ যেন এরূপ না করে। এরূপ করলে এবং তার পক্ষে রায় দিলে, সে যেন আগুনের টুকরো নিয়ে গেলো।' তিনি ওহীর নির্দেশনা অনুসারে বিচার করতেন। দলীল-প্রমাণ, কসম, সাক্ষীদের সাক্ষ্য, লিখিত দস্তাবেজ, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে ঘটনার প্রামাণ্যতা নির্ধারণ, প্রভৃতি মাধ্যম তিনি ব্যবহার করতেন। বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষের বক্তব্য তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনে বিচার করতেন ও রায় দিতেন।

আবু দাউদে আলী [রা] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ [সা] আমাকে ইয়ামানের কাজী [বিচারক] নিযুক্ত করে পাঠানোর প্রাক্কালে আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে পাঠাচ্ছেন অথচ আমার বয়স কম। বিচার ফায়সালা সম্পর্কে আমার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা বা যোগ্যতা নেই। তখন রাসূলুল্লাহ [সা] বললেন, 'আল্লাহ অচিরেই তোমার অন্তরে হিদায়াতের নূর সৃষ্টি করে দিবেন এবং তোমার জবান সুদৃঢ় রাখবেন। যখন বাদী-বিবাদী তোমার সামনে এসে উপস্থিত হবে তখন একজনের বক্তব্য শুনেই রায় দিবে না বরং দু'জনের বক্তব্য শুনবে। এতে ফায়সালার দিগন্ত তোমার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।' আলী [রা] বলেন, এর পর থেকে আমি কখনো বিচার নিষ্পত্তির ব্যাপারে দ্বিধা-সংশয়ে পতিত হইনি।

রাসূলুল্লাহ [সা] ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, বাদীকে প্রমাণ উপস্থাপিত করতে হবে। যদি সে তাতে সক্ষম না হয় তাহলে বিবাদীকে তার দাবি নাকচ করার জন্য শপথ করে তা অস্বীকার করতে হবে। তাই রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন, 'প্রমাণ উপস্থাপনের দায়িত্ব বাদীর, আর যে তা অস্বীকার করে তাকে শপথ করতে হবে।' [বুখারী ও মুসলিম]। হযরত হামযা [রা]-এর কন্যার লালন পালনের ব্যাপারে হযরত আলী [রা], হযরত জাফর [রা] ও হযরত যায়েদ [রা]-এর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ [সা]-এর নিকট পেশ করা হলো। তিনি তিন জনেরই দাবী এবং দাবীর সপক্ষে যুক্তিসমূহ শুনলেন। অত:পর তিনি এই বলে জাফরের পক্ষে রায় দিলেন যে, 'খালা মায়ের সমতুল্য।' [আকজিয়াতু রাসূলিল্লাহ, পৃ. ৩৯৪] আরদ বিন যাম'আ ও সা'দ [রা]-এর মধ্যে বংশ পরিচয় প্রমাণের এক মোকদ্দমা পেশ করা হলে রাসূলুল্লাহ [সা] 'বিছানা যার সন্তান তার, ব্যভিচারীর শাস্তি পাথর' এই বলে আরদ বিন যাম'আর পক্ষে রায় দেন। [যাদুল মা'আদ, ৪খ, পৃ. ১১৩]

www.pathagar.com

একবার হযরত যোবায়ের [রা] এবং এক আনসারীর মধ্যে পানি নিয়ে বিবাদের সূত্রপাত হয়। রাসূলুল্লাহ [সা] তার মিমাংসা করে দেন। [বুখারী ও মুসলিম] হযরত বারা'আ ইবন আযিব [রা] ও জনৈক আনসারীর মধ্যে চারণভূমি নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। রাসূলুল্লাহ [সা] তাতে এভাবে ফায়সালা করেন যে, ক্ষেতের মালিকের দায়িত্ব হলো সে দিনের বেলা তার ফসলের সংরক্ষণ করবে। আর পশুর মালিকের দায়িত্ব সে রাতের বেলা তার পশু বেঁধে রাখবে [আদাবুল কাযী, ১ খ, পৃ. ১৩০]।

রাসূলুল্লাহ [সা] পদপ্রার্থী বা মর্যাদালোভী ব্যক্তিদেরকে গভর্নর ও কাজী পদে নিয়োগ দিতেন না। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, তিনি বিচারকদের বেতন-ভাতাও নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে মক্কায় কাজী হযরত আত্তাব ইবন উসায়দের নাম নজীর হিসাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তিনি তার জন্য তিন দিরহাম বেতন ধার্য করেছিলেন। বিচারক হিসেবে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে, তিনি কেবল দন্ডের ভয়ে আইন মানার চাইতে মানুষের মনে আল্লাহ্ ভীতি ও পরকালে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহিতার ধারণাকে তাঁর অনুসারীদের মনে এমনি বদ্ধমূল করে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন, যাতে করে একজন মুসলমানের বিবেকই তার অন্তরের অন্ত:স্থল থেকে তাকে দায়িত্বশীল ও সচেতন করে তোলে।

বর্তমান প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় আইন কাঠামোয় অস্বচ্ছতা, আইনের সীমাবদ্ধতা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, বিচার প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা, রাজনৈতিক প্রভাব এবং বিচার বিভাগের ওপর নির্বাহী বিভাগের কর্তৃত্বসহ অসংখ্য জঞ্জাল আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। ফলে আজ ইনসাফ ও ন্যায়বিচার দারুণভাবে উপেক্ষিত। অনেক ক্ষেত্রে জনগণ ন্যায়বিচারের পরিবর্তে জুলুমের শিকার এবং বঞ্চিত হচ্ছে। হত্যার অপরাধীরাও খালাস পেয়ে যায় সহজেই; আবার নিরপরাধ ব্যক্তি বছরের পর বছর কারান্তরীণ হয়ে নির্যাতিত হয়। বিশেষ করে ক্ষমতাসীনদের মনমর্জি ও হুকুম তামিল করতে গিয়ে ন্যায়বিচার আদালতের কঠিন দেয়ালে মাথা ঠুকে নিজেকে রক্তাক্ত করে। ন্যায়বিচারের করুণ আর্তনাদ ও গগণ বিদারী কান্না আমাদের বর্তমান বিচারপতিদের হৃদয়কে ক্ষণিকের জন্যও আহত করে না। কত নিরাপরাধ নিরীহ বণী আদম ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়ে চার দেয়ালের ভেতর থেকে পৃথিবীর আলো বাতাস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তার কি কোন ইয়ত্তা আছে? মানবতা বা মানবিক মূল্যবোধ তো আজ গো-বেচারা, মনে হয় বয়সের ভারে নূজ, পাইক-পেয়াদাদের মতো বড় বড় লেজার-বুক নিয়ে এ অফিস থেকে ও অফিসে ঘুরতে ঘুরতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। কে তার কথা শোনে। মানবতার রক্ষক

www.pathagar.com

বিচারপতিরাই আজ মানবতাকে দূর কোন মহাসাগরের কালা পানির দেশে নির্বাসনে পাঠিয়েছে।

আদালতকে বলা হয় মানুষের ন্যায়বিচারের শেষ আশ্রয়স্থল। মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণের বিশেষ স্থান এটি। আশাহত মানুষগুলো এ দ্বার থেকে ও দ্বার শেষাবধি এক বুক আশা নিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ দাড়িপাল্লার এ অফিসটির দ্বারস্থ হয়। কিন্তু এখানে এসে দেখা যায় মানবতার সাথে কি পরিমাণ অসদাচরণ করা হয়। আশার কিছু তো পাওয়াই ভার বরং উল্টো তাকে কিছু প্রমাদ গুণতে হয়। এ অফিসের হর্তাকর্তারা যদি অন্যদের মতোই বিচার-ফায়সালা করেন তবে মানুষ কোথায় যাবে?

একবার একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত কার্টুনে দেখা যায়, যার মর্মার্থ ছিল, 'এক ভিক্ষুক কিছু টাকা ভিক্ষা করে মাথায় চাপড়াচ্ছে আর বলছে, আমি এখন এই টাকা কোথায় রাখবো, ঘরে রাখলে চোরে নিবে, মাটির নিচে পুঁতে রাখলে উঁই পোকা খাবে, ব্যাংকে রাখলে সরকার খাবে।' বর্তমান বিচার ব্যবস্থাও তো তা-ই মনে হয়। মানুষ কোথায় যাবে? অথচ ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর দেশের বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক হয়েছে। সমাজপতি, পুলিশ ও সর্বশেষ আদালত সবই একই রোগে আক্রান্ত। ন্যায়-অন্যায়, মানবিক মূল্যবোধ, মানবাধিকার কোন কিছুই সেখানে পরখ করা হয় না।

এজন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সম্মানিত বিচারপতিগণ যদি সমস্ত বিচারপতিদের বিচারপতি আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীনের সামনে একদিন দাঁড়াতে হবে এ বিশ্বাস পোষণ করেন, তবে তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ্ [সা]-এর বিচার ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত। তাতে একদিকে নিজেদের মধ্যে যেমন ন্যায়-ইনসাফ ও নিরপেক্ষতাকে স্থান দিতে পারবেন অন্যদিকে নিজেদের মধ্যে প্রশান্তি নেমে আসবে, উপকৃত হবে বিশ্ব মানবতা।

হাশরের দিনের কথা একটু স্বরণ করুন, যখন ক্ষমতার সর্বময় দন্ড হাতে নিয়ে বিচাপতির আসনে আসীন হবেন আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন, তখন দুনিয়ার বিচারপতিদের কি অবস্থা হবে? যারা রাসূলুল্লাহ্ [সা] অনুসৃত পন্থায় বিচার-ফয়সালা করেছেন তাদের জন্য কোন চিন্তা থাকবে না। ন্যায়বিচারের প্রতিদান এবং অন্যায় বিচারের মন্দ পরিণাম প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ [সা] বলেছেন, 'বিচারক তিন প্রকার। এক প্রকার বিচারক জান্নাতী হবে। আর দুই প্রকার বিচারক জাহান্নামী হবে। জান্নাতী বিচারক হচ্ছে ঐ ব্যাক্তি যে হক [সত্য] জেনে সে মুতাবিক ফায়সালা করেছে। যে ব্যাক্তি হক জানা সত্ত্বেও আদেশ

www.pathagar.com

দানের ক্ষেত্রে অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করে সে হবে জাহান্নামী। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞতা অবস্থায় বিচারকার্য সম্পাদন করে সেও জাহান্নামী হবে।

রাসূলুল্লাহ [সা]-এর অনুসৃত নীতি ও বিচার ফয়সালা ছাড়া মানব সমাজে কখনো ন্যায়, ইনসাফ ও আদল প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। সূরা আর রহমানের ৮-৯ নং আয়াতে তাকীদ করা হয়েছে, 'ওজনে বাড়াবাড়ি করো না, ঠিক ঠিকভাবে ইনসাফের সাথে ওজন করো এবং পাল্লায় কম করে দিয়ো না।' যেহেতু আমরা এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্বলোকে বসবাস করছি যার গোটা ব্যবস্থাপনাই সুবিচার ও ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাই আমাদেরকেও সুবিচার ও ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। যে গোষ্ঠীর মধ্যে আমাদেরকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে সেখানে যদি আমরা বে-ইনসাফী করি এবং হকদারদের যে হক আমাদের যিম্মায় দেয়া হয়েছে, তা যদি হরণ করি তাহলে তা হবে বিশ্ব প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল। এ মহাবিশ্ব প্রকৃতি জুলুম তো দূরের কথা, দাঁড়িপাল্লার ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে কেউ যদি খরিদ্দারকে এক তোলা পরিমাণ জিনিষ মাপে কম দেয় তাহলে সে বিশ্বলোকের ভারসাম্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

আল্লাহ তা'আলা মীযান [দাড়িপাল্লা] প্রতিষ্ঠা করেছেন অর্থ সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ মীযানে কমবেশ করো না মানে অবিচার ও বে-ইনসাফী করো না। গোটা বিশ্ব দাড়িপাল্লার মতো ভারসাম্যপূর্ণ। আল্লাহর কঠিন আবদ্ধে বাঁধা ভারসাম্যপূর্ণ পৃথিবী সামান্য এদিক সেদিক হলে পৃথিবীতে প্রাণের কোন অবশিষ্ট থাকবে না। তেমনি আল্লাহর দেয়া বিচার ব্যবস্থাও ভারসাম্যপূর্ণ, তাতে এদিক সেদিক করা হলে সমাজে ন্যায়-ইসনাফ ও মানবিক মূল্যবোধ উঠে গিয়ে সামাজিক বিপর্যয় প্রবলাকার ধারণ করে। যারা সামান্য ক্ষমতা পেয়ে ভারসাম্যহীন অবস্থার সৃষ্টি করে, যদি আল্লাহর সামান্য আলো-বাতাস, অক্সিজেন, শ্বাস-প্রশ্বাস সামান্য সময়ের জন্য ক্ষমতাধারীর ক্ষেত্রে স্তব্ধ করে দেয়া হয়, তবে চিন্তা করার বিষয় যে, আপনার আমার কি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। আল্লাহ বলেন, 'আমরা আমাদের রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি দিয়ে পাঠিয়েছি এবং তাঁদের সাথে দিয়েছি কিতাব ও মানদন্ড, যেন লোকেরা ইনসাফ ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।' [সূরা হাদীদঃ ২৫]।

ইমাম ফখরুদ্দীন আল-রাযী এ আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ এ আয়াতটিতে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র প্রশাসন এবং বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার কথা বলে দিয়েছেন।

বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, তা হলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। ন্যায়বিচার হলো শান্তির চাবিকাঠি। আজকের বিশ্বে অশান্তি,

www.pathagar.com

ব্যাপক খুন-খারাবী ও হানাহানির অন্যতম প্রধান কারণ ন্যায়বিচার না থাকা। সুশাসন ও ন্যায়বিচার আজকের সমাজে ডুমুরের ফুল। আমাদের দেশে অনেক আইন আছে কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই এসব আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নেই।

এজন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আজকের পৃথিবীতে মানবতার মহান বন্ধু, ন্যায়পরায়ণ শাসক ও বিচারক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সা]-এর আদর্শের বাস্তবায়ন খুব বেশী প্রয়োজন। যেখানে থাকবে না কোন রেষারেষি, হিংসা-বিদ্বেষ, খুন, ধর্ষণ, লুটপাট, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতা। রাতের অন্ধকারে অবলা নারী নির্বিঘ্নে পথ চলতে পারবে, কোন বখাটে তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখার সাহস করবে না। আমরা যেন আহকামুল হাকিমীনের সামনে হাজির হওয়ার আগে এমন কোন বিচার ফয়সালা না করি যাতে মহান প্রভুর সামনে অপমানিত হতে হয় এবং কঠিন আযাবের স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। আল্লাহ আমাদের শাসক ও বিচারপতিদের তা অনুধাবন করার তাওফিক দিন। #

www.pathagar.com

নাতে রাসূল [সা]

আমিনুল ইসলাম

নবীর নামে দরুদ পড়ি
নবী মুহাম্মদ
আল্লাহ্পাকের বন্ধু তিনি
আমরা তার উম্মত
সাল্লে আলা, সাল্লে আলা।

হেরার গুহায় পেলেন আলো
আসমানী ঐ নূর
সেই নূরেরই জ্যোতি মাখে
পাহাড়, সমুদ্দুর
ধ্যানে জ্ঞানে রাসূলকে তাই
করবো মুহাব্বত
আল্লাহ্পাকের বন্ধু তিনি
আমরা তার উম্মত
সাল্লে আলা, সাল্লে আলা।

ফুল বাগানে হাসলো কুসুম
কণ্ঠে পাখির সুর
দিন রজনী গাইলো গজল
মিষ্টি সুমধুর
কাজে কামে সামনে আছে
সেই নবীজীর পথ
আল্লাহ্পাকের বন্ধু তিনি
আমরা তার উম্মত
সাল্লে আলা, সাল্লে আলা।

www.pathagar.com

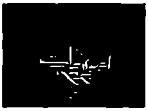

না'ত

শাহনাজ পারভীন

সুখ্যাতির এক শীর্ষশীরে আমার নবীর নাম
মানব গুণের পূর্ণতা যাঁর ছিলই অবিরাম।

চরিত্র তার মাধুর্যময় প্রাণময়ী এক সূর
তার নূরেতে দূরের আকাশ, কাছের, নিকট-দূর-
তার নামেতে শতক কোটি দরুদে ইনাম।
মানব গুণের পূর্ণতা যাঁর ছিলই অবিরাম।

সুখ্যাতির এক শীর্ষশীরে আমার নবীর নাম
মানব গুণের পূর্ণতা যাঁর ছিলই অবিরাম।

আলোকিত প্রস্ফুটিত থোকায় থোকায় ফুল
তার তুলনা নিজেই তিনি, নেই কিনারা কূল!
এই পৃথিবীর শ্রেষ্ট তিনি, দুনিয়া তামাম।
মানব গুণের পূর্ণতা যাঁর ছিলই অবিরাম।

সুখ্যাতির এক শীর্ষশীরে আমার নবীর নাম
মানব গুণের পূর্ণতা যাঁর ছিলই অবিরাম।

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ

ইকবাল কবীর মোহন

দুনিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ও মুসলিমবিরোধী প্রপাগান্ডা মোটেও স্বস্তিকর নয়। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, ইসলাম ও খ্রিষ্টানদের মধ্যকার শতাব্দী-পুরোনো ক্রুসেডের লাভা এখনও অবিরত নির্গত হচ্ছে সর্বত্র। এই ঘৃন্যতম বিদ্বেষ আজও পশ্চিমা বিশ্বের কতিপয় বুদ্ধিজীবীর মাথায় গভীরভাবে গেঁথে আছে। ইসলামবিরোধী শক্তি ও গোষ্ঠীর কাছে ইসলাম যেন অসহনীয় হয়ে ওঠেছে। তাই ইসলামের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য পশ্চিমারা আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছে। এই জঘন্য ও হিংসাত্মক কাজ করতে গিয়ে পশ্চিমের দেশগুলো নানা অমূলক প্রচারণার জাল বিস্তার করছে। ইসলামকে তারা উগ্রতা বা চরমপন্থার [Extremism] সাথে মিলিয়ে ফেলার চেষ্টা চালাচ্ছে।

আজকাল পশ্চিমারা ইসলামকে সন্ত্রাসবাদ, মৌলবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল ইত্যাদি ধর্ম বলে গালমন্দ করছে। মজার ব্যাপার হলো, আমরা যারা ইতিহাস সম্পর্কে জানি, তাদের কাছে স্পষ্ট যে, মৌলবাদের [Fundamentalism] মত উগ্রতা বা চরমপন্থার জন্ম হয়েছিল পশ্চিমা সমাজে। এক সময় তারা নিজেরাই ছিল সন্ত্রাসের হোতা। আজও আধুনিক কায়দায় এসব সভ্যতা বুদ্ধিবৃত্তিক সন্ত্রাসের মাধ্যমে দুনিয়াকে অস্থির করে রেখেছে।

সন্ত্রাসের ভিত্তি প্রথমে রচিত হয়েছিল ইউরোপে। ঐসব দেশের ধর্মীয় বিকৃতির ফসল হিসেবে সন্ত্রাস সমাজ ও রাষ্ট্রকে টেনে ধরেছিল। যাদের ধর্মের শিক্ষা ছিল, কেউ যদি তোমার একগালে চড় মারে, তা হলে তুমিও অগ্রসর হও এবং তার অপর গালে আঘাত কর। অথচ বিপরীতপক্ষে দেখা যায়, ইসলামের ইতিহাসে এমন বিকৃত মানসিকতার কোন নজির নেই। এখানে যুদ্ধের খাতিরে যুদ্ধ কিংবা জেহাদের খাতিরে তলোয়ার চালানোর কোন ঘটনার অস্তিত্ব নেই। যারা নিরীহ-নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে কিংবা জমিনে হানাহানি বা ফাসাদ ছড়ায় ইসলাম তাদেরকে মানবতার শত্রু বলে গণ্য করে। অথচ উগ্র পশ্চিমা জগৎ এবং অবিশ্বাসীরা একথা প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে, ইসলামের জেহাদ একটি ঘৃণিত কাজ। তাদের ভাষায়, জেহাদ জোর করে ইসলাম প্রসারের একটি অস্ত্র মাত্র।

www.pathagar.com

ইতিহাসের বহুল প্রমাণিত সাক্ষ্য হচ্ছে, মানুষ সবসময় অন্যায়-অবিচার এবং স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে তাদের কণ্ঠকে উচ্চকিত করেছে, প্রতিবাদ করেছে। যেখানেই মানবাধিকার লংঘিত হয়েছে অথবা ন্যায়বিচারের অভাব ঘটেছে মানুষ সেখানে নিরূপায় হয়ে প্রতিবাদের ভাষা ব্যাবহার করেছে অথবা ধ্বংসাত্মক পথে পরিচালিত হতে বাধ্য হয়েছে। আমরা পৃথিবীর সাম্প্রতিক কালের গণযুদ্ধ, বিরোধ-হানাহানি, দুর্যোগ, বিশৃংখলা কিংবা অরাজকতার ঘটনাগুলোর প্রতি আলোকপাত করলে দেখতে পাব, এসব ঘটনার মূলে আছে রাষ্ট্র পরিচালিত সন্ত্রাস, অত্যাচার-নিপীড়ন এবং শাসকদের উগ্র ও অমানবিক আচরণ।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের রক্তক্ষয় এবং গণহত্যার কারণ হলো সেখানকার সামরিক শাসক ও রাজনৈতিক নেতাদের একনায়ক ও স্বৈরাচারমূলক ব্যবহার। তারা জনগণের অধিকার হরণ করে নিজেদের ঘৃণ্য স্বার্থ ও উদগ্র ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে গিয়ে বেছে নেয় হত্যা ও নিপীড়নের পথ। শাসকরা সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং শোষণ ও নিপীড়ন দমন করতে ব্যর্থ হয়ে বরং চরম উগ্রতার পরিচয় দিচ্ছে। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তারা অত্যাচার ও দমনপীড়নের অস্ত্রকে শেষ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। এই অবস্থায় ঐসব দেশ, এলাকা বা জনপদের মানুষ বিশেষ করে যুব সমাজ জেগে উঠতে বাধ্য হচ্ছে। তারা তখন শান্তিপূর্ণ উপায়ে অবস্থার পরিবর্তন চাইলেও তার কোন সুযোগ থাকে না। ফলে চরম হতাশার কবলে পড়ে স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হয় সামাজিক অস্থিরতা। এভাবে একটি অন্যায় বা অবিচারের প্রতিবাদে গড়ে ওঠা বাধ্যতামূলক প্রতিরোধকারী সমাজকে উগ্র বা সন্ত্রাসী বলার কোন সুযোগ নেই। এমনটা বলাও নেহায়েৎ অন্যায়। বরং এই অসুন্দর কাজটির জন্য শাসকগোষ্ঠীই দায়ী। সন্ত্রাস বিস্তারের অন্যতম কারণ হলো ন্যায়নীতিকে অস্বীকার করা। সরকার কিংবা প্রশাসন জনগণের ন্যায়বিচারের দাবী পূরণে সক্ষম না হলে তারা নিদারুণভাবে নিগৃহীত হয়। ফলে সরকার বা সমাজের পরিচালকদের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে সৃষ্টি হয় প্রচন্ড ঘৃণা। আর তার থেকে জন্ম নেয় প্রতিশোধ স্পৃহাও। ভারতীয় সমাজের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই ধর্মীয়বিরোধ বা দাঙ্গার সময় সেখানকার সংখ্যালঘু মুসলমানরা উগ্র হিন্দুদের হাতে চরমভাবে নিগৃহীত হয় এবং রাষ্ট্রীয় ছত্রছায়ায় মুসলমানরা ব্যাপক গণহত্যার শিকার হয়। সরকারের মেশিনারী কিংবা পুলিশ প্রশাসন এতে পক্ষপাতমূলক অবস্থান গ্রহণ করায় সংখ্যালঘুরা হয় মানবিক বৈষম্যের শিকার। সেখানে অনেক লোক দেখানো তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়, তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, রিপোর্টে দোষীদের দোষও প্রমাণিত হয় কিন্তু এর কোন বিচার হয় না। ফলে জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে অস্থিরতা। এই অন্যায় আচরণের ফলে এবং দোষীদের উৎসাহদানের অভিযোগে সেখানকার কোন একটি অংশ যদি অস্ত্র তুলে নেয় তা হলে অবস্থাটি কিভাবে ব্যাখ্যা করা হবে? এটাকে অন্যায়ের প্রতিরোধের

www.pathagar.com

স্বাভাবিক ফল বলে গণ্য করা হবে। কোনভাবেই এই অবস্থাকে সন্ত্রাস নামে অভিহিত করা যায় না, যেতে পারে না।

সন্ত্রাসের কতগুলো মৌলিক বৈশিষ্ট্য আছে। সন্ত্রাসের মাধ্যমে একটি ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়। সরকারের দুর্বলতাগুলো পুঁজি করে জনগণের সস্তা জনপ্রিয়তাকে অবলম্বন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সরকারের ওপর মানুষের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে সন্ত্রাসের পথ তৈরী করা হয়। এসব যারা করে তারা অনেক সময় আদর্শের কথা বলে বেড়ায়। তাদের অভিযোগগুলোও অনেক সময় বাস্তব বলে মনে হয়। এমতাবস্থায় সরকার তাদের ব্যাপারে, তাদের পরিবার, গোত্র, সম্প্রদায় অথবা তাদের এলাকার বিরুদ্ধে কঠোর নীতি গ্রহণ করে থাকে। এই পরিস্থিতিতে নিগৃহীত জনগণ এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য হাতে তুলে নেয় অস্ত্র। এভাবে অস্ত্রধারণকে পৃথিবীর কোন কোন ধর্ম বিশেষ করে ইসলাম মোটেই সমর্থন করে না। কেননা, ইসলাম অসহায় ও নিরীহ মানুষকে পুঁজি করে কোন অনভিপ্রেত ঘটনা তৈরীকে অপছন্দ করে। বস্তুতপক্ষে, বস্তুতান্ত্রিক সমাজ এবং পশ্চিমা সভ্যতা এ ধরনের সন্ত্রাসকে সমর্থন করে এবং এ কাজকে সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। এ ধরনের সমাজের নতুন প্রজন্ম তাদের সংস্কৃতি এবং শিক্ষার কারণে ক্রমেই হয়ে ওঠে অনিয়ন্ত্রিত। ইসলাম এ ধরনের কাজকে অর্থাৎ অস্ত্র-সংস্কৃতি ও রক্তপাত ইত্যাদিকে মোটেই পছন্দ করে না। বরং ইসলাম সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক ফ্যাসিবাদী তৎপরতা এবং সন্ত্রাসকে বিরোধিতা করে। আজকাল বীরত্বের নামে বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থে রাষ্ট্রগুলো অনেক সাহসী ঘটনা পরিচালনা করে বা আগ্রাসন চালায়। অথচ ইসলামী ইতিহাসের কোন পর্যায়ে এ ধরনের ঘটনার অস্তিত্বই ছিল না। মজার ব্যাপার হলো, এ ধরনের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মানবতা, স্বাধীনতা বা গণতন্ত্রের নামে পশ্চিমা দেশগুলোতেই ঘটে থাকে। এর মধ্যে রাশিয়া, আমেরিকা, ভারতের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিমা মানসিক জগতে নাজীদের ভীতিময় নারকীয়তার অপছায়া প্রতিফলিত হচ্ছিল। তার পরক্ষণেই সমাজতন্ত্রের উত্থান ঘটলো ব্যাপক আংগিকে এবং এক ভয়ানক মূর্তিতে। এই দুই শক্তি অবশেষে তাদের দু:খজনক পরিণতির মুখোমুখি হলো। এরপর পশ্চিমা বিশ্ব আবারো নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীর সাক্ষাত পেলো। নি:সন্দেহে এটা ছিল সালাহউদ্দিন আয়ুবীর ঝলমলে তরবারীর সেই ঝলকানি, যার কাছে তৃতীয় রিচার্ডের নেতৃত্বাধীন সমগ্র খ্রিষ্টানজগত পরাজয়বরণ করেছিল। বীর আয়ুবী বায়তুল মাকাদ্দাস দখলমুক্ত করে শতাব্দীর কলংক থেকে মুসলিম জগতকে গৌরবের শিখরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

ইসলামের এ স্বচ্ছ ইতিহাস সত্ত্বেও ইউরোপের ইহুদী মিডিয়া ইসলামকে এতটা ভয়ংকরভাবে চিত্রিত করে যে, মানবতার জন্য এক ভয়াবহ ও বিধ্বংসী পরিণাম ইসলাম ও তার অনুসারীদের পক্ষ হতে অপেক্ষা করছে। বস্তুতপক্ষে, এটা ইতিহাসেরই এক ট্রাজেডী যে, কোন জুলুমবাজ সরকার বা নেতৃত্ব এভাবেই তার

www.pathagar.com

প্রতিপক্ষকে ভীতিজনকভাবে দাঁড় করায়, যাতে তাঁর অভিষ্ট মতলব সহজে সাধিত হতে পারে। ইসলামকে যুগে যুগে অযথা মানবতার শত্রু বলে প্রচার করা হয়েছে। অথচ এর সাথে এ ধারণার কোন সংশ্রবই খুঁজে পাওয়া যায়নি। ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমা ভীতিকে John L. Espasito তাঁর The Islam Threat বইতে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, The Muslims are coming, the Muslims are coming. ইসলামকে সন্ত্রাসবাদের সাথে জড়িয়ে পশ্চিমারা তাদের স্বার্থ হাসিলের কুমতলবে মেতে উঠেছে। যে কোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে ইসলামী ব্যক্তি ও সংগঠনের সাথে জড়িয়ে ফেলার পশ্চিমা কৌশল সন্ত্রাসের মূল নির্ধারণের পথকে বাধাগ্রস্থ করছে। ফলে সন্ত্রাসীরাই আসলে ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে। এর পরিণাম হিসেবে সন্ত্রাস এখন বুমেরাং হয়ে পশ্চিমা বিশ্বের দিকেই ফিরে যাচ্ছে। এতে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে শান্তিপ্রিয় মানুষ। সুশীল সমাজ।

দু:খজনক ব্যাপার হচ্ছে, পশ্চিমাদের এই অপকর্ম এবং ইসলামকে নি:শেষ করার অপকৌশল মানুষ বুঝে উঠতে পারছে না। আমাদের বাংলাদেশেও আমরা একই চিত্র লক্ষ্য করি। এ দেশের ধর্মনিরপেক্ষ লুটেরা গোষ্ঠী নিজেদের অপকর্ম ও ক্ষমতার মোহকে চরিতার্থ করার জন্য সদা তৎপর। তাদের হীনতা ও পথভ্রষ্টতার পথে ইসলাম ও মুসলমানরা প্রধান বাধা বলে তারা মনে করছে। ফলে ইসলাম ও মুসলমানরাই এখন তাদের টার্গেটে পরিণত হয়েছে। যে কোন ঘটনাকে ইসলামী মৌলবাদীদের কাজ বলে তারা অবলীলায় চালিয়ে দিচ্ছে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, মানুষ আজকাল এসব মতলববাজদের চরিত্র বুঝতে শুরু করেছে। সন্ত্রাস বা উগ্রতার সাথে ইসলামের যে দূরতম সম্পর্ক নেই তা ক্রমেই মানুষের কাছে পরিস্কার হয়ে উঠছে। এ ব্যাপারে ইসলামপন্থীদেরও অনেক দায়িত্ব রয়েছে। ইসলামের সুষমাকে তুলে ধরতে তাদেরও আরো সচেতন ও বলিষ্ঠ হতে হবে। #

www.pathagar.com

বদর যুদ্ধের বৈপ্লবিক শিক্ষা ও তার প্রভাব

মোহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম

৬২৪ সালের ১৭ মার্চ রমযান মাসে সত্য-মিথ্যার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয়কারী ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মাত্র ৩১৩ জন নিরস্ত্র সাহাবীকে নিয়ে রাসূল [সা] সুসজ্জিত এক হাজার কুরাইশ বাহিনীর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসের প্রথম সামরিক অভিযান। ইতিপূর্বে গোত্রীয় কলহের যুদ্ধে আরবরা অভ্যস্থ থাকলেও এই যুদ্ধ ছিল তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশেষ করে মুসলিম সৈন্যদের পক্ষে এখানে কোনো গোত্র, বংশ, পরিবারের স্বার্থ জড়িত ছিল না। তাঁরা সম্পূর্ণ আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের [সা] ডাকে সাড়া দিয়ে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। আর কুরাইশরা যুদ্ধে এসেছিল আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ বেশি বেশি প্রলোভন দিয়ে কুরাইশ সৈন্যদের এই যুদ্ধে শরীক করেছিল। এই যুদ্ধে কুরাইশদের সৈন্য সংখ্যা বেশি হওয়া সত্ত্বেও তারা পরাজিত হয়, মুসলমানরা বিজয় লাভ করে। আল্লাহর রাসূলের [সা] দোয়ায় যুদ্ধ ছাড়াই কুরাইশ বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া কোন প্রকারেই অসম্ভব ছিল না। আল্লাহ অবশ্যই তাঁর প্রিয় হাবিবের কথা শুনতেন। কিন্তু তা করা হয়নি। মুসলমানদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হয়েছে। এরপর আল্লাহর সাহায্য মুসলমানদের জন্য অবধারিত হয়ে পড়ে এবং তিনি প্রকাশ্য বদর প্রান্তরে চিহ্নিত ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন বলে কুরআনে ঘোষিত হয়েছে। অর্থাৎ 'তাওয়াক্কালু আলাল্লাহি' এর চূড়ান্ত রূপ হলো কর্মে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে আল্লাহর সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করা। মুসলমানদের জন্য এই যুদ্ধে বিজয় ছিল দুই দিক থেকে। এক, পার্থিব। দুই, পারলৌকিক। রাসূল [সা] পার্থিব জীবনে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিলেন। তাঁদের মৃত্যু পর্যন্ত এই সম্মান 'বদরী সাহাবী' অব্যাহত ছিল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য কুরআনে বিভিন্নভাবে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না,

www.pathagar.com

বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পার না।' [সূরা বাকারা:১৫৪]। সূরা ইয়াছিনে ঐতিহাসিকভাবে একজন শহীদের জান্নাতে বড় পুরস্কার প্রাপ্তির সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। কুরআনের এ বাণী মুসলমানদের প্রাণে নবপ্রেরণা সৃষ্টি করে। শত্রুর সাথে যুদ্ধ অনিবার্য জেনেও তারা আল্লাহর বাণী দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়ে এবং এক শতাব্দীর মধ্যে অর্ধ পৃথিবীতে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডিন করতে সক্ষম হয়।

মুসলমানরা সিয়ামরত অবস্থায় এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। কাফের মুশরেকরা ভেবেছিল ক্ষুধার্ত থেকে মুসলমানরা যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়বে এবং তারা বিজয়ী হবে। কিন্তু তাদের সে বাসনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। রমজান মাসের অন্যতম শিক্ষা ধৈর্য ধারণের ফলাফল পার্থিব জীবনে বহুভাবে এমনকি বদর প্রান্তরেও প্রত্যক্ষ করা যায়। কুরআনে এই যুদ্ধ সংক্রান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করা হয়েছে, সেখানেও ধৈর্যের কথাই বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'এই যুদ্ধে প্রথমে তিন হাজার ফেরেশ্‌তা দিয়ে এবং ধৈর্যধারণ করলে ও সতর্ক হয়ে চললে কাফেরদের মুকাবেলায় পরে পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশ্‌তা দিয়ে মুসলমানদেরকে সাহায্য করা হয়েছে।' [সূরা আল-ইমরান:১২৪-১২৫]। অন্যত্র বলা হয়েছে, 'আর বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে, আল্লাহ তখন তোমাদের সাহায্য করেছেন।' [সূরা আল-ইমরানঃ ১২৩]। উপর্যুক্ত প্রতিশ্রুতি পালনে বান্দার জন্য দুনিয়ায় বিভিন্ন যুদ্ধ ক্ষেত্রে এ সাহায্য আসা কখনো বন্ধ হয় না। কিন্তু স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং মানুষের তৈরি করা নেতৃত্ব এবং দাসত্বের কারণে এই সাহায্য সমাজে প্রত্যক্ষ করা যায় না।

এই যুদ্ধে 'বেশি সংখ্যকদের উপর অল্প সংখ্যকদের বিজয়' [মুসলমান-৩১৩, কাফের-১০০০] এখনো সারা পৃথিবীর মুসলমানকে উজ্জীবিত করে। পরবর্তীতে কাফিরদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল যুদ্ধেই মুসলমানদের সংখ্যা কম থাকা সত্ত্বেও তাঁরা বিজয়ী হয়েছে। কুরআনেও তার সত্যায়ন করা হয়েছে। 'আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।' [সূরা বাক্বারা: ২৪৯]।

কুরআনে যুদ্ধ সংক্রান্ত আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষের দাসত্বে নিজের সুখ এবং জাতির মুক্তির পথ অনুসন্ধান করে, তাই পৃথিবীতে শান্তি প্রত্যক্ষ করা যায় না। অথচ অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মৌলিক শিক্ষা ছিল সকল প্রকার দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর দাসত্বে আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালানো। এজন্য যদি যুদ্ধেরও প্রয়োজন হয়। কুরআনের ভাষায়, 'তোমরা

www.pathagar.com

কাফিরদের মুকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও সদা সজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে যা দ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে ভীত সন্ত্রস্থ রাখা যায়।' [সূরা আনফালঃ ৬০]। এ থেকে দেশের মধ্যে সশস্ত্র ও সুসজ্জিত বাহিনী রাখার গুরুত্ব অনুভূত হয়। অন্যত্র বলা হয়েছে, 'যদি তোমরা তাদেরকে শাস্তি দাও, তবে ঠিক ততখানি দাও, যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়।' [সূরা নাহলঃ১২৬]। আরো বলা হলো, 'হে নবী! মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। তাঁদের মধ্যে বিশ জন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দুশো জন কাফিরের উপর বিজয়ী হবে এবং একশ জন থাকলে এক হাজার কাফিরের উপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের মৃত্যুভয় নেই।' [সূরা আনফালঃ৬৫]। অন্যত্র বলা হয়েছে, 'বদর যুদ্ধে এক হাজার ফেরেশ্‌তা দিয়ে মুসলমানদেরকে সাহায্য করা হয়েছিল।' [সূরা আনফালঃ৯]। রমজান মাসে এই মীমাংসাকারী যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয় লাভ করে। এ সকল আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সময় একনিষ্ঠ ধৈর্যশীল মুসলমানরা আল্লাহর গায়েবী সাহায্য প্রাপ্ত হয়।

স্বল্প সংখ্যক মুমিনদের উপর অধিক সংখ্যক কাফিরদের পরাজয় পরবর্তীতে বিশ্ব বিজয়ে সমগ্র মুসলমানদেরকে উজ্জীবিত করে এবং এসকল যুদ্ধে মানবতা এবং মানবাধিকারের যে দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয় বিশ্ববাসীর শিক্ষার জন্য তা ছিল নজীরবিহীন। এসময় দেশে দেশে যে অত্যাচার, অপশাসন, দুঃশাসন চলছিল তা থেকে জাতিকে মুক্তির পথ দেখানো হয়। মুসলমানরা প্রায় আটশত বছর অর্ধ পৃথিবীতে আল্লাহর বাণীকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার প্রয়াস চালায়। এটাই ছিল বদরের শিক্ষা। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে আদর্শহীনতা তাঁদের স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত হানে। বদরের পরে উহুদ যুদ্ধে [৬২৫] মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল সাতশ [এ যুদ্ধে বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের সামান্য পরাজয় হয়েছিল], কাফিরদের ছিল তিন হাজার, খন্দকে [৬২৭] তিন হাজার, কাফিরদের ছিল দশ হাজার, মুতার যুদ্ধে [৬২৯] তিন হাজার, কাফিরদের ছিল এক লক্ষ, হুনায়েন যুদ্ধে [৬৩০] বার হাজার, কাফিরদের ছিল বিশ হাজার, তাবুক যুদ্ধে [৬৩০] চল্লিশ হাজার, কাফিরদের ছিল এক লক্ষ, আজনাদাঈনের যুদ্ধে [৬৩৪] চল্লিশ হাজার, কাফিরদের ছিল দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার, বিখ্যাত কাদেসিয়ার যুদ্ধে [৬৩৫] ত্রিশ হাজার, কাফিরদের ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার, জালুলার যুদ্ধে [৬৩৭] মাত্র বার হাজার, কাফিরদের ছিল এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার, বিখ্যাত ইয়ারমুকের যুদ্ধে [৬৩৬] চল্লিশ হাজার, কাফিরদের ছিল দুই লক্ষ। স্পেন বিজয়ে [৭১১] মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র তেইশ হাজার, কাফিরদের ছিল এক লক্ষ

www.pathagar.com

বিশ হাজার, সিন্ধু অভিযানে [৭১২] মাত্র পনের হাজার, কাফিরদের ছিল পঞ্চাশ হাজার, সুলতান মাহমুদের জয়পালের বিরুদ্ধে [১০২৭] মাত্র দশ হাজার, জয়পালের ছিল বিয়াল্লিশ হাজার তিনশ। তরাঈনের দ্বিতীয় যুদ্ধে [১১৯৩] সুলতান মুহাম্মাদ ঘুরীর এক লক্ষ বিশ হাজার, পৃথীরাজের ছিল তিন লক্ষ। এ পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হয় যে, সব যুদ্ধেই মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা কম আর কাফিরদের ছিল বেশি। এতদসত্ত্বেও কাফিররা পরাজিত হয়েছে এবং মুসলমানরা বিজয়ী হয়েছে। এতে করে কুরআনের বাণী 'বেশি সংখ্যকদের উপর স্বল্প সংখ্যকদের [মুমিন] বিজয়' ঐতিহাসিকভাবে সত্যে পরিণত হয়েছে। এই শিক্ষায় পরবর্তীতে বিশ্ব বিজয়ে মুসলমানদেরকে অনুপ্রাণিত করে এবং তাঁরা স্পেন, ইউরোপ, আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া ও ভারতবর্ষে ইসলামের বিজয় অভিযানে চরম সফলতা লাভ করে। সংখ্যাধিক্য কিংবা আধুনিক মরণাস্ত্র কিংবা পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ধৈর্যশীল মর্দে মুমিনদেরকে কখনো সত্যের পথ থেকে পরাজিত করা যায় না। এখানেই বদরের প্রকৃত শিক্ষা নিহিত। আত্মনিয়ন্ত্রণের এই শিক্ষার ভিত্তিতেই মুমিনদেরকে সম্মুখ সমরে কিংবা প্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধে [সুদ, ঘুষ, যিনা ব্যভিচার, দুর্নীতি] তাকে কখনো পরাজিত করা যায় না। বর্তমানে যতদিন সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে সেই বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্য অর্জিত না হয় ততদিন পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে অন্তরের পবিত্রতা লাভ অসম্ভব এবং এ অবস্থায় তাদের মধ্যে জাতীয় পুন:জাগরণ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে মানুষকে শয়তানের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে অর্থাৎ তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আত্মিক, মানসিক ও দৈহিকভাবে প্রচেষ্টা গ্রহণের মাধ্যমে সকল প্রকার দাসত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে নিজের আত্মাকে আখেরাতমুখী করে আল্লাহর নৈকট্যলাভই হল বদর যুদ্ধের অন্যতম শিক্ষা। #

www.pathagar.com

আবু লাহাবের করুণ পরিণতি

মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্

সকল অত্যাচারীর শেষ পরিণতি বড় ভয়ংকর। মহান আল্লাহ্র বিচার থেকে কোন অহংকারী রেহাই পায়নি। এই পৃথিবীর বুকেই ঘটে যায় অনেকের বিপর্যয়, কারও জন্যে থাকে পরকালে কঠিন শাস্তি। শেষ পর্যন্ত দোযখের ভীষণতম অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয় সকলেই। রাসূলুল্লাহ [সা]-এর ওপর আবু লাহাব যে অমানবিক অত্যাচার করেছিল, আলোচ্য নিবন্ধে সেই জঘন্যতম অপরাধীর ভয়ংকর পরিণাম সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ [সা]-এর প্রতি নিষ্ঠুরতম নির্যাতনে এবং জঘন্যতম ইসলাম বিরোধিতায় বিশ্ব ইতিহাসে যে লোকটি সর্বাধিক ধিকৃত এবং কুখ্যাত, সেই আবু লাহাবের প্রকৃত নাম আবদুল উজ্জা বা উজ্জার দাস। আবু লাহাব তার উপনাম। লাহাব অর্থ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। প্রকৃতই সুদর্শন এই লোকটির গায়ের রঙ ছিল উজ্জ্বল গৌরবর্ণের, অগ্নিশিখার মত লালিমাময়। এ জন্যে তার ডাক নাম হয় আবু লাহাব অর্থাৎ অগ্নিশিখা সমন্বিত বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যুক্ত। তার পিতা আবুদল মুত্তালিবই এ উপনামে তাকে আখ্যায়িত করেছিলেন।

তৎকালীন আরবে 'চেলারেহমী' অত্যন্ত গুরুত্ব এবং মর্যাদার সঙ্গে রক্ষিত হত। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, আপন গোত্রের-লোকজনদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা এবং সকল কাজে সর্বান্তকরণে তাদের সমর্থন করার নাম 'চেলারেহমী'। আবু লাহাব ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা। বনি হাশিম এবং বনু মুত্তালিবের সকলে যখন এক জোট [যদিও তাঁদের অনেকেই তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি] হয়ে রাসূলুল্লাহ [সা]কে জোরাল সমর্থন করছিলেন, একমাত্র আবু লাহাব হেজাযে বহুল প্রচলিত এই 'চেলারেহমী' প্রথা ছিন্ন করে বিরোধী পক্ষে যোগ দিয়েছিল। কেবল যোগ দেয়াই নয়, নবীজীর প্রতি নির্যাতন এবং ইসলাম বিরোধিতার প্রতিটি কার্যক্রমে সে রেখেছিল সক্রিয় ও প্রধান ভূমিকা।

www.pathagar.com

দুশ্চরিত্র ছিল আবু লাহাব। তার সাথে সে ছিল সীমাতিরিক্ত অহংকারী। আবদুল মুত্তালিবের দশ-বারটি পুত্র সন্তানের মধ্যে সেই ছিল সবচেয়ে কুখ্যাত। অন্যেরা পৃথিবীর ইতিহাসে যথেষ্ট খ্যাতিমান। নবী করীম [সা]-এর প্রতিপালক হিসেবে আবু তালিব অবিস্মরণীয়। মহামহিম আবদুল্লাহ হলেন রাসূল [সা]-এর আব্বাজান। চাচা হযরত হামজা [রা] ও হযরত আব্বাস [রা] ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

এই মহান ভ্রাতাগণের পাশে আবু লাহাব যেন এক কলঙ্ক, অন্ধকার বিবরের এক বিষাক্ত সরীসৃপ। ধনাঢ্য এবং কুরাইশদের বিশিষ্ট নেতা হয়েও এমনই নীচ এবং চরিত্রহীন হয়ে পড়েছিল যে, সে হেরেম শরীফের কোষাগারে বহুকাল সযত্নে রক্ষিত একটি স্বর্ণমৃগ অবলীলায় অপহরণ করে অন্যের নিকট বিক্রি করতে তার বিবেকে বাঁধেনি। ইতিহাস গ্রন্থে এই কলঙ্কিত ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। স্বর্ণ হরিণটি অন্যের নিকট হতে পরে উদ্ধার করা হয়েছিল বলে উল্লেখিত হয়েছে কোন কোন বর্ণনায়। ঘটনা যাই ঘটুক, সমবেত কুরাইশগণ আবু লাহাবকে চোর আখ্যায়িত করতে এতটুকু সংকোচবোধ করেনি। সাধারণ মানুষেরা ভয়ে ভীত হয়ে তাকে কিছু সম্ভ্রম করলেও আবু লাহাবের প্রতি তাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল না মোটেই।

এই অসৎ চরিত্রের লোকটি 'চেলারেহমী' ছিন্ন করে কেন যে রাসূল [সা]-এর বিরোধিতায় মেতে উঠেছিল, তার সঠিক কারণ উপলব্ধি করা সত্যই দুরূহ। রাসূলুল্লাহ [সা] তার সঙ্গে কোন দুর্ব্যবহার করেননি, কটুবাক্য বলেননি, কোন উপকার ছাড়া এতটুকু ক্ষতি পর্যন্ত করেননি কোনদিন। অথচ লোকটি নবী করীম [সা]-এর জীবনের জন্য ভয়ঙ্কর রকম ক্ষতিকারক হয়ে উঠেছিল।

ঐতিহাসিকগণ এই শত্রুতার একটি মাত্র কারণই উল্লেখ করেছেন এবং তা হল, কুরাইশদের সতর্ক করে রাসূলুল্লাহ [সা] বলতেন, 'শীর্‌ক বর্জন কর, পৌত্তলিকতা ত্যাগ কর এবং এক আল্লাহ্‌র ইবাদতে মগ্ন হও।' মঙ্গলের পথে, কল্যাণের পথে, সত্যের পথে জনসাধারণকে আহক্ষান করাই হল তাঁর গুরুতর এবং একমাত্র অপরাধ!

'চেলারেহমী' ছিন্ন করা ছাড়াও নবী করীম [সা]-এর দ্বীন ইসলামের দাওয়াত প্রচার ও আন্দোলনকে ব্যর্থ ও অচল করে দেয়ার উদ্দেশ্যে সুদীর্ঘদিন ধরে আবু লাহাব জঘন্য শত্রুতা ও নির্মম আঘাত হেনে চলেছিল।

কাবা শরীফের নিকটবর্তী সাফা পর্বতের শীর্ষদেশে দাঁড়িয়ে প্রদত্ত রাসূল [সা]-এর 'সাফা পর্বতের দাওয়াত' থেকেই আবু লাহাব দীর্ঘস্থায়ী বিরোধ শুরু করল প্রত্যক্ষভাবে। নবুয়ত প্রাপ্তির পর প্রথম তিন বছর অত্যন্ত সংগোপনে ইসলামের

www.pathagar.com

প্রচারকার্য চালালেন রাসূল [সা]। প্রাথমিক এই তিন বছরে তাঁর ধৈর্য, অভিজ্ঞতা এবং সহনশীলতা বৃদ্ধি পেলে তাঁর ওপর নির্দেশ এল প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার করার, 'তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছে [মহান আল্লাহ তোমার ওপর যা অবতীর্ণ করেছেন] তা প্রকাশ্যে [সকলের সম্মুখে] প্রচার কর।' [১৫:৯৪, সূরা হিজর, রুকু ৬, আয়াত ৯৪]।

সমসাময়িক কালে অবতীর্ণ হল আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত, যাতে মহান আল্লাহপাক নবী করীম [সা]কে তাঁর পরিবার-পরিজন ও নিকট আত্মীয়-স্বজনদের সতর্ক করা ও পরকালের আযাব সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শনের কথা বলেছেন। বলা হয়েছে, 'তোমার স্বজনবর্গকে [পরিবার-পরিজন এবং আত্মীয়-স্বজনকে] তুমি সতর্ক করে দাও।' [২৬:২১৪, সূরা শোয়েরা, রুকু ১১, আয়াত ১১৪]।

এই দু'টি অতি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ প্রাপ্তির পর একদিন প্রভাতে রাসূল [সা] সাফা পর্বতের শীর্ষদেশে আরোহণ করলেন। কুরাইশদের উদ্দেশ্যে এই পর্বতের শিখর হতে যতটা সম্ভব উচ্চস্বরে বললেন, 'ইয়া সাবাহা! ইয়া সাবাহা! ইয়া সাবাহা! হায়, সকাল বেলার বিপদ! হায় সকাল বেলার বিপদ!'

তৎকালীন আরবের রীতি অনুযায়ী কেউ যদি কোন শত্রুদলকে আপন গোত্রের প্রতি আক্রমণের জন্য অগ্রসর হতে দেখত, সাফা পর্বতে উঠে এই শব্দ দু'টি উচ্চারণ করলে সবাই অতিদ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করত। বিশেষ উদ্দেশ্যে সকল কুরাইশকে স্বল্পতম সময়ে এক স্থানে সমবেত করারও ছিল এ এক সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। অতি প্রত্যুষে এ ধরনের আহক্ষান শুনে সকলের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল, অনেকেই ব্যগ্রভাবে একে অন্যকে জিজ্ঞেস করল, কে ডাকছে? উত্তর এল, মুহাম্মাদ [সা]। তাড়াতাড়ি সবাই সাফা পর্বতের পাদদেশে এসে সমবেত হল। যার পক্ষে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হল না, বক্তব্য শোনার জন্যে সে প্রতিনিধি প্রেরণ করল। সমবেত কুরাইশদের প্রতিটি বংশের নাম ধরে ধরে সম্বোধন করে রাসূল [সা] বললেন, 'হে বনু আবদে মানাফ, হে বনু হাশেম, হে বনু আব্দুল মুত্তালিব, হে বনু আদি, হে বনু ফিহর, হে অমুক বংশ!'

ইবনে আব্বাস [রা] বলেন, 'কুরআনের আয়াত 'হে মুহাম্মাদ! তোমার নিকট আত্মীয়দের ভয় দেখাও' অবতীর্ণ হলে নবী [সা] কুরাইশ সম্প্রদায়কে আহক্ষান করে বললেন, বনু ফিহর, ওহে বনু আদি ইত্যাদি। [বুখারী শরীফ-২৫৫।]

আবু হুরাইরাহ [রা] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ [সা] কুরআনের আয়াত 'হে মুহাম্মাদ! তোমার নিকটাত্মীয়দের ভয় দেখাও' অবতীর্ণ হলে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, 'হে কুরাইশ সম্প্রদায় কিংবা এরূপ কোন শব্দ। তোমরা নিজেদের আল্লাহ্র আযাব হতে বাঁচাও। আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে

www.pathagar.com

পারব না। হে বনু আবদে মানাফ, আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট কিছু করতে পারব না। হে [রাসূলের] ফুপু সুফিয়া! আমি আপনার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট কিছু করতে পারব না। হে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ! তুমি আমার অর্থ সম্পদ যা ইচ্ছা চেয়ে নাও, কিন্তু আমি আল্লাহ্‌র নিকট তোমার জন্য কিছু করতে পারব না।'

বুখারী শরীফ, হাদিস ২৫৫১। 'হে বনি ফিহর, হে বনি আদি [হাদিস নং ৩২৬৩] এবং 'হে উম্মে যুবাইর' হাদিস নং ৩২৬৪ প্রভৃতি রূপেও সম্বোধন করেন।

এরপর তিনি বলেন, 'আমি যদি বলি এই পর্বতের অপর পারে একদল শত্রু তোমাদের ওপর আক্রমণ ও আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? সমবেত জনমন্ডলী দ্বিধাহীন চিত্তে এককণ্ঠে জবাব দিল, 'নিশ্চয়ই। তোমার নিকট থেকে আমরা কখনো সত্য ব্যতীত মিথ্যা পাইনি।'

জনতার নিকট থেকে এমন শঙ্কাহীন উত্তর আসার পর নবী করীম [সা] সকলকে সম্বোধন করে দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে বললেন, 'সত্য সত্যই আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কঠিন আযাবের ভয় প্রদর্শন করছি। সম্মুখে এক কঠিনতম আযাব আসছে, সেই আযাব থেকে আমি তোমাদের সকলকে সতর্ক করছি।'

রাসূলুল্লাহ [সা]-এর উচ্চারিত এ সাবধান বাণী অনেককেই উত্তেজিত করে তুলল। কিন্তু আবু লাহাবের মাত্রাতিরিক্ত শত্রুতা চোখে পড়ল সকলের। ক্রোধে অধীর হয়ে কারো কিছু বলার পূর্বে আবু লাহাব চিৎকার করে উঠল, 'তাব্বালাকা আলি হাযা জামায়াতানা।' 'তোমার সর্বনাশ হোক! একথা বলার জন্যই কি তুমি আমাদেরকে একত্রিত করেছ?'

কেবল এ অভিশাপ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, নবী করীম [সা]কে আঘাত হানার জন্য সে একটি পাথরও তুলেছিল।

আবু লাহাব কেবল রাসূলুল্লাহ [সা]-এর চাচাই ছিল না, সে ছিল তাঁর নিকটতম প্রতিবেশী। একই প্রাচীরের মধ্যে ছিল তাদের বাসগৃহ। এছাড়া রাসূল [সা]-এর নিকট প্রতিবেশীদের মধ্যে ছিল উকবা ইবনে আবু মুয়ীত, আদি ইবনে হাসরা, মারওয়ানের পিতা হাকাম ইবনে আ'স প্রমুখ। এসব শয়তান প্রকৃতির প্রতিবেশীরা নবী করীম [সা]কে কোনদিন শান্তিতে বসবাস করতে দেয় নি। আবু লাহাব কিংবা আবু জাহেলের প্ররোচনায় প্রতিটি মুহূর্তে এরা রাসূল [সা]-এর ক্ষতি সাধনে তৎপর থাকত। তিনি যখন নামাযে সিজদাবনত হতেন, এই শয়তানের দল উপর থেকে ছাগল-ভেঁড়ার নাড়িভূঁড়ি নিক্ষেপ করত, রান্না শুরু হলে হাঁড়ি পাতিলের ওপর ফেলত ময়লা-আবর্জনা। এসবে অতিষ্ঠ হয়ে হুজুর

www.pathagar.com

আকরাম [সা] একদিন মুশরিকদের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনারা তো আমার প্রতিবেশী অথচ এটা আপনাদের কি ধরনের আচরণ?
উম্মে জামিলা। আবু লাহাবের স্ত্রী। যোগ্য সহধর্মিনী হয়ে উঠেছিল তার স্বামীর। প্রাচীরের মধ্যে গৃহাভ্যন্তরে সে-ই হয়ে উঠেছিল নবী করীম [সা]-এর অন্যতম নির্যাতনকারীণী। হাঁড়ি-পাতিল নোংরা করা ছাড়াও জঙ্গল থেকে প্রতিদিন সে কাঁটাযুক্ত গাছের ডাল খুঁজে আনত এবং গভীর রাতে সেগুলো রাসূল [সা]-এর দরজার সামনে রেখে আসত, কখনো কখনো এই কাঁটা গমনাগমনের পথে ছড়িয়ে দিত। উদ্দেশ্য একটাই, যাতে নবী করীম [সা] এবং তাঁর সন্তানেরা কন্টকবিদ্ধ হয়ে যন্ত্রণায় কষ্ট পায়।
সূরা লাহাবে তার সম্পর্কে যে সতর্কবাণী অবতীর্ণ হয় তা অবগত হয়ে এই রাক্ষসী রমণী হাতে পাথর নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ [সা]কে আঘাত করার জন্যে একবার কাবা শরীফ পর্যন্ত ছুটে এসেছিল। এসব জঘন্য কাজে আবু লাহাবের পূর্ণ সমর্থন ছিল।
নবুয়ত লাভের পূর্বেই আবু লাহাবের দুই পুত্র উতবা এবং উতাইবার সঙ্গে নবী করীম [সা]-এর প্রাণপ্রিয় দুই কন্যা হযরত রোকেয়া [রা] এবং হযরত উম্মে কুলসুমের [রা] শাদী মুবারক সম্পন্ন হয়। নবুয়ত লাভের পর আবু লাহাবের শত্রুতা চরমে ওঠে, সে তার পুত্রদের নবী করীম [সা]-এর কন্যাদ্বয়কে তালাক দিতে বাধ্য করে। পুত্রদের উদ্দেশ্যে ক্রোধভরে সে চিৎকার করে বলে ওঠে, 'যদি মুহাম্মাদের [সা] কন্যাদের তালাক না দাও, তোমাদের মুখ দর্শন আমার জন্য হারাম।'
অনুগত পুত্রদ্বয় পিতার এ উক্তিতে স্ত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে তালাক দিয়ে দেয়। নবীজীর দু'মেয়ে একসাথে হয়ে গেলেন তালাকপ্রাপ্তা। বড় জামাতা মন্দ আচরণ করলো নবীজীর সাথে।
নবুয়তের সপ্তম সনে বনু হাশিম গোত্রের সঙ্গে চরম বিরোধিতায় উন্মত্ত হয়ে উঠে সম্মিলিত কুরাইশ গোত্র। নবীজী ও নওমুসলিমদের ওপর চালায় নির্মম অত্যাচার। মক্কায় নিজগৃহে বসবাস হয়ে পড়ে ঝুঁকিপূর্ণ। এই চরম শত্রুতায় নবী করীম [সা] অতিষ্ঠ হয়ে আবু তালিবসহ হাশিম গোত্রের সকলকে নিয়ে 'শিয়াবে আবু তালিবে' আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। শত্রুতা সৃষ্টিতে প্রধান ভূমিকা ছিল আবু লাহাব এবং আবু জাহেলের। শিয়াবে আবু তালিবে সুদীর্ঘ তিন বছর অবরুদ্ধ হয়ে থাকার সময় খাদ্যবস্ত্র এমন কি পানীয় সরবরাহের সকল পথ ধীরে ধীরে রুদ্ধ হয়ে আসে। আর এর মূলে ছিল আবু লাহাবের সীমাহীন শত্রুতা। অর্ধাহার অনাহারে জর্জরিত শিয়াবে আবু তালিবে অন্তরীণ বনু হাশিম গোত্রের

www.pathagar.com

নিকট কোন বিদেশি বণিককে যেতে দেয়া হত না। খাদ্যদ্রব্যাদি নিয়ে যদিও বা কেউ অগ্রসর হত, তাদের প্রলুব্ধ করে আবু লাহাব বলত, 'ওদের নিকট এমন উচ্চ মূল্য দাবী কর যেন ওরা ক্রয় করতে না পারে। বিক্রয় না হলে অবশ্য তোমাদের আর্থিক ক্ষতি হতে দেব না, সব জিম্মাদারী আমার।'

এ কথায় উৎসাহিত হয়ে বিদেশি বণিকেরা এমন উচ্চ মূল্য দাবী করত, যা ছিল শিয়াবে আবু তালিবে বন্দী নও মুসলিম অধিবাসীদের ক্রয় সীমার বাইরে। ফলে কিছু ক্রয় করতে না পেরে ইসলামের প্রথম যুগের এই সব মহান মুসলমানেরা রিক্ত হস্তে অর্ধমৃত সন্তান-সন্ততি ও প্রিয়জনদের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করতেন, নতুন করে ক্রন্দনের রোল পড়ে যেত গোটা উপত্যকায়। শিশুকণ্ঠের সেই যন্ত্রণাকাতর করুণ কাতরোক্তি শুনে গিরি গুহার বাইরে আনন্দ উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে উঠত আবু লাহাব আর আবু জাহেলের দল। ইবনে হিশামের বর্ণনা থেকে অবগত হওয়া যায়, প্রচলিত মূল্যেই সে সব দ্রব্য অবশেষে আবু লাহাব বিদেশি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ক্রয় করত। বিদেশিদেরও ধোকা দিত আবু লাহাব।

ভ্রাতুষ্পুত্রের বেদনায় চাচার মুখে হাসি, ভ্রাতুষ্পুত্রের অশ্রুতে চাচার আনন্দ- পৃথিবীতে বোধ হয় এমন অমানবিক উল্লাসের দৃষ্টান্ত আর দ্বিতীয়টি নেই।

আবু লাহাবের পাশবিক জীবনাচরণে এটা আমরা বার বার প্রত্যক্ষ করছি। নবী করীম [সা]-এর দুঃখ দেখে সে খুশি হয়েছে, সেই পবিত্র চোখে বেদনার অশ্রু দেখে সে আনন্দে নৃত্য করেছে। এ জঘন্য চরিত্রের মানুষটার মানসিকতা যে কত নীচ, একটি ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায় সুস্পষ্ট।

রাসূলুল্লাহ্ [সা]-এর শিশুপুত্র হযরত কাসেমের অকাল বিয়োগের পর ইন্তেকাল করলেন তাঁর আর একমাত্র পুত্র আবদুল্লাহ। এই ইন্তেকালের সংবাদ তখনো সাধারণ্যে অবগত হয়নি, পাশাপাশি ঘর হওয়ায় সর্বাগ্রে সংবাদ পেয়ে গেল আবু লাহাব। ভ্রাতুষ্পুত্রের এই চরমতম শোকের মুহূর্তে কোথায় চাচা সহানুভূতিশীল এবং সহমর্মী হবে, কিন্তু তা না হয়ে আনন্দের আতিশয্যে আবু লাহাব ছুটে এল বাইরে। এসে মিশল কুরাইশ জনতার সঙ্গে। সেখানে সে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করল, 'মুহাম্মাদ ধক্ষংস হয়ে গেল, সে এখন লেজকাটা, আজই তার একমাত্র বংশধর খতম হয়ে গেল। পৃথিবীতে তার নাম নেবার মত একটি লোকও আর রইল না।' এ উপলক্ষে সূরা কওসার অবতীর্ণ করে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে এক অলৌকিক শাক্তি ও সান্ত্বনা দান করেন।

অবিরাম অত্যচার ও নির্মম নির্যাতন, সহ্য করে রাসূল [সা] দিবারাত্র দীন ইসলামের দাওয়াত জোরদার করে তুলেছিলেন। বাড়িতে, মহল্লায়, শহরে বাজারে সর্বত্র তিনি দাওয়াতের কাজে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন। এ সময় আবু লাহাব

www.pathagar.com

তাঁর প্রতি যে দুর্ব্যবহার করেছিল, তা স্মরণ করে ঐতিহাসিকগণ শঙ্কিত ও শিহরিত হয়ে উঠে। প্রসিদ্ধ সাহাবী তারেক ইবনে আবদুল্লাহ আল মাহরেবী [রা] বলেন, 'আমি যুল মাজাজ বাজারে দেখলাম নবী করীম [সা] জনমন্ডলীকে সম্বোধন করে বলেছেন, হে লোক সকল! বল : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্–আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। যারা এক আল্লাহ্র বন্দেগী করবে তারা তাঁর পক্ষ হতে প্রভূত কল্যাণ লাভ করবে। রাসূল [সা] একথা বলছেন আর পেছন থেকে এক ব্যক্তি অনবরত তাঁকে পাথর মারছে, এমন কি পাথরের আঘাতে তাঁর পায়ের গোড়ালী রক্তে ভিজে লাল হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় পেছনের সে লোকটি সামনের লোকটিকে দেখিয়ে বলছে, 'হে লোক সকল! তোমরা কেউ এর কথায় কান দিওনা, কেননা ও মিথ্যাবাদী। জনমন্ডলীকে জিজ্ঞেস করা হল, এ লোকটি কে? লোকেরা বলল, বাধাদানকারী এ লোকটি মুহাম্মাদের চাচা আবু লাহাব।' [তিরমিযি]।

মুসনাদে আহমদ, বায়হাকির বিবরণ অনুযায়ী হযরত রবীয়া ইবনে আব্বাস দেয়লীর [রা] একটি হাদিসে অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, 'আমি অল্পবয়স্ক ছিলাম। আব্বার সাথে যখন আমি যুল মাজাজের বাজারে গেলাম, দেখলাম নবী করীম [সা] জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এরূপ বলছেন, 'হে লোক সকল! বল, আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নেই।' আর একটি লোক বলছে, 'এ লোকটি মিথ্যাবাদী। পৈতৃক ধর্ম হতে এ লোকটা বিচ্যুত।'

এই হচ্ছে আবু লাহাব! কেবল বাড়িতেই নয়; হাটে-বাজারে শহরে-নগরে অলিতে-গলিতে সর্বত্র রাসূল [সা]কে নির্যাতন ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ করার জন্যেই যেন তার জন্ম হয়েছিল।

অন্য একটি বর্ণনায় হযরত রবীয়া ইবনে আব্বাস দেয়লি বলেন, 'হজ্বের সময় মিনায় আমি নবী করীম [সা]কে দেখলাম; তিনি এক গোত্রের তাঁবুতে গমন করেছেন এবং বলছেন, 'হে অমুক বংশের লোকেরা! আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ্র রাসূল, আমি তোমাদের অহ্বান করছি, তোমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তার সঙ্গে অংশী করো না। তোমরা আমাকে সত্য নবী বলে মেনে নাও এবং আমাকে সমর্থন কর, যেন আমি সে কাজ সম্পূর্ণ করতে পারি, যে কাজের জন্য আল্লাহ্ আমাকে পাঠিয়েছেন।'

তাঁর পিছনে পিছনে আর এক ব্যক্তি আসে এবং বলতে থাকে, 'হে অমুক বংশের লোকেরা! এই লোকটি তোমাদের লাত, উজ্জার দিক হতে ফিরিয়ে নিয়ে এর নিজের আনা বিদায়াত ও গুমরাহির দিকে নিয়ে যেতে চায়। এই লোকটির কথা আদৌ শুনবে না এবং এর অনুসরণ করবে না। আমি [দেয়ল] আমার পিতার

www.pathagar.com

নিকট জিজ্ঞেস করলাম 'এ-লোকটি কে? তিনি বললেন, নবী করীম [সা]-এর চাচা আবুল লাহাব।'
আবু লাহাব ছিল ধন্যাঢ্য ব্যক্তি। সমকালীন কুরাইশদের যে চারজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি এক কিনতার [৮০ তোলা সের হিসেবে ৮ সের ১০ তোলা] স্বর্ণের মালিক ছিল, তাদের একজন ছিল সে। অঢেল ধনৈশ্বর্য ছাড়াও সে ছিল বহু সন্তান-সন্ততির গর্বিত জনক। ঐশ্বর্য এবং সন্তান এই দুয়েরই গর্বে সীমাতিরিক্ত অহংকারী হয়ে উঠেছিল সে। অর্থ-বল ও লোকবল উভয়ই তার ছিল। এ কারণেই সে নিজেকে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান এবং অভিজাত বলে মনে করত সব সময়।
ইবনে যায়েদ [রা] বলেন, 'একদিন আবু লাহাব রাসূল [সা]কে জিজ্ঞেস করল, আমি যদি তোমার প্রচারিত ধর্ম কবুল করি তা হলে কি পাব? উত্তরে নবী [সা] বললেন, সকল ঈমানদার মানুষ যা পাবে আপনিও তাই পাবেন। সে বলল, আমার জন্য অতিরিক্ত কোন মর্যাদার ব্যবস্থা থাকবে না? রাসূল [সা] উত্তর দিলেন, আপনি আর কি চান? সাথে সাথে সে উত্তর দিল 'তাব্বালাকা আলি হাযাদ্দীন....এ ধর্মের সর্বনাশ হোক; যাতে আমি অন্য লোকের সঙ্গে সমান হয়ে যাব।' –ইবনে জরীর।
লোকবল ও অর্থ সম্পদে আবু লাহাব কি পরিমাণ অহংকারী ও অন্ধ হয়ে উঠেছিল তার বিবরণ পাওয়া যায় একটি হাদিসে। মর্যাদাবান সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস [রা] বলেন–আবু লাহাব একদিন বলল, 'মুহাম্মাদ [সা] বলে যে, মৃত্যুর পর অমুক অমুক কাজ হবে। এরপর সে তার হাতের দিকে ঈশারা করে বলল, সেগুলোর মধ্যে থেকে এই হাতে একটিও আসেনি। অত:পর সে তার হাতকে লক্ষ্য করে বলল, তোমরা ধক্ষংস হও, মুহাম্মাদ [সা] যেসব বিষয় সংঘটিত হবার কথা বলে আমি সেগুলোর মধ্যে একটিও তোমাদের মধ্যে দেখি না।'
হযরত ইবনে আব্বাস [রা] বলেন, 'রাসূলুল্লাহ [সা] যখন স্বগোত্রকে আল্লাহ্‌র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করেন, আবু লাহাব এ কথাও বলেছিলেন, 'আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা যদি সত্যই হয় তবে আমার কাছে ঢের অর্থ ও লোকবল আছে। এ গুলির বিনিময়ে আমি আত্মরক্ষা করব।'
আবু লাহাবের সারা জীবনের অহংকারী আচারণ এবং দম্ভোক্তির ভয়ঙ্কর পরিণাম ঘোষণা করে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে অবতীর্ণ হল 'সূরা লাহাব'। হাত দিয়েই সবকিছু রোধ করতে চেয়েছিল সে, এই পরিপ্রেক্ষিতে সূরা লাহাবে বলা হল, 'আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধক্ষংস হোক।' সে তার সম্পদ এবং সন্তানাদির গর্ব করেছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে নাজিল হল, 'কারণ কাজে আসেনি তার ধন সম্পদ

www.pathagar.com

এবং সে যা উপার্জন করেছে।' শেষ পর্যন্ত সে ধক্ষংস হয়ে লেলিহান অগ্নি-শিখায় প্রবেশ করেছে এবং তার উপার্জনও তার কোন কাজে আসেনি।
এখানে উপার্জন বলতে কেবল ধন সম্পদ নয়, সন্তান সন্ততিও। নবী করীম [সা] সন্তানকেও পিতার উপার্জন বলেছেন।
সকল অত্যাচারী জালিমের মর্মন্তুদ পরিণতির মত ভয়ঙ্কর এবং বিভীষিকাময় পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল অহংকারী আবু লাহাবকে। তার যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুতে নির্মমভাবে বর্ণে বর্ণে সত্য হয়ে উঠেছিল আল কুরআনের ঘোষণা।
সূরা লাহাব অবতীর্ণ হবার সাত আট বছরের ব্যবধানেই শুরু হয়ে গেল হক এবং বাতিলের সম্মুখ যুদ্ধ। মুসলমান এবং মুশরিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব– বদরের মহাসমর। এ যুদ্ধ শুরু হবার কয়েকদিন পূর্বে হযরত আব্বাসের [রা] ভগ্নি আতিকা একটি দু:স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নটি দেখার পর থেকে তিনি ভীষণ আতঙ্কিত পড়েন। স্বপ্নের মধ্যে তিনি দেখেন, জনৈক উষ্ট্রারোহী সবাইকে সম্বোধন করে বলছেন, হে প্রতারক ও বেওফার দল! তিনদিনের মধ্যে বধ্যভূমির দিকে অগ্রসর হও। অত:পর তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন, তারা তাঁর অনুসরণ করল। এরপর আতিকা উষ্ট্রটিকে সেই আরোহীসহ প্রথমে কাবা শরীফের ওপরে এবং পরে জাবালে কুবায়েসের শীর্ষদেশে দেখতে পেলেন। উষ্ট্রারোহী উভয় স্থানেই পূর্বের কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করে বললেন, প্রতারক ও বেওফার দল! তিনদিনের মধ্যে বধ্যভূমির দিকে অগ্রসর হও। এরপর একখন্ড বৃহদায়তন প্রস্তর পর্বতের শীর্ষদেশ থেকে গড়িয়ে দিলেন তিনি, পাদদেশে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হলে গেল সেটি এবং প্রতিটি খন্ড মক্কার প্রতিটি গৃহের উপর পতিত হয়। আতিকা স্বপ্নটি সভয়ে ভ্রাতা হযরত আব্বাসের [রা] নিকট বর্ণনা করলেন এবং গোপনীয়তা রক্ষা করতে বললেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কুরাইশ নেতৃবৃন্দ স্বপ্নের বিষয়টি আনুপূর্বিক অবগত হয়ে গেল। এ বিষয়ে ভীত সন্ত্রস্ত কুরাইশরা পরামর্শ সভায় বসে গেল 'দারুন নাদওয়ায়'।
ঠিক এর তিনদিন পর এল আবু সুফিয়ান কর্তৃক প্রেরিত দূত যমযম। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী উটের নাক কান কেটে এবং পরিধানের বসন কামিজ ছিন্ন করে সে ঘোষণা করল, হযরত মুহাম্মাদ [সা] মদীনা থেকে আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা লুণ্ঠন করার জন্যে যুদ্ধসাজে বিরাট বাহিনী নিয়ে দ্রুত ধেয়ে আসছে। নিজেদের সম্পদ রক্ষা করতে হলে এখনই যেন কুরাইশরা রণসাজে সজ্জিত হয়ে যায়। এর পরপরই আকাশ বাতাস মুখরিত করে বেজে উঠল বদর যুদ্ধের রণ দামামা। স্থির হল পরিবারের দু'জন কুরাইশের মধ্যে অন্তত একজনকে যুদ্ধে যোগদান করতেই হবে। নেতৃবৃন্দের অনেকেই যুদ্ধে যোগদান করতে ইতস্তত

www.pathagar.com

করছিল কিন্তু চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত যেতে হল সকলকেই। একমাত্র আবু লাহাব গেল না। আতিকার স্বপ্নকে সে মনে প্রাণে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল, তার বিশ্বাস হয়েছিল যুদ্ধে গেলে মৃত্যু অনিবার্য। তাই অতি কৃপণ লোকটি বহু অর্থ ত্যাগের বিনিময়ে আ'স বিন হিশামকে যুদ্ধে প্রেরণ করে। আ'স বিন হিশাম একবার আবু লাহাবের নিকট হতে চার হাজার দিরহাম ঋণ গ্রহণ করে তারপর সে দেউলিয়া হয়ে যায়। ঋণ পরিশোধের মত কোনকিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না তার। বদর যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলে পলায়নপর সুযোগ সন্ধানী আবু লাহাব তাকে বলল, 'আমার হয়ে যুদ্ধ গেলে তোমার চার হাজার দিরহাম ঋণ আমি মওকুফ করে দেব।' দেউলিয়া আ'স জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঋণ শোধ করতে সম্মত হয়ে আবু লাহাবের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করল।

কিন্তু গৃহের নিরাপদ আশ্রয়ে বন্দী হয়ে থাকলেই কি মহান বিচারকের বিচার থেকে মুক্তি পাওয়া যায়? বদর যুদ্ধের সমাপ্তির পর মক্কায় ফিরে আবু লাহাবকে পরাজিত কুরাইশদের দুরাবস্থার বর্ণনা দিচ্ছিল আবু সুফিয়ান। সেখানে উপস্থিত ছিলেন হযরত আব্বাস [রা]-এর পত্নী উম্মূল ফজল [রা] এবং তাঁদের গোলাম আবু রাফে। এরা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সংগোপনে। বর্ণনার কোন একটি অংশ [স্বল্প সংখ্যক মুসলিমের কাছে বিশাল কোরাইশ বাহিনীর পরাজয় প্রসঙ্গে] শ্রবণ করে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে আবু রাফে বলে উঠেন, তাঁরা ফেরেশতা। এ মন্তব্যে ইসলামের প্রতি সমর্থনের গন্ধ পেয়ে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে আবু লাহাব। সে আবু রাফেকে সজোরে চড় মারে। দুর্বল আবু রাফে সহ্য করতে না পেরে মাটিতে পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের উপর চড়ে বসে সে। উম্মূল ফজলের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিল এ দৃশ্য। তিনি একটি কাঠের টুকরো এনে সজোরে আঘাত হানলেন আবু লাহাবের উদ্ধত মস্তকে। রীতিমত জখম ও আহত হল আবু লাহাব। এভাবেই কেটে গেল কয়েকদিন।

বদর যুদ্ধের ঠিক সাতদিন পর অবশেষে সেই মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হল রাসূল বিরোধী আবু লাহাব। ভয়ঙ্কর ধরনের উৎকট প্লেগ দেখা দিল তার গলদেশে। সমগ্র কণ্ঠনালী এক ধরনের মারাত্মক ফুসকুঁড়িতে ছেয়ে গেল। গলদেশ ফুলে একাকার, খাওয়া-দাওয়া বন্ধ। দুই হাত এবং অর্থ বিলিয়ে অহংকারী আবু লাহাব সবকিছু ঠেকাতে চেয়েছিল কিন্তু সেই হাত কোন কাজে এল না। শক্তিশালী সেই হাত দু'টি নিসাড় হয়ে গেল ধীরে ধীরে। অর্থ সম্পদে এ রোগ দূর হল না।

যে সন্তানের গর্বে সে ছিল গর্বিত, সেই সন্তানেরাই তাকে ঘৃণা ভরে নির্জন প্রান্তরে ফেলে চলে গেল। যে ধরনের প্লেগে আক্রান্ত হয়েছিল অবু লাহাব, সবার ধারণা হয়েছিল তা অত্যন্ত সংক্রামক, মারাত্মক পাপী না হলে এ ধরনের প্লেগে

www.pathagar.com

আক্রান্ত হয় না কেউ। সুতরাং সন্তানেরা কেউ পরিত্যাক্ত পিতার নিকটবর্তী হলো না। অবশেষে অনাহারে যন্ত্রণায় তিলে তিলে নি:শেষ আবু লাহাবের কাতরোক্তিও স্তব্ধ হয়ে গেল একদিন। মৃত্যুর পরও কেউ এল না তাকে স্পর্শ করতে। তিনদিন পড়ে থাকল সেখানে। বাতাসে সমগ্র এলাকা ভীষণভাবে দুর্গন্ধযুক্ত হল। কয়েকজন হাবশী কৃতদাস নিয়োগ করা হলো তার লাশ গুম করতে। তারা কিছু দূরে একটি গর্ত খুঁড়ল এবং বেশ কিছু দূরত্ব বজায় রেখে সুদীর্ঘ কাঠখন্ডের সাহায্যে তার গলিত মৃতদেহ ঠেলে গর্তে ফেলে দিয়ে কোনক্রমে মাটি চাপা দিল।

অন্য এক বর্ণনায় আছে পরিবার পরিজন পরিত্যাক্ত অবস্থায় সে তার নিজের ঘরেই মারা যায়। তিনদিন পর গলিত লাশ সমাহিত হয়। এভাবেই অত্যাচারী আবু লাহাবের সমূহ অহংকারের পরিসমাপ্তি ঘটে।

নবী ও তাঁর পরিবারকে কষ্ট দেয়া আবু লাহাবপত্নী উম্মে জামিলা মারা গেল পাহাড় থেকে কাঠের গুড়ি পিঠে করে আনার সময় গলায় ফাঁস পড়ে।

আবু লাহাবের বড় ছেলে উতবা; যে নবী কন্যাকে তালাক দিয়ে নবীজির প্রতি কটুক্তি করেছিল, সে বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে বিদেশ যাওয়ার সময় বাঘের খাদ্যে পরিণত হলো। বাঘ তার বুক চিরে কলজে-গুরদা সব খেয়ে হাড্ডি-কঙ্কাল মরুভূমিতে ফেলে রেখে যায়। #

সহায়ক গ্রন্থ :

১. তাফহীমুল কুরআন।
২. তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন।
৩. সহী আল বুখারী।

www.pathagar.com

আমার নবী

ফজলুল হক তুহিন

পৃথিবী যেদিন হয়ে যাবে ওলট পালট
আকাশ তরল তামা
তারারা বিক্ষিপ্ত হয়ে ভেঙে যাবে
নদী সমুদ্রে আগুন যাবে ধরে
শিঙ্গার অবাক ফুঁয়ে কবরের মানুষেরা
জেগে উঠে ছুটবে হাশরে
জ্বলবে মাথার কাছে সূর্য
পিপাসায় ফেটে যাবে সুখবুক
সবাই ছুটবে শুধু, ডানে বামে
স্বজন পর্যন্ত চিনবে না মুখ
খুঁজতে খুঁজতে আমি ছায়াতলে
পেয়ে যাবো নিশ্চয় আমার নবী
পাপীতাপী এই কবি পুণ্যের সঞ্চয় নিয়ে
তাঁর চরণে ঢালবে সবি।

বিজয়ের কোলাহল

রফিক রইচ

প্রচন্ড প্রতিকূলতায় দ্বীনের পূর্ণতা এনে,
ঝলমলে আলোর ফোয়ারায় ভরে দিলে,
অন্ধকারের অলিগলি।

দিকহারা সবহারা মানুষেরা পায় দিকের ঠিকানা,
অনবদ্য গন্তব্যের ঠিকানা।

www.pathagar.com

অরাজকতা, অবিচার, ব্যাভিচার, পাপাচারের,
নোংরা ডাস্টবিনে ফোটালে গোলাপ কলি।
প্রকট মানবতা ও মানবাধিকারের,
চেতনায় মগজ ভরাট করে,
বিচ্ছুরণ ঘটালে বিশ্বময়।
নিরাপত্তার বেস্টনিতে আবৃত হলো
মানুষের জীবন, জীবের জীবন।
চারিদিকে শুরু হয় শিল্পীত বাঁচার কোলাহল
বিজয়ের কোলাহল।

ঘুমের মাঝে

মনসুর আজিজ

প্রেম আবেগে নুনের দ্রবণ মেখে
অশ্রু যদি ঝর্ণা হয়ে নামে
একফোঁটা তার ধরার জন্য মাটি
ব্যস্ত ব্যাকুল থাকে সে আনজামে।

মাতাল ঝড়ে সব যদি হয় শেষ
কার আকুতি তসবি দানার মতো
রাতের শেষে শিউলি ফুলের মালা
চারিদিকে বিলায় শতো শতো।
বৃক্ষলতা হাজার রূপে সাজে
তোমার ছোঁয়া মাখবে বলে তারা
একপলকও যদি ফিরে চাও
আকাশ সাজে তাইতো নিরবধি।

আমি শুধু নাদান মানুষ আজো
বুঝিনি তার একটি কথার মানে
মধ্যরাতে নিমগ্ন ঘুমের মাঝে
নবী আমায় ডাকছে কানে কানে।

www.pathagar.com

আর কোনো পথ নেই

নাজমা ফেরদৌসী

নিজের সুখী জীবনের স্বপ্ন থাকে মানুষের রাত্রি-দিবার
আর তিনি স্বপ্ন দেখেছেন অন্যের দুখ মেটাবার।
দিন দুপুরের মরুরোদে হায় কি প্রচন্ড তাপ
আবার রাত নেমে এলে কী আঁধার চাপ চাপ
সে বিরাণ মরুপথে হেঁটে সত্যের ডাক দিতে
রাত্রি দিন যাঁর কোনো ক্লান্তি ছিল না !

সত্যকে উচ্চকিত করার প্রয়াসে
মিথ্যার জাহিলিয়ার আঁধার ঘুচাতে
অন্যের কষ্ট সরাতে
রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]
কত কষ্ট মেনে নিয়েছেন অনায়াসে!
দিনান্তের পালাবদলে এবং
নিভৃত রাতের কত যে প্রহর কেটেছে জাগরণে
কেবল্ই মানুষের কল্যাণ কামনায়
মানুষের দুখ সারাতে তাঁর অনুবর্তী হওয়া ছাড়া
সার্বজনীন আর কোনো পথ নেই অবশেষে।

তোমার জন্য নয়

আবুল খায়ের মাহবুব

এরপর ধীরে ধীরে জীবন কেটে যায়
তোমাকে কাছ থেকে দেখা
এবং দেখে দেখে জীবন গড়া
সবকিছু শরৎ কালের মতো
চুপিসারে কাউকে কিছু না বলে উবে যায়।
এখন বুঝি তোমার তরঙ্গ মুখরিত জীবনে
এতো নারী কেন এসেছিল!

www.pathagar.com

এসেছিল তোমার জন্য নয়, আমাদের জন্য,
অনন্তকালের আমাদের জন্য।
আমাদের জীবনে চপলা আসবে,
আসবে টইটম্বুর যৌবনা,
আসবে অন্তঃসার ফল্গুধারার মতো মুখরা রমনী।

আসবে ফলভারে নতমুখ, তুষ্টা মমতাময়ী।
আসবে হেমন্তের মতো, উম উম স্নিগ্ধ জায়া,
আসবে শীতের কুয়াশা ঢাকা
রাতের কম্বলের মতো স্নেহমাখা কায়া।

আসবে শান্ত সরোবরে প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো
অতুলনীয়া পতিপ্রাণা, আসবে বিথীর ডালি হাতে
বয়োবৃদ্ধা সঙ্গীনী সহোদরা। আসবে স্বামীহারা,
স্বজনহারা স্নেহ-সোহাগিনী জননী।
এদের সাথে আমরা ঘর বাঁধবো,
বাঁধবো কি বাবুই পাখির মতো?
অথবা চড়ুই পাখির মতো।

ঘর সবাই বাঁধে
কেউ কেউ রচনাও করে।
সে সবের দীক্ষা দেয়ার জন্যই
তোমার এতো আয়োজন
সবই আমাদের জীবনকে
স্বস্তিময় করার জন্য।

তুমিই পথ তুমিই পাথেয়

ইবনে আবদুর রহমান

শতবর্ষের আরাধ্য যে ভাবনার জগত-
আমাকে আচ্ছন্ন রাখে;
যে ধ্যান ও জ্ঞানের অন্বেষায়

www.pathagar.com

আমি সর্বদা উৎপীড়িত, উৎকণ্ঠিত;
যে অজানা গন্তব্যপানে ছুটে চলেছি-
বৈশাখী ঝড়ের মত
অন্ধ-জন্মান্ধের মত
সবই আলেয়া, সবই আলেয়া।

এ জীবনের পরম ক্ষণে
হে রাসূল!
তুমিই পথ, তুমিই পাথেয়।

হে রাসুল [সা]

জালাল উদ্দিন ওমর

হে রাসুল, দেখিনি তোমাকে কোনদিন
তবু, ভালবাসি তোমাকে প্রতিদিন।

আল্লাহর কাছে তুমি অতি প্রিয়
আমরাও হতে চাই তোমার প্রিয়
শেষ বিচারের দিনে তুমি
আমাদেরকে সাথে নিও

মানবজাতির সুখের জন্য
ব্যস্ত ছিলে দিনরাত্রি
তোমার জন্য বিলিয়ে দেবো
আমার ছোট্ট জীবনখানি

সত্য কথা বলতে গিয়ে রক্ত দিয়েছো তুমি
তোমার কাছে বিশ্ববাসী আছে চির ঋণী

দুষ্ট লোকে মন্দ কাজে
তোমায় দিল ব্যথা
তবু তুমি তাদেরকে
করে দিছ ক্ষমা

www.pathagar.com

হৃদয় মাঝে আছো বেঁচে
বাঁচবে তুমি চিরদিন
তোমায় মোরা ভালবাসি
ভালবাসবো প্রতিদিন।

আলোর দিশারী

সাবের রাহী

সেদিন পৃথিবীর সবকিছু যেন স্তব্ধ হয়ে
অপেক্ষা করছিল, 'তুমি আসবে বলে'
স্বর্গের লাখো কর্মীরাও ব্যস্ত ছিল
মা আমিনাকে ঘিরে বাবা আব্দুলার
ঘর গোছানোর কাজে।

তোমার অপেক্ষায় থেমে যায় বসন্তের বাতাস
ফুলের রঙ মুছে যাবে বলে
ভ্রমর-প্রজাপতিরাও বসেনি ফুলে
থেমে যায় পাখিদের কোলাহল
সময়ের সব গতি।
আরব মরুতে স্রষ্টার আদেশে
বারই রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার
মহাপবিত্রতায় অমোঘ সময়ের হাত ধরে
তুমি এলে এক উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে
আকাশে-বাতাসে বেজে উঠে
তোমার আগমন ধক্ষনি।

আঁধার ধরায় তুমি প্রতিষ্ঠিত করলে
এক আল্লাহর সত্যের বানী পবিত্র আল্ কুরআন
খুলে দিলে পথহারা মানবের মুক্তির পথ
মুখরিত হলো পৃথিবী, পাখিদের গান শান্তির হাওয়া

হে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]
তোমাকে হাজার কোটি সালাম।

www.pathagar.com

প্রিয়নবী

মিনহাজুল ইসলাম মোহাম্মদ মাছুম

যাঁর নামে, আলোকিত হয়েছে এই জগত
যিনি করবেন পাপী-তাপীর কাঙ্খিত শাফায়াত।
যাঁর প্রশংসা করেন তাবৎ সৃষ্টি কুল কায়েনাত
ধরায় এসে যিনি বিনাশে, উজ্জা-লাত-মানাত।
যিনি অন্ধকারের পথ পেরিয়ে মুক্ত আলোর ভুবনে
যত অসত্য ভয়ে কেঁপে উঠেছিল সেই শুভ লগনে।

মিথ্যাকে ধক্ষংস সাধন, করলেন প্রতিষ্ঠিত সত্যকে
সেই থেকে মহাশত্রু শয়তান পড়েছে মহাবিপাকে।
আমরা তাঁরই উম্মত, সে তো প্রিয়তম মোদের নবী
তাঁরই স্মরণ গুন-গান মোরা ক্ষণে ক্ষণে জপি।
মুহাম্মাদ [সা] তাঁর নাম, জানাই দরূদ ও সালাম
আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

www.pathagar.com

মহানবীর [সা] মৌখিক দাওয়াতের ভাষা শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ ও নান্দনিকতা

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

মহানবী হযরত মুহাম্মাদকে [সা] সর্বকালের মহামানব এবং শ্রেষ্ঠ আদর্শের প্রতীক হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি দিকই মানুষের জন্য গবেষণার বিষয়। শ্রেষ্ঠত্বের উপমা হিসেবে তাঁকেই আমরা পেয়ে থাকি। বাগ্মীসত্তা বা সুস্পষ্ট যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য প্রদানের যোগ্যতা নবুয়তের একটি অপরিহার্য গুণ। মানব সমাজের হিদায়াত ও দিক-নির্দেশের জন্য যে সকল নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন, তাঁদিগকে বিশুদ্ধ ভাষা ও আলংকারিক বর্ণনা শক্তিতে বিভূষিত করা আল্লাহ্ তা'আলার কাম্যও ছিল, যাতে তাঁরা রাব্বুল আলামীনের বাণী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে পারেন এবং স্ব-স্ব উম্মতকে পথনির্দেশ দান করার পদমর্যাদাগত দায়িত্ব সম্পন্ন করতে সমর্থ হন। বক্তৃতায় ভাষার বিশুদ্ধতা ও বর্ণনাধারার অলংকরণে আরবদের স্থান ছিল শীর্ষে। পারস্য ও গ্রীসের চিন্তাধারা ও জ্ঞান-সাধনার উচ্চস্থানের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাদিগকে ভাষার বিশুদ্ধতা ও বর্ণনার আলংকারিক প্রয়োগের গুণাবলীতে ভূষিত করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ [সা] আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধভাষী ছিলেন। কেননা তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশোদ্ভূত এবং প্রতিপালিত হয়েছিলেন বানূ সাদ গোত্রে। ফাসাহাত ও বালাগাত তথা বিশুদ্ধ ভাষা ও আলংকারিক বর্ণনা শক্তিতেও এই দুই বংশ ছিল সমগ্র আরবের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। তাদের ভাষা সকলের জন্য নমুনা স্বরূপ ছিল। কুরায়শদের ভাষাকেই আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট বিশুদ্ধ বর্ণনারূপে অভিহিত করেছেন। আরবের ভাষাবিদ ও কবিসাহিত্যিকগণ রাসূলুল্লাহ [সা]-এর ভাষার বিশুদ্ধতা ও সাহিত্যালংকরণের ভূয়সী প্রশংসা করেছে এবং আল কুরআনের পর তাঁরই ভাষাকে আরবি সাহিত্যের বিশুদ্ধতম ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। মহানবীর [সা] ভাষাশৈলী ফাসাহত ও বালাগাত এবং অনবদ্য বর্ণনারীতি ছিল

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ দান। তিনি সাবলীল ভাষায় অতি সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়ও মনোজ্ঞ করে তুলতেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে আরবের সকল গোত্রের ভাষা ও বর্ণনারীতি সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছিলেন। আল-জাহিজ লিখেছেন যে, রাসূলুল্লাহকে [সা] কখনও কোনও শব্দের স্থানে কিংবা কোনও ভাবের অভিব্যক্তিকে কষ্টক্লেশ করতে হয়নি। তিনি বলতেন, 'আমি সর্বদা কষ্টকল্প ও কৃত্রিমতাপূর্ণ বক্তব্য পরিহার করে থাকি; অতিরঞ্জনকারী বাচাল প্রকৃতির লোক আমার নিকট পছন্দনীয় নয়।' সাহাবা কিরাম সর্বদা তাঁর বক্তব্যে ভাষার বিশুদ্ধতা ও নিষ্ঠা প্রতিভাত হতে দেখে মুগ্ধ হতেন। তাঁর ভাষা কখনও রূঢ় হত না। আল্লাহ তা'আলার সাহায্য তিনি সর্বদা লাভ করতেন।

আল-জাহিজ রাসূলুল্লাহর [সা] অনেকগুলি জাওয়ামিউল কালিম অর্থাৎ ব্যাপক ভাবপ্রকাশক সংক্ষিপ্ত বাক্য ও বক্তৃতা উদ্ধৃত করে তাঁর ফাসাহাত ও বালাগাতের মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা করেছেন। রাসূলুল্লাহর [সা] বাচনভঙ্গি সম্পর্কে তিনি বলেন যে, তাঁর কথা ও বাণী সংক্ষিপ্ত শব্দ সম্বলিত হওয়া সত্ত্বেও অধিক সমৃদ্ধ ও অর্থবহ হত। তিনি বাকচাতুর্য ও কপটভাষণ হতে দূরে থাকতেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর বাণী আল্লাহ্ তা'আলার এই নির্দেশের বাস্তব ব্যাখ্যা ছিল, 'হে রাসূল! আপনি বলে দিন যে, আমি মিথ্যা ভাষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।' প্রয়োজন হলে তিনি বক্তব্য বিশদ বর্ণনা করতেন, অন্যথায় সুস্পষ্টভাবে অল্প কথায় বক্তব্য প্রকাশ করতেন। তাঁর বক্তব্যে কখনও অপ্রচলিত দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহৃত হত না এবং তিনি অমার্জিত শব্দও প্রয়োগ করতেন না। কথা বললে মনে হত যেন জ্ঞানের প্রস্রবণ উৎসারিত হচ্ছে। তাঁর বাকধারা আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যধন্য ছিল। তাঁর অনন্যসাধারণ অমর বাণী হতে প্রতীয়মান হয়, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রিয় ও সমাদৃত ছিলেন। এতে যেমন ছিল ভাবগাম্ভীর্য, তেমনি ছিল মাধুর্য। শব্দ কম হত, অথচ মর্ম সহজ ও সর্বজনবোধগম্য। তাঁর কথা এত স্পষ্ট ও সাধারণের পক্ষে বোধগম্য হত যে, তা পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হত না। তথাপি যদি কেউ পুনরাবৃত্তির আবেদন জানাত, তবে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করতেন না। তাঁর কথায় কখনও ত্রুটিবিচ্যুতি পরিলক্ষিত হত না। তাঁর বক্তব্য হত যুক্তিপূর্ণ ও প্রমাণসিদ্ধ। যুক্তিতর্কে কেউ কখনও তাঁকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়নি। তাঁর দীর্ঘ ভাষণেও বাক্য সারগর্ভ ও সংক্ষিপ্ত হত। তিনি সত্য ও সঠিক তথ্যপূর্ণ কথাই বলতেন। শব্দের মারপ্যাঁচ এবং অপরের ছিদ্রান্বেষণ হতে সর্বদাই বিরত থাকতেন। তিনি অত্যন্ত শ্লথভাবে কিংবা দ্রুতভাবে তাড়াহুড়া করে কথা বলতেন না। তিনি অহেতুক কথা দীর্ঘ করতেন না এবং কখনও সুস্পষ্ট ভাষায় ভাব প্রকাশে অসমর্থ হতেন না। পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করে জনগণের জন্য কল্যাণকর ও মহোত্তম

www.pathagar.com

আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বলিত বক্তব্য উপস্থাপনায় তাঁর অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী বাগ্মী পরিলক্ষিত হয় না। তাঁর বাণীসমূহ ছিল প্রেরণাদায়ক ও প্রভাব বিস্তারকারী। বর্ণনাধারা ছিল সহজ, মনোজ্ঞ; ভাষণ বিশুদ্ধ শব্দ সম্বলিত এবং উদ্দেশ্য মহান। রাসূলুল্লাহর [সা] যুগের কবি সাহিত্যিক ও বাগ্মীগণ প্রায়শই বলতেন, তিনি যদি অন্য কোনও গুণে বিভূষিত নাও হতেন, তবুও তাৎক্ষণিক তাঁর ভাষণের উচ্চতম মানের ভাষাসৌকর্য, ফাসাহাত ও বালাগাতের মু'জিযাই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের জন্য যথেষ্ট ছিল। সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যাব [রা]-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, সাহিত্যালংকারে সমৃদ্ধ সর্বশ্রেষ্ঠ শুদ্ধভাষী কে? তিনি উত্তরে বলেছিলেন: রাসূলুল্লাহ [সা]। মুহাম্মাদ ইবন সাল্লাম, ইউনুস ইবন হাবীবের নিম্নোক্ত উক্তি উদ্ধৃত করেন: রাসূলুল্লাহর [সা] ভাষণে ফাসাহাত ও বালাগাতের যে উচ্চতম নমুনা আমরা দেখতে পাই, তা অন্য কোনও বক্তার বক্তব্যে পরিলক্ষিত হয় না।

একবার আবূ বাকর সিদ্দীক [রা] রাসূলুল্লাহর [সা] নিকট আরজ করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আরব দেশগুলিতে বহু পরিভ্রমণ করেছি; অসংখ্য আরবি সাহিত্যিকের বক্তব্য শুনেছি কিন্তু আপনার অপেক্ষা সেরা অলংকারযুক্ত বিশুদ্ধ শব্দ ও বাক্য ব্যবহারকারী বক্তা, ফাসীহ ও বালীগ আর কাউকেও দেখিনি। ফাসাহাত ও বালাগাতের এই সর্বোচ্চ স্থান আপনি কি করে অর্জন করলেন? তিনি উত্তর দিলেন: আমাকে আমার প্রতিপালক আদব শিক্ষা দিয়েছেন এবং সর্ব্বোত্তমভাবেই তিনি আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ [সা] বক্তার মার্জিত বর্ণনা পছন্দ করতেন। একবার হযরত আব্বাস [রা] তাঁকে জিজ্ঞাস করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের সৌন্দর্য কিসে নিহিত? তিনি উত্তরে বললেন: মানুষের সৌন্দর্য ও মাধুর্য তার রচনা বা ভাষায় নিহিত।

তিনি এমন কোন কথা বলতেন না, যা গাম্ভীর্যের পরিপন্থী। তিনি বিকট হাস্যে বক্তৃতা করতে নিষেধ করতেন। তিনি বলতেন, আল্লাহ তা'আলা ঐসব বক্তাকে অপছন্দ করেন, যারা বক্তৃতাকালে এভাবে রচনা সঞ্চালিত করে, যেন কোন গরু চর্বিত চর্বন করছে। উম্মুলমুমিনীন হযরত আয়েশা [রা] হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ [সা] অশিক্ষিত লোকদের ন্যায় তাড়াহুড়া করে কথা বলতেন না; বরং তাঁর বর্ণনাধারা হত সম্পূর্ণ পরিস্কার ও স্পষ্ট। শ্রোতাগণ অতিসহজেই তাঁর কথা মুখস্ত করে নিতে পারত। বুখারীর রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ [সা] যখন আলোচনা করতেন, তখন স্বীয় বক্তব্য তিনি তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন, যাতে শ্রোতাগণ তাঁর বাণী ভালভাবে বুঝে মুখস্থ করতে সক্ষম হয়। কোনও ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তাঁর বক্তব্যে শব্দসমূহ গণনা করতেও সক্ষম হত। তাঁর বক্তব্য হত স্বতস্ফূর্ত, বর্ণনাধারা প্রাঞ্জল এবং কথার মধ্যে দক্ষতা প্রতিভাত হত।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ [সা] বলেন, আল্লাহ তা'আলা ঘূর্ণিবায়ু দ্বারা গাযওয়া আহযাবে বা পরিখা যুদ্ধে আমাকে সাহায্য ও বিজয় দান করেছেন এবং তিনি আমাকে জাওয়ামিউলকালিম অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক ও সারগর্ভ বর্ণনারীতিও দান করেছেন। আল-জাহিজ বর্ণনা করেন যে, সাহাবা কিরাম গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি স্থানে রাসূলুল্লাহর [সা] দীর্ঘ ভাষণও শুনেছেন কিন্তু নিছক কথা বাড়ানো বা দীর্ঘ ভাষণের দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য তিনি কখনও ঐ দীর্ঘ বক্তব্য রাখেননি। অর্থ ও মর্ম ব্যাপক অধিক হলেই তবে শব্দের আধিক্য ঘটত, ফলে তিনি নিরর্থকভাবে স্বীয় ভাষণে কখনও অতিরিক্ত শব্দ প্রয়োগ করেননি। তিনি এও বলতেন যে, বর্ণনাশৈলীও এক প্রকার যাদু। সুতরাং তোমরা সালাত দীর্ঘায়িত কর কিন্তু ভাষণ সংক্ষিপ্ত করবে। আবুল হাসান আলমাদাইনী বর্ণনা করেন, একদিন হযরত আম্মার ইবন ইয়াসির [রা] সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন, শ্রোতাগণ তাঁকে আরও বক্তব্য রাখবার জন্য অনুরোধ করতে থাকলে তিনি বললেনঃ রাসূলুল্লাহ [সা] আমাদিগকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন সালাত দীর্ঘ করি এবং বক্তব্য সংক্ষেপ করি।

বক্তৃতায় শ্রুতিমধুর কণ্ঠের গুরুত্ব যথেষ্ট। আম্বিয়া ই কিরাম [আ]-এর মধ্যে হযরত দাউদকে [আ] ফাসলুল খিতাব বা মীমাংসাকারী বচনসহ সুমধুর কণ্ঠস্বর আল্লাহ তা'আলা দান করেছিলেন। রাসূলুল্লাহর [সা] কণ্ঠস্বর যেমন ছিল মধুর, তেমনি উদাত্ত। হযরত কাতাদা [রা] হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহকে [সা] সুন্দর দেহাবয়বের সাথে সুন্দর কণ্ঠস্বরও দান করা হয়েছিল। তাঁর কণ্ঠস্বর এত দূরে পৌছাত, যতদূরে আর কারও স্বর পৌছাত না। তিনি মিনাতে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, লোকেরা তা অনেক দূর দূরান্ত হতে শুনতে পেয়েছিল। হযরত উম্মে হানী [রা] হতে বর্ণিত আছে যে, অর্ধরজনীকালে যখন রাসূলুল্লাহ [সা] কাবাগৃহে আল কুরআন তিলাওয়াত করতেন, তখন আমরা আমাদের ঘরের ছাদ হতে তাঁর আওয়াজ শুনতে পেতাম। তিরমিযীর অন্য একটি রিওয়ায়েতে আছে যে, নবী করীম [সা] অধিকাংশ সময় নিরব থাকতেন এবং শুধু প্রয়োজন হলেই কথা বলতেন। কথা বলবার সময় প্রয়োজনবোধে হাত দ্বারাই ইশারা করতেন। বিস্ময় প্রকাশের সময় হাতের তালু উল্টিয়ে ইশারা করতেন। কথা বলার সময় ডান হাতের তালুকে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর ভিতর ভাগের সাথে মিলাতেন। অসন্তুষ্ট হলে পবিত্র মুখমন্ডল অন্যদিকে ফিরয়ে নিতেন। নীরবতা অবলম্বন করলে চোখ বুজে রাখতেন। তিনি হাসলে শুধু মুচকি হাসতেন। তখন মনে হত যেন মেঘ মেদুর শান্তি বিরাজ করছে।

www.pathagar.com

সাহিত্য সমালোচকগণ রাসূলুল্লাহর [সা] ফাসাহাত, বালাগাত এবং তাঁর বাণী ও ভাষণসমূহের সাহিত্যমান সম্পর্কে আলোচনা পর্যালোচনা করেছেন। তৎকালীন পরিবেশ পরিস্থিতি এবং তাঁর জীবনধারার উপর প্রভাব বিস্তারকারী সমুদয় কার্যকরণ ও সূত্র তাঁরা গভীরভাবে পর্যালোচনা করেছেন। তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আরবি ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যে কোন ন্যায়নিষ্ঠ বিজ্ঞলোকই একথা স্বীকার করতেন যে, আরবি ভাষায় আল কুরআনের শৈল্পিক সাহিত্যিক মান সর্কোচ্চ। এর পরই রাসূলুল্লাহ [সা]-এর বাণী ও ভাষণের স্থান। রাসূলুল্লাহ [সা] সর্বশ্রেষ্ঠ অলংকারময় বিশুদ্ধ ভাষাভাষী আরব হবার কারণ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, প্রথমত তিনি বানূ হাশিম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন এবং কুরায়শদের মধ্যে লালিত পালিত হন। দ্বিতীয়ত, তাঁর দুগ্ধপানকালীন শৈশবকাল অতিবাহিত হয়েছে বানূ সাদ ইবন বাকর বা বানূ হাওয়াযিন গোত্রে। আরবি সাহিত্যে ফাসাহাত ও বালাগাতে কুরায়শদের পরই তাদের স্থান স্বীকৃত ছিল। এছাড়া তাঁর মাতুল ছিলেন বানূ যুহরা এবং তাঁর জীবনসঙ্গিণী হযরত খাদীজাতুল কুবরা [রা] ছিলেন বানূ আসাদ গোত্রীয়া। এ সকল গোত্র আরবি ভাষা ও সাহিত্যে উচ্চতর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৃতীয়ত, আল্লাহ তা'আলার শেষ কিতাব আল কুরআন নাযিল হয় সুস্পষ্ট বিশুদ্ধ আরবি ভাষায়; যার অনবদ্য ভাষাশৈলী ও বর্ণনারীতির সামনে সকল প্রখ্যাত আরবি সাহিত্যিক তথা মানব ও জিন জাতি নতশির ছিল। এই সমুজ্জ্বল মহাগ্রন্থ কিতাবুমমুবীন এর অনন্য সাধারণ বর্ণনাশৈলীও রাসূলুল্লাহর [সা] বাচনশক্তিকে আরও উৎকর্ষমন্ডিত করেছে। তাঁর বাণীতে আল্লাহর বাণীর প্রভাব সুস্পষ্ট। চতুর্থ এবং প্রধান কারণ হল, রাসূলুল্লাহর [সা] মহোত্তম স্বভাব-প্রকৃতি, যা আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রকার মহান গুণাবলীতে বিভূষিত করেছিলেন। এ কারণেই তাঁর ফাসাহাত ও বালাগাত সমৃদ্ধ সাহিত্যালংকারপূর্ণ বাণী পরবর্তীকালীন বিদ্বান ও সাহিত্যিকদের আত্মার এবং মনের খাদ্যে পরিণত হয়। তাঁর বাণীসমূহ মুখস্ত করে আরবি সাহিত্যকে সুশোভিত করা হয়েছে। হাদীসসমূহের উদ্ধৃতি দ্বারা লেখকগণ তাঁদের রচনাকে অলংকৃত করেছেন। রাসূলুল্লাহর [সা] বাণী ও ভাষণসমূহ দ্বারা জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তিগণ যে উপকার লাভ করেছেন, তন্মধ্যে কয়েকটি হল: ফুকাহা ই কিরাম বা আইনবেত্তাগণ এর সাহায্যে ধর্মীয় সিদ্ধান্ত সমূহ উদ্ভাবন করেছেন; মুহাদ্দিসগণ তাঁর বাণীসমূহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন; সাহিত্যিক ও ভাষাবিদগণ পরিভাষা ও বাক্য বিন্যাস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছেন; অলংকারবিদগণ তাঁর বাণীকে উৎকৃষ্টতম নমুনা স্বরূপ গ্রহণ করেছেন এবং সাধারণ কবি সাহিত্যিকগণ ফাসাহাত ও বালাগাতের এক বিশাল

www.pathagar.com

ভান্ডার লাভ করেছেন। আল বাকিল্লানী লিখেছেন যে, আল কুরআনের মুজিযাসুলভ অলংকারশৈলী এবং রাসূলুল্লাহর [সা] অলংকারময় বিশুদ্ধ বাণীসমূহের মধ্যে যে শাব্দিক ও অর্থগত পার্থক্য বিদ্যমান, তা আরবি সাহিত্যের প্রতিটি শিক্ষার্থী অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারে।

রাসূলুল্লাহ [সা] মৌখিক দাওয়াত বা বক্তব্যের পদ্ধতি, উদ্দেশ্য ও রীতিনীতি সম্পর্কে এমন কতিপয় পরিবর্তন সাধন করেন যা প্রাচীণ আরব বক্তাগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। হামদ ও সানা বা আল্লাহর প্রশংসা এবং দরূদ ও সালামের মাধ্যমে বক্তব্যের সূচনা তিনিই প্রবর্তন করেন। একটি বর্ণনামতে বক্তব্যের শুরুতে হামদ ও সানার পর আম্মাবা'দ বা 'অত:পর' শব্দের প্রথম ব্যবহার তিনি করেন; যা পরবর্তীকালে মুসলিম উম্মাহর একটি সাধারণ রীতিতে পরিণত হয়। রাসূলুল্লাহর [সা] পূর্বে আরব বক্তাগণ নিছক ফাসাহাত ও বালাগাত প্রদর্শন অথবা নিজ গোত্রের স্তুতিগান কিংবা শত্রুপক্ষের নিন্দাবাদের জন্যই বক্তৃতার আশ্রয় গ্রহণ করতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ [সা] তাওহীদের প্রচার, সদুপদেশ দান, ন্যায়পরায়ণতা ও সৎকর্মের দাওয়াত, পারস্পরিক সহযোগিতা, আত্মসংশোধন, জিহাদের প্রতি উৎসাহ দান এবং মানবজাতির ইহকালীন ও পরকালীণ কল্যাণ এবং সাফল্যের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদাণ করতেন। ইবন আবদি রাববিহ বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহর [সা] ভাষণসমূহ ধারাবাহিক পাঠ করে দেখতে পাই যে, হামদ ও সানা, ইসতিগফার ও আল্লাহর প্রতি তাওয়াককুলজ্ঞাপক বাক্য দ্বারাই সর্বদা বক্তব্যের সূচনা হত। শুধুমাত্র দুই ঈদের খুতবাই তিনি তাকবীর দ্বারা আরম্ভ করতেন। অধিকাংশ ভাষণে তিনি আল্লাহভীতির উপদেশ দিতেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের ভাষণে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। যে সকল ভাষণে তাওহীদের শিক্ষা থাকত কিংবা জাহান্নাম হতে সতর্ক করা যার উদ্দেশ্য হত, সেসব বক্তৃতা অত্যন্ত তেজোদীপ্ত হত।

ভাষণদানকালে আরব আজমের এ শ্রেষ্ঠতম বক্তার সর্বাঙ্গে যে আকর্ষণীয় অবস্থার সৃষ্টি হত, তা সাহাবা কিরাম বিভিন্ন সময়ে বর্ণনা করেছেন। তেজোদীপ্ত ভাষণের সময় তাঁর চক্ষু রক্তিম হয়ে যেত, শব্দ গুরুগম্ভীর ও বলিষ্ঠ হত, পবিত্র মুখাবয়বে মাহাত্ম্য ফুটে উঠত, আবেগের প্রবলতায় অংগুলীসমূহ উত্তোলিত হতে থাকত এবং মনে হত, যেন ইসলামী সেনাদলকে জিহাদের জন্য হাতের ইশারায় উদ্বুদ্ধ করছেন। পবিত্র দেহ আন্দোলিত হত, হস্ত সঞ্চলনের সময় গ্রন্থি মটকানোর শব্দ শোনা যেত, বক্তৃতার মাঝে মাঝে হাত কখনও মুষ্টিবদ্ধ করতেন আবার কখনও তা খুলে ফেলতেন। আব্দুল্লাহ ইবন উমার [রা] রাসূলুল্লাহর [সা] একটি ভাষণে বাগ্মীসুলভ উদ্দীপনার চিত্রাংকন করতে গিয়ে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে [সা]

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহকে [সা] মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি যে, মহা প্রতাপশালী সৃষ্টিকর্তা আসমান যমীনকে মুষ্টিবদ্ধ করবেন, এ কথা বলে তিনি স্বীয় হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করতেন এবং কখনও খুলতে থাকেন। আমি দেখলাম, তিনি একবার ডানদিকে ঝুঁকছেন, আরেকবার বামদিকে ঝুঁকছেন। এমনকি তাঁর মিম্বরও এই কারণে আন্দোলিত হচ্ছিল। এ অবস্থা দৃষ্টে আমার আশংকা হচ্ছিল যে, মিম্বরটি যেন উল্টে না যায়। আককাদ স্বীয় গ্রন্থে লিখেছেন যে, যেহেতু ইসলামের প্রচার ও প্রসার ছিল রাসূলুল্লাহর [সা] মিশন ও দায়িত্ব, তাই বিশুদ্ধ ভাষা বর্ণনা ও বালাগাতই ছিল তাঁর ভাষণ ও বাণীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে বারবার এই বাক্য উচ্চারণ করছিলেন, 'আমি কি সঠিক ও সন্তোষজনকভাবে আল্লাহর বাণী প্রচার করেছি।'

আতিয়্যা আল আবরাশী লিখেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং রাসূলুল্লাহকে [সা] আরবের সকল গোত্রের ভাষা ও বাগধারা সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছিলেন। এ কারণেই তিনি প্রত্যেক গোত্রের লোকদের সঙ্গে তাদের বাকভঙ্গিতে কথা বলতে সক্ষম ছিলেন। তিনি মক্কার কুরায়শ, মদীনার আনসার এবং নাজদ ও হিজাযবাসীদের সঙ্গে যেই ভঙ্গিমায় ও বাগধারায় কথা বলতেন, এটি কাহ্তানী আরবদের সাথে তাঁর কথাবার্তা হতে ভিন্ন ছিল। সাহাবা ই কিরাম যখন বিস্ময়ের সাথে তাঁর ফাসাহাত ও বালাগাতের কারণ জিজ্ঞাসা করতেন, তখন তিনি বলতেন, আমার প্রতিপালক আমাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং তিনি আমার ভাষাতেই অর্থাৎ কুরাইশদের ভাষায় আল কুরআন নাযিল করেছেন।

রাসূলে করীম [সা] যখন জিহাদের ময়দানে মুজাহিদগণের সামনে ভাষণ দিতেন, তখন ধনুকের উপর ভর করতেন। কখনও আবার কোন কিছুতে ঠেস দেওয়া ছাড়াই ভাষণ দিতেন। অনেক সময় উটের ওপর সওয়ার হয়েও বক্তব্য রাখতেন। হিজরতের পর যখন তিনি মসজিদুন নববীতে বসে বিভিন্ন সময়ে মুসলমানদের সামনে বক্তব্য রাখা শুরু করেন, তখন তিনি একটি খেজুরকান্ডে ভর করতেন। মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সাহাবা ই কিরাম তাঁর জন্য একটি মিম্বর নির্মাণ করে দেন, যাতে সকলে তাঁকে দেখতে পায়। কখনও তিনি লাঠির ওপর ভর দিয়েও বক্তৃতা দিতেন। আল জাহিজ বর্ণনা করেন যে, এ লাঠিখানী খুলাফা ই রাশিদীনের নিকট হস্তান্তর হতে থাকে এবং তাঁরা এই সুন্নাত ই নববীর অনুসরণ করতে থাকেন। সর্বশেষ উমাইয়া খলীফা স্বীয় পরিণতি দেখে গোলামকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহর [সা] চাদর এবং লাঠি যেন কোথাও দাফন করে দেয় কিন্তু সে ওটি ক্ষমতাসীন আব্বাসীয় খলীফার নিকট পৌঁছে দেয়।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহর [সা] বাণী জাওয়ামিউল কালিম সম্পর্কে আল জাহিজ লিখেছেন যে, রাসূলুল্লাহর [সা] কতক বাণী এমন, যা তাঁর পূর্বে আর কোন আরবের মুখে উচ্চারিত হয়নি। তাঁর জাওয়ামিউল কালিম বাগধারা প্রবাদ বাক্যরূপে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের অংশে পরিণত হয়েছে। মুজাহিদদিগকে সম্বোধন করে তিনি বলেছেন, হে আল্লাহর অশ্বদল [অশ্বারোহী দল]! তোমরা সওয়ার হও। এ বাক্য তাঁর পূর্বে আর কেউ ব্যবহার করেনি। কিংবা 'এতে দুটি বকরীর শিং গুঁতোগুঁতি করে না' অর্থাৎ এ বিষয়টি বিবাদের নয়। যুদ্ধের প্রচন্ডতা সম্পর্কে এই বাক্যটিও সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহই [সা] ব্যবহার করেন, এখন তন্দুর উত্তপ্ত হয়েছে অর্থাৎ লড়াই প্রচন্ড রূপ ধারণ করেছে। তাঁর আরো কিছু জাওয়ামিউল কালিম উল্লেখ করা যায়। যেমন, 'আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পর বুদ্ধিমত্তার শিরোমণি হল মানুষের সন্তুষ্টি বিধান।' 'আমি কি তোমাদিগকে ব্যক্তির শ্রেষ্ঠতম ধনভান্ডারের কথা বলে দিব না? তা হল এমন সতীস্বাধী রমণী, যার প্রতি তাকালে স্বামীর হৃদয় আন্দোলিত হয় এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে সে তার ধন সম্পদ ও সম্মান সম্ভ্রম রক্ষা করে।' 'যে ব্যক্তির আত্মসম্মানবোধ আছে, সে কখনও ধক্ষংস হয় না।' 'তোমরা যদি পরস্পরের গোপন কথা জানতে, তাহলে একে অপরকে ঘৃণায় দাফন করত না।' 'যে ব্যক্তি স্বীয় পরিবার পরিজনের মধ্যে শান্তিতে বসবাস করে, শারীরিকভাবে সুস্থ থাকে এবং তার নিকট একদিনের খাদ্যও মওজুদ আছে, সে তো ঐ ব্যক্তির সমতুল্য যার কাছে দুনিয়া ও এর অন্ত র্গত সকল সম্পদ সঞ্চিত আছে'।

রাসূলুল্লাহর [সা] সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক ভাষণে স্বীয় নুবূওয়াতের ঘোষণা দিয়ে মক্কার কুরায়শ এবং আরব ও আজমবাসীকে সম্বোধন করে বলেছেন, কোনও কল্যাণের বাহক তার আপনজনদের সাথে মিথ্যা কথা বলেন না। যদি আমি সমগ্র মানুষের সাথেও মিথ্যা বলি তথাপি তোমাদের সাথে মিথ্যা বলি না, যদি সমগ্র মানুষকেও প্রতারিত করি, তবুও তোমাদের সাথে প্রতারণা করত পারি না। আল্লাহ শপথ! যিনি ব্যতীত আর কোনও ইলাহ নেই। আমি আল্লাহর রাসূল, তোমাদের নিকট বিশেষ করে এবং সাধারণভাবে সমগ্র মানুষের নিকট আমি প্রেরিত হয়েছি। আল্লাহর শপথ! তোমরা অবশ্যই ঠিক সেভাবে ইন্তিকাল করবে, যেভাবে তোমরা নিদ্রা যাও এবং সেভাবে পুনরুত্থিত হবে, যেভাবে নিদ্রা হতে জাগ্রত হও। তোমাদিগকে অবশ্যই স্বীয় কৃতকর্মের হিসেব দিতে হবে। ভাল কাজের পুরস্কার ভালই পাবে এবং মন্দের প্রতিফলও মন্দ পাবে। অত:পর হয় চিরদিনের জন্য জান্নাত লাভ হবে, না হয় চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নাম লাভ হবে।

www.pathagar.com

বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি বলেন, লোক সকল! সকল মুমিন ভাই ভাই। কারও জন্য তার ভাইয়ের সম্পদ হালাল নয়। তবে সে যদি খুশী মনে প্রদান করে তবে ভিন্ন কথা। জনগণ! আমি কি আল্লাহর বাণী পৌঁছাইলাম? হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। তোমরা আমার অবর্তমানে পরস্পরের রক্তপাত করে আবার কাফির হয়ে যেও না। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা আঁকড়ে ধরলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হল আল্লাহর কিতাব। আমি কি আল্লাহর বাণী পৌঁছাইলাম? হে আল্লাহ! সাক্ষী থাক। লোক সকল! তোমাদের প্রতিপালক এক। তোমাদের পিতাও এক। তোমরা সকলে আদম সন্তান। আদম ছিলেন মাটির সৃষ্টি। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত, যে সর্বাধিক মুত্তাকী। কোন আজমীর বা অনারবের ওপর কোন আরবিয় শ্রেষ্ঠত্ব নাই। তাকওয়াই আসল। আমি কি আল্লাহর বাণী পৌঁছাইলাম? হে আল্লাহ! সাক্ষী থাক। সমবেত জনগণ বলে উঠল, হাঁ, আপনি পৌঁছিয়েছেন। তিনি বললেন, তাহলে উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিতের নিকট আমার এই বাণী পৌঁছে দিবে।

একবিংশ শতাব্দীর এ যুগসন্ধিক্ষণে মুসলমানরা বিশ্বব্যাপী চরম ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। তথ্যপ্রযুক্তি ও মিডিয়ার মাধ্যমে মুসলমানদের চিন্তা ও আদর্শকে বিকৃতরূপে উপস্থাপিত করা হচ্ছে। তারা একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে, মুসলমান মানেই অজ্ঞ, মূর্খ এবং মোটা চিন্তাধারার জাতিগোষ্ঠী। শিল্পমান ও নান্দনিকতা মুসলমানদের জন্য নয়। পোষাক পরিচ্ছদ, চিন্তা ও সৃষ্টিশীল লেখালেখি, ভাষণ ও বক্তব্য, সাহিত্য ও শিল্পকলা, দৈহিক সৌন্দর্যবোধ, ফ্যাশন ও রূপচর্চা সর্বোপরি শিল্পসৌকর্য ও মননশীল নান্দনিকতা মুসলমানদের সীমানার বাইরে। আধুনিকতা মানেই ইসলামের বাইরের চিন্তা, নান্দনিকতা মানেই অশ্লীলতা, শিল্পসৌকর্য মানেই অন্য সংস্কৃতির চাষবাস, কথাবার্তা কিংবা আলোচনার শিল্পবোধ মানেই মুক্তচিন্তার নামে ইসলামের বিরোধিতা যেন যুগের ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। অথচ সকল ধরনের সৌন্দর্যবোধ, মননশীলতা ও শিল্পসৌকর্যের পুরোধা হচ্ছেন আমাদের প্রিয় নবী, বিশ্বসভ্যতার সর্বাধুনিক রূপকার, পরিশীলিত জীবনধারার প্রবর্তক হযরত মুহাম্মাদ [সা]। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত গোটা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই তাঁর নান্দনিক জীবনধারায় পরিচালিত করতে পারলেই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সফলতা নিশ্চিত হবে। বাগ্মিতার ক্ষেত্রে তাঁর দেখানো নজির ছড়িয়ে পড়ুক মুসলমানদের প্রতিটি অন্তরাত্মায়, এটাই প্রত্যাশা। #

www.pathagar.com

মানবতার রক্ষাকর্তা

হাসান শরীফ

'কথা বলার স্বাধীনতা' থাকার অধিকারের কথা সম্প্রতি মিডিয়ায় ফলাও করে প্রচার করা হয়। বিষয়টি এমনভাবে প্রচার করা হয়, যাতে মনে হয়, এগুলোর প্রবর্তক ও ধারক পাশ্চাত্যের দেশগুলো এবং মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশগুলো এই ধারণার বিরুদ্ধে। অথচ বাস্তবতা হলো, এটা পাশ্চাত্যের আবিষ্কার নয়, বরং মহানবী হজরত মুহাম্মাদ [সা] ১৪শ' বছর আগে প্রবর্তন করেছিলেন। অবশ্য, এটাও মনে রাখা দরকার, কথা বলার স্বাধীনতা, পরমত সহিষ্ণুতা এবং অপরের প্রতি শ্রদ্ধা পাশাপাশি বিরাজ করে। এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, কথা বলার স্বাধীনতার নামে একে অপরের প্রতি বিদ্রূপ, মর্যাদাহানিকর মন্তব্য, অপমানসূচক কথা সভ্য সমাজকে কলুষিত করে। নি:সন্দেহে বলা যায়, গণতন্ত্র, বর্ণগত সাম্য, সামজিক ন্যায়বিচার, মানবাধিকার– সবকিছুই ইসলামী ধারণা। মহানবী [সা] নিজের জীবনে এগুলোর নজির স্থাপন করেছিলেন। বর্তমানে এ নিয়ে বিপরীত ধারণার একটি কারণ চরমপন্থী গ্রুপগুলোকেই মনে করা হয় ইসলামের সত্যিকারের প্রতিনিধি এবং এর ফলে ইসলাম সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা গড়ে ওঠে, ইসলামাতঙ্ক সৃষ্টি হয়। মূলগতভাবে ইসলাম ন্যায়বিচারের বিকাশ এবং মানবাধিকার সুরক্ষিত করে। বিশ্বে মহানবী [সা] ছিলেন সর্বোত্তম মানবতাবাদী। জজ বার্নার্ড শ'র মতো দার্শনিক বলেছিলেন, 'তাকে অবশ্যই মানবতার রক্ষাকর্তা হিসেবে অভিহিত করতে হবে।... মুহাম্মাদের মতো কোনো লোক আধুনিক বিশ্বের ক্ষমতা গ্রহণ করেন, তবে তিনি বিরাজমান সব সমস্যার সমাধান করে অতি কাঙ্ক্ষিত শান্তি ও সুখ এনে দিতে পারবেন।' এর জের ধরে মহান ইতিহাসবিদ ল্যামারটিন যুক্তি দিয়েছেন, 'মানুষের মহত্ব পরিমাপের যে কোনো মানদন্ডের নিরিখে আমরা জানতে চাইতে পারি, তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো মানুষ আছে কি?' বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী মানুষের তালিকায় এ জন্যই তার স্থান শীর্ষে। ফলে আমরা দেখি, মুসলিম এবং অ-মুসলিম নির্বিশেষ সবাই মহানবী [সা]কে উদ্দীপনার উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছে। অন্য কারো জীবনই মহানবী [সা]-এর মতো এত ব্যাপকভাবে খতিয়ে দেখা হয়নি। কিন্তু তার চরিত্রে

www.pathagar.com

কোনো ত্রুটিও বের করা সম্ভব হয়নি। এমনকি ইসলামের প্রবল বিরোধিতা করা সত্ত্বেও মক্কার অমুসলিমেরা তাকে 'আস সাদিক' [সত্যবাদী], 'আল আমিন' [বিশ্বস্ত] হিসেবে অভিহিত করত। মহানবী [সা]-এর জীবন ছিল নিখুঁত এবং যারা অনুসরণ করার মতো কোনো মডেল কামনা করে, তাদের জন্য তিনিই আদর্শ। আর সেই আদর্শের ভিত্তি ছিল পবিত্র কুরআন। উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা [রা] বলেছেন, 'তিনি ছিলেন জীবন্ত কুরআন।' তাই তার জীবনধারা পর্যালোচনা করার মাধ্যমেই ইসলামের বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করা যায়। মহানবী [সা] ছিলেন অত্যন্ত উদার ও মিশুক। তিনি অন্যদেরও এমন হতে উৎসাহিত করতেন। এক লোক মহানবী [সা]কে জিজ্ঞাসা করল, 'ইসলামে সর্বোত্তম কাজ কোনটি?' তিনি জবাব দিলেন, 'খাওয়ানো [দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তকে] এবং তোমার পরিচিত ও অপরিচিত সবাইকে সালাম দেওয়া।' একইভাবে তিনি হিংসা এবং পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন হওয়া নিষিদ্ধ করেছেন। হযরত আনাস বিন মালিক [রা] বর্ণনা করেছেন, মহানবী [সা] বলেছেন, 'কখনো একে অন্যকে ঘৃণা করবে না এবং একে অন্যের প্রতি হিংসা পোষণ করবে না; কখনো কারো সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করবে না।... কোনো মুসলমান তার ভাইয়ের [মুসলিম] সঙ্গে তিন দিনের বেশি কথা না বলে থাকা অনুমোদনযোগ্য নয়।' মহানবী [সা] তার বিজ্ঞতার আলোকে ক্রুদ্ধ হওয়া থেকে আমাদের বিরত থাকতে বলেছেন। হযরত আবু হুরায়রা [রা] বর্ণনা করেছেন, মহানবী [সা] বলেছেন, 'সেই লোক শক্তিশালী নয়, যে শক্তি দিয়ে অন্যকে পরাভূত করে, বরং সেই লোক শক্তিশালী যে নিজের ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।' আরেক হাদিসে মহানবী [সা] বলেছেন, 'সত্যিকারের বিশ্বাসী সেই লোক যাকে অন্যরা নিরাপদ মনে করে, যিনি ঘৃণার বদলে ভালোবাসা দেন।' মহানবী [সা] স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'যে লোক কেবল ভালোবাসার প্রতিদানে ভালোবাসা দেয়, সে নিম্নস্তরের লোক। যারা আমাদের সঙ্গে ভালো আচরণ করবে, আমরা কেবল তাদের সঙ্গেই ভালো আচরণ করব, এমন শিক্ষা মহানবী [সা] দেননি। বরং আমরা তাদের সঙ্গেও ভালো আচরণ করব, যারা তেমন ভালো নয়। যারা আমাদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করে, তাদের সঙ্গেও কোনো অন্যায় করা যাবে না। মুসলিম শরিফের একটি হাদিসে বলা হয়েছে, মহানবী [সা]-এর বিরোধীরা যখন তার উপর নির্যাতন বাড়িয়ে দিচ্ছিল, তখন তার সাহাবারা তাঁকে তাদের প্রতি অভিশাপ দিতে অনুরোধ করেছিলেন। জবাবে মহানবী [সা] বলেছিলেন, 'আমি তাদেরকে অভিশাপ দিতে প্রেরিত হইনি, বরং আমি তাদের জন্য রহমত হিসেবে এসেছি।' বিরোধিতাকারীরা তাঁর ও তাঁর সাহাবাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাতে লাগল, কিন্তু তিনি সবসময় তাদের জন্য দোয়া করতেন। অন্য কারো জন্য কোনো ধরনের সমস্যার সৃষ্টি না করেই মহানবী [সা] তাঁর জীবনকে গড়ে নিয়েছিলেন। এই বিষয়টি উপলব্ধি করার জন্য আমাদের নজর দিতে হবে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের দিকে। মহান

www.pathagar.com

আল্লাহপাক সূরা আম্বিয়ায় [আয়াত ১০৭] বলেছেন, 'আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।' এখানে মুসলিম, অমুসলিম, উদ্ভিদ, প্রাণীসহ মহাবিশ্বের সবকিছুর প্রতি মহানবী [সা]-এর দয়া প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর রাসূল [সা] কাউকে কোনো ধরনের সমস্যায় না ফেলেই জীবন কাটিয়েছেন। এ থেকে আমরা এই শিক্ষা নিতে পারি, আমাদের উচিত ফুল হওয়া, কাঁটা নয়। অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতিও মহানবী [সা] অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতেন। তিনি তাদেরকে অবাধে তাদের ধর্ম পালনের সুযোগ দিয়েছিলেন। এ কারণেই মদিনায় মুসলমান ও ইহুদিরা শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি বসবাস করত। অধিকন্তু তিনি তার অনুসারীদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছিলেন, যে কোনো অমুসলিমকে হত্যা করবে বা তার সঙ্গে অসদাচরণ করবে, সে বেহেশতের সুগন্ধ কখনো পাবে না এবং নবীজি নিজে হাশরের ময়দানে অমুসলিমের পক্ষাবলম্বন করবেন। তিনি সবসময় খ্রিস্টান, ইহুদি ও মূর্তিপূজকদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে চাইতেন। কেবল ইসলামের রক্ষা এবং আগ্রাসন বন্ধ করতে তিনি তরবারি ধারণ করতেন। অনেকে অভিযোগ করে থাকেন, তিনি তরবারির সাহায্যে ইসলাম প্রচার করেছিলেন। এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা। তরবারির মাধ্যমে নয়, বরং তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আর ভালবাসা দিয়ে তিনি ইসলামে আহব্বান করতেন। পবিত্র কুরআনেও বলা হয়েছে, ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই। মহানবী [সা] দুনিয়াতে এসেছিলেন শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে। দার্শনিক এ জে টয়েনবি তার সিভিলাইজেশন অন ট্রায়ালে বলেছেন, 'ইসলামের অন্যতম অবদান হলো মুসলমানদের মধ্যে বর্ণবাদের বিলুপ্তি।' মহানবী [সা] তাঁর শেষ খোতবায় বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টিতে বাধা সৃষ্টিকারী সব প্রতিবন্ধকতা অপসারণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'ইসলামে জাতি, শ্রেণীভেদ ও বর্ণবৈষম্য নেই। আরবের ওপর কোনো আজমের, আজমের ওপর কোনো আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তেমনি সাদার ওপর কালোর বা কালোর ওপর সাদার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। মর্যাদার ভিত্তি হলো কেবল তাকওয়া।' তিনি তার সদাচরণ, ভদ্রতা ও সংযমের মাধ্যমে পুরো মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম ব্যবহারের স্থায়ী ও জীবন্ত দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপনে তিনি এই দুনিয়ার বৈধ আনন্দরস গ্রহণ থেকেও বিরত থাকেননি। তিনি ছিলেন সত্যিই অসাধারণ। কেবল ব্যক্তিগত জীবনই নয়, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, নৈতিক, সামাজিক, মানবীয় ও সাংস্কৃতিক- এক কথায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি সর্বকালের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ।#

www.pathagar.com

মহানবীর [সা] মিশন

মুহাম্মদ আবুল হুসাইন

মানুষ আল্লাহর খলিফা ও তাঁর বান্দা বা গোলাম হওয়ার তাৎপর্য হচ্ছে, প্রথমত আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত মানুষকে নিজের খলিফা ঘোষণা করে সমগ্র মানব জাতিকে যে ইজ্জত দিয়েছেন, তাদেরকে যে সম্মানে ভূষিত করেছেন, এরপর সে মানুষের পক্ষে শোভা পায় না যে, সে দুনিয়ায় আর কারো শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিবে বা আর কারো দাসত্ব ও আনুগত্য কবুল করবে। দ্বিতীয়ত, মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি মাত্র– প্রভু নয়। সে অন্যের প্রভুত্ব যেমন সহ্য করবে না, তেমনি নিজেও কখনো কারো প্রভু হয়ে বসবে না বা সে ধরনের কোন চেষ্টাও করবে না। যদি করে তাহলে সে হবে স্বেচ্ছাচারী বা বিদ্রোহী। দ্বীনি দৃষ্টিতে দুনিয়ার জীবনে কোন কর্মক্ষেত্রেই স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ নেই। বরং প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে মানুষকে হতে হবে বিশ্ব-স্রষ্টার আজ্ঞাবহ বা হুকুমের গোলাম। আর এই গোলামী বা দাসত্ব-আনুগত্যের মাধ্যমেই রক্ষিত হয় মানুষের খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা। কাজেই আমরা বলতে পারি, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর গোলামী বা দাসত্ব করার জন্য এবং একই সাথে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। অর্থাৎ মানুষ একদিকে যেমন আল্লাহর গোলাম বা দাস তেমনি সেই সাথে সে আবার আল্লাহর খলিফা। সুতরাং পৃথিবীতে মানুষ দায়িত্বহীন নয়। আল্লাহর একনিষ্ঠ গোলামে পরিণত হওয়ার পাশাপাশি আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান জারি ও তা নিশ্চিত করাই হলো খলিফা হিসেবে মানুষের দায়িত্ব। একইভাবে এটি তাওহীদের ঘোষণা বা ঈমানেরও অনিবার্য দাবী।

নবী-রাসূলদের দাওয়াত : তাওহীদের শাশ্বত আহবান

আল্লাহর প্রিয় বান্দা নবী-রাসূলগণ [সা] মূলত এ দায়িত্বই পালন করে গেছেন। তাওহীদের শাশ্বত আহবানই ছিল তাঁদের দাওয়াত। আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বা তাওহীদের এই ঘোষণা মক্কার জাহেলী সমাজের মানুষের কাছে বা একটি শিরকপূর্ণ সমাজের মানুষের কাছে নতুন মনে হলেও আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের এই ঘোষণা কিন্তু ইসলামের চিরন্তন ও শাশ্বত শিক্ষা। অতীতের প্রত্যেক নবী ও

www.pathagar.com

রাসূলেরও [সা] প্রধান মিশন ছিল আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা প্রচার করা এবং মানুষকে সতর্ক ও সচেতন করে তোলা। যেমন আল কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন: 'আমি নূহ-কে [আ] তার জাতির নিকট পাঠিয়েছিলাম। সে তার জাতিকে ডেকে বলল, 'হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহ্র দাসত্ব কর। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ বা প্রভু নেই। আমি তোমাদের জন্য একটি মহাদিবসের শাস্তির ভয় করি।' [আল আরাফ : ৫৯]। 'এবং আদ জাতির প্রতি তাদের ভাই হুদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলল, 'হে আমার দেশবাসী, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।' [আল আরাফ: ৬৫]। 'এবং ছামুদ জাতির প্রতি তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম। সে তার দেশবাসীকে ডেকে বলল, 'হে আমার কওমের লোকেরা, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।' [আল আরাফ : ৭৩]। 'এবং মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েবকে পাঠালাম। সে তার কওমকে বলল, 'হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহ্র দাসত্ব কবুল কর। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই।' [আল আরাফ : ৮৫]। দেখা যাচ্ছে আল্লাহর প্রভুত্ব, তাঁর স্বার্বভৌমত্ব, তাঁর নিরংকুশ আনুগত্য ও গোলামীর দিকে আহবান জানানোই ছিল নবী-রাসূলদের দাওয়াতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং তাওহীদের যে ঘোষণা হযরত মুহাম্মাদ [সা] উচ্চারণ করেছিলেন, ঈমানের যে দাওয়াত তিনি দিয়েছেন তা নতুন কোন দাওয়াত ছিল না। অতীতের সমস্ত নবী-রাসূলগণ এই দাওয়াতই প্রদান করেছেন। কালেমার এই দাওয়াত মূলত ইসলামের চিরন্তন দাওয়াত ও তাওহীদের শাশ্বত ঘোষণা। আল্লাহ বলেছেন, 'আমরা তোমার পূর্বে যত রাসূলই পাঠিয়েছি তাদের সবাইকেই এ নির্দেশ দিয়েছি যে, আমি ছাড়া আর কোন প্রভু ও প্রতিপালক নেই। সুতরাং তোমরা কেবল আমারই দাসত্ব-আনুগত্য কর।' [আল আম্বিয়া : ২৫]। 'আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছি– এজন্যে যে, আল্লাহর গোলামী কর এবং তাগুত থেকে বেঁচে থাকো।' [আন নাহল : ৩৬]। 'আমরা আমাদের রাসূলগণ [সা]কে পাঠিয়েছি সুস্পষ্ট নিদর্শন ও হেদায়াত সহকারে এবং সে সাথে আমরা কিতাব ও মানদন্ডও নাযিল করেছি যাতে লোকেরা ইনসাফ ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।' [আল হাদীদ : ২৫]। এ কারণেই ইসলামকে বলা হয় শাশ্বত-সনাতন ধর্ম বা শাশ্বত জীবনাদর্শ। আর সমস্ত নবী-রাসূলগণ [সা] ছিলেন মূলত একই তাওহীবাদী জীবনাদর্শের পতাকাবাহী। তাঁদের সকলেরই মঞ্জিল-মকসুদ ছিল এক ও অভিন্ন এবং তারা সবাই ছিলেন আল্লাহর বান্দা এবং তাদের সকলেরই মিশন ছিল মানুষকে আল্লাহর গোলামীর দিকে আহবান জানানো। 'নিশ্চয়ই তোমাদের

www.pathagar.com

[নবীদের] এ দল একটি মাত্র দল আর আমি তোমাদের প্রভু। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত কর।' [আল আম্বিয়া : ৯২]। কিন্তু কালক্রমে সত্যের পথ থেকে মানুষ বিচ্যুত হয় এবং আল্লাহর হেদায়েতের পরিবর্তে নিজেদের খেয়াল-খুশি ও কাল্পনিক, মনগড়া মতবাদ ও খোদাদ্রোহী নাফরমান শক্তিকে অনুসরণ করা শুরু করে। এ সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হয়েছে, 'নি:সন্দেহে আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন-ব্যবস্থা হলো ইসলাম। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা এ জীবন-ব্যবস্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে ভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। তাদের এ কর্মনীতির একমাত্র কারণ এ হতে পারে যে, প্রকৃত জ্ঞান পাওয়ার পরও তারা পরস্পরের বিদ্বেষবশত এমনটি করেছে।' [আলে ইমরান : ১৯]। মানুষের এই অধ:পতন ও বিকৃতির বিরুদ্ধে তাওহীদের পতাকাবাহী নবী-রাসূলদের [সা] সংগ্রাম সাধনাও চলতে থাকে। আর এর ফলে কায়েমী স্বার্থবাদী সকল অপশক্তির সাথে তাঁদের বিরোধ-সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। আর প্রধান চ্যালেঞ্জ আসে সমকালীন খোদাদ্রোহী নাফরমান শাসক ও রাজনৈতিক শক্তির পক্ষ থেকে। যেমন মিশরের শাসকশ্রেণী ফিরাউনগোষ্ঠীর জনৈক ফেরাউন বলেছিল, 'এবং বলল, আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ রব।' [আন-নাযিআত : ২৪]। 'ফেরাউন তার জাতির লোকদের ডেকে বলল, 'হে জনগণ, মিসরের বাদশাহীর মালিক কি আমি নই? আর এই ঝর্ণাগুলো কি আমারই নীচে প্রবাহিত হচ্ছে না? তোমরা কি দেখতে পাওনা? আমি তো শ্রেষ্ঠ এই ব্যক্তি থেকে, যে নীচ এবং ঠিক মত কথাও বলতে পারে না।' [সূরা : যুখরুফ : ৫১-৫২]। 'হে জাতীয় নেতৃবৃন্দ! আমি আমার নিজের ছাড়া আর কেউ তোমাদের ইলাহ আছে বলে জানি না। হে হামান, ইট তৈরি কর আর আমার জন্য একটি উচ্চ ইমারত নির্মাণ কর। আমি উচ্চে উঠে দেখতে চাই মুসার ইলাহ কোথায় আছে। আমার তো ধারণা, সে একজন মিথ্যাবাদী।' [সূরা কাসাস : ৩৮]।

দ্বিতীয় বাধা ছিল স্বার্থবাদী ও বিভ্রান্ত ধর্মীয় গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে যারা ধর্মকে স্বার্থোদ্ধারের হাতিয়ারে পরিণত করেছিল এবং তাওহীদের নির্ভেজাল আদর্শকে বিকৃত করে শির্ক ও পৌত্তলিকতার পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল। আল্লাহর পরিবর্তে যারা মানুষকে নবী-রাসূল, পীর-ওলি-দরবেশ, আলেম ও ধর্মীয় নেতাদের গোলামী করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতো এবং নিজেদেরকে ঐ সমস্ত লোকদের অত্যন্ত ঘনিষ্ট বা খাদেম পুরোহিত হিসেবে জাহির করে প্রকারান্তরে লোকদেরকে নিজেদের গোলামে পরিণত করার কসরত করতো। অথচ যাদের কথা বলে তারা লোকদের বিভ্রান্ত করতো তাঁরা কখনো শিরক ও পৌত্তলিকতার সাথে জড়িত ছিলেন না। বস্তুত ঐ সব শিরকবাদী ধর্ম-ব্যবসায়ী লোকেরা সব সময়ই নবী-রাসূলদের [সা] নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান

www.pathagar.com

করেছে। পবিত্র কুরআনে ঐ সব ভণ্ডদের মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে এভাবে, ‘এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের আলেম ও দরবেশ লোকদেরকে নিজেদের খোদা বানিয়ে নিয়েছে। আর এভাবে মরিয়মপুত্র ঈসাকেও। অথচ তাদেরকে এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো বন্দেগী-দাসত্ব করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। তিনিই আল্লাহ্, যিনি ছাড়া আর কেউ দাসত্ব-আনুগত্য-ইবাদত-বন্দেগী পাওয়ার অধিকারী নেই। তিনি পাক-পবিত্র এসব অংশীদারীমূলক কথা থেকে যা তারা বলে।’ [আত তওবা : ৩১]। ‘তাদের পরস্পরের মধ্যে ফায়সালা করে দেয়ার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে ডাকা হয় তখন তাদের একটি দল পাশ কাটিয়ে চলে যায় এবং এ ফায়সালা থেকে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের এরূপ আচরণের একমাত্র কারণ এই যে, তারা বলে, জাহান্নামের আগুন তো আমাদেরকে স্পর্শ পর্যন্ত করবে না। আর জাহান্নামের শাস্তি যদি আমাদেরকে একান্তই ভোগ করতে হয়, তবে তা কয়েক দিনের জন্য মাত্র। বস্তুত, তাদের মনগড়া আকিদা তাদেরকে নিজেদের দ্বীন সম্পর্কে বড়ই বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে।’ [আলে ইমরান : ২৩-২৪]। বস্তুত, মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে মানুষের উপর থেকে মানুষের তথা গাইরুল্লার প্রভুত্ব খতম করে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যকে নিরংকুশভাবে গ্রহণ করাই হলো তাওহীদ বা একত্ববাদের মূলকথা। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্যের জন্য যদি কোন আইন-বিধান কার্যকর না থাকে তাহলে শুধুমাত্র ‘বিশ্বাস’ মানুষের জীবনে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না। বরং আল্লাহর আইন-বিধানের অনুপস্থিতিতে সমাজ-সংসারের সর্বক্ষেত্রে মানুষ তখন নিজের নফস বা প্রবৃত্তির গোলামী করতে বাধ্য হবে অথবা অন্য কোন মানুষ বা গাইরুল্লাহর আনুগত্যকে কবুল করবে। বলাবাহুল্য, এভাবে আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে নফস ও গাইরুল্লাহর গোলামী কবুল করার ফলে মানুষ তাওহীদের চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করে মূলত কুফরি ও শিরকের জিঞ্জিরেই নিজেদেরকে আবদ্ধ করবে এবং তাতে মনুষ্যত্ব বিকাশের পরিবর্তে তাকে অবমাননাই করা হবে। এ কারণেই আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন যুগে যুগে হেদায়াত বা আসমানীগ্রন্থের মাধ্যমে আল্লাহর বিধান বা পথনির্দেশ আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। আর নবী-রাসূলগণ [সা] এসেছিলেন আসমানীগ্রন্থের আদর্শকে সমস্ত বিভ্রান্ত মতবাদের ওপর বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, মানব সমাজে আল্লাহর বিধানকে জীবন্ত করে তোলার জন্য, আল্লাহর আইন ও বিধানকে মানুষের সমাজে কার্যকরী করার জন্য, তাকে সর্বোচ্চ আইন ও বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। আর এ জন্য তাঁদেরকে পরিচালনা করতে হয়েছিল একটি সর্বাত্মক আন্দোলনের। তাঁরা একেকজন ছিলেন সেই মহান বিপ্লবী যাঁরা আল্লাহর আদর্শের আলোকে ঘুমন্ত মানব সমাজকে জাগিয়ে তুলতেন এবং খোদাদ্রোহী কায়েমী স্বার্থবাদী সমাজকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে আল্লাহর আইন ও খোদাভীরু নেতৃত্বের ভিত্তিতে একটি

www.pathagar.com

পূর্ণাঙ্গ তাওহীদবাদী সমাজ-বিপ্লব কায়েম করতেন। বস্তুত আল্লাহর প্রিয় বান্দা নবী-রাসূলগণ [সা] ছিলেন ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী সমাজ-বিপ্লবেরই তূর্যবাদক, তাঁরা ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা সংগ্রামী। মানুষের ওপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব-আধিপত্যকে খতম করে একমাত্র স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁদের জীবনের মিশন।

আল্লাহর হুকুমকে বুলন্দ করা, দ্বীনে হককে গালীব করা :

শুধু আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, কর্তৃত্ব ও আল্লাহর কালামকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার মধ্যেই রাসূলের [সা] মিশন সীমাবদ্ধ ছিল না; বাস্তবে আল্লাহর বাণীকে বুলন্দ করা, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা বা দ্বীনে হককে বিজয়ী করাই ছিল মহানবীর জীবনের আসল মিশন। আর দাওয়াতী কাজ ছিল এ আসল বা মূল মিশনকে বাস্তবায়ন করার একটি উপায় বা উপাদান মাত্র। দাওয়াতী কাজ বা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের প্রচার ছাড়া, মানুষের চিন্তা-চেতনাকে আল্লাহর কর্তৃত্ব ও আনুগত্বের জন্য প্রস্তুত করা ছাড়া যেমন আল্লাহর হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, তেমনি আল্লাহর হুকুমত প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া তাঁর নিরংকুশ আনুগত্য করাও সম্ভব হতে পারে না। মূলত আল্লাহর কালাম, তাঁর হুকুম, তাঁর দ্বীন পৃথিবীতে বিজয়ী হওয়ার জন্যই এসেছে, বিজিত হওয়ার জন্য আসেনি। আল্লাহর হুকুম কখনো মানুষের হুকুমের অধীন থাকতে পারে না। আল্লাহর কালাম, তাঁর বিধানও কখনো মানব রচিত মতবাদ ও বিধানের অধীনে থাকার জন্য আসেনি। কিন্তু আল্লাহর হেদায়াত মানুষের উপর জোর করে চাপিয়ে দেয়াও আল্লাহর পছন্দ নয়। এজন্য মানুষের কাছে প্রথমে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা ও তাঁর মাহাত্মের প্রচার, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে মানুষেকে সঠিক ধারণা প্রদান করাই আল্লাহর পছন্দ। এজন্যই প্রথমে দ্বীনের দাওয়াত মানুষের সামনে তুলে ধরা জরুরী। তবে মনে রাখতে হবে, শুধু দাওয়াত দেয়ার জন্যই কিন্তু আল্লাহর নবী পৃথিবীতে আসেননি, বরং হুকুমতে ইলাহিয়া বা আল্লাহর বাণীকে বুলন্দ করা, তাঁর হুকুমত বা শাসন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করাই সকল দাওয়াতী মেহনতের মূল উদ্দেশ্য। মহনবীর [সা] এ মূল মিশন বা তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন ঘোষণা করেছেন, 'তিনি তাঁর রাসূল [সা]কে প্রেরণ করেছেন হেদায়াত [পথনির্দেশ] ও সত্যদ্বীন [সঠিক আনুগত্যের ব্যবস্থা বা নির্ভূল জীবন বিধান] সহকারে; সকল দ্বীনের উপর তাকে বিজয়ী করার জন্য। যদিও মুশরিকগণ তা অপছন্দ করে।' [সূরা আস্‌সফ : ৯]।

'তিনিই আল্লাহ যিনি তাঁর রাসূলকে [সা] হেদায়াতের বিধান ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যেন অন্যান্য সব দ্বীনের উপর তাকে বিজয়ী করে দেন।

www.pathagar.com

মুশরিকদের পক্ষে তা যতই অসহ্য ব্যাপার হোক না কেন।' [আত-তওবা : ৩৩]। দ্বীনকে বিজয়ী করা মানে সমাজ-সংগঠনের সর্ব পর্যায়ে, জীবনের সব ক্ষেত্রে মানুষ যেন কেবলমাত্র আল্লাহর হুকুমকেই প্রাধান্য দেয়, মানুষের হৃদয়গুলো যেন আল্লাহর দিকেই বেশি রুজু হয়, দুনিয়ার পরিবর্তে তারা যেন আখেরাতকেই বেশি প্রাধান্য দেয়। দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করা মানে এমন একটি ইসলামী সমাজ-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা, যেখানে সমাজ-রাষ্ট্রের সর্বস্তরে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আল্লাহর আইনই হবে রাষ্ট্রীয় সমস্ত আইনের উৎস। সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্ব পর্যায়ে আল্লাহর আয়াতকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেয়া, তাঁর হুকুমকে সমস্ত হুকুমের উপর বিজয়ী করাই হল দ্বীনকে বিজয়ী করা।

পৃথিবীতে আল্লাহর আয়াতকে যদি সর্বোচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা না যায়, আল্লাহর হুকুম যদি আর সকল হুকুমের উপর বিজয়ী না হয়, তাঁর আইন যদি সকল আইনের ওপর স্থান না পায়, যদি পৃথিবীতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হয়, আল্লাহর আইন, তাঁর হুকুম-আহকাম যদি দুনিয়ার মানুষের হুকুম, কর্তৃত্ব, আইন-বিধানের অধীন হয়ে পড়ে, তাহলে মানব সমাজে আল্লাহর আইন জারি করা এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে পরিচালনা সম্ভব হবে না। এ কারণেই আল্লাহতায়ালা সমস্ত নবী-রাসূল [সা]কে এবং সর্বশেষে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]-কেও পাঠিয়েছেন তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য। সমস্ত প্রকার অসৎ, দূর্নীতিপরায়ণ, পাপাচারী, ভণ্ড, নাফরমান ও খোদাদ্রোহী তাগুতী শক্তির কর্তৃত্বের পরিবর্তে দ্বীনের ঝাণ্ডবাহী আল্লাহর প্রিয় নেককার, পরহেজগার, মুত্তাকী, সৎ ও যোগ্য আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তিদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর কালাম, তাঁর হুকুম ও আইন-বিধানের কর্তৃত্ব-সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা, আল্লাহর দেয়া জীবন-বিধান ইসলামকে, পবিত্র কুরআনের আদর্শকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। জীবনের সর্বক্ষেত্রে– ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাহিত্য-সংস্কৃতি, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক, যুদ্ধ, সন্ধি এক কথায় মানব জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে আল্লাহর আইন ও রাসূলের [সা] সুন্নাহকে আদর্শ হিসেবে, মানদণ্ড হিসেবে, বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। বস্তুত, আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মেনে নেয়ার পর তাঁর দ্বীনকে পিছনে ফেলে বাতিল দ্বীন– অর্থাৎ নিজেদের নফস-প্রবৃত্তি কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি, সাম্রাজ্য কিংবা অন্য কোন শক্তির নিরংকুশ আনুগত্য, আধিপত্য মেনে নেয়া কিংবা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক কোন মতবাদ বা মতাদর্শের অনুসরণ করার সুযোগ কোন ঈমানদারের থাকতে পারে না। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'কেউ

www.pathagar.com

ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কবুল করা হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।' [আলে ইমরান : ৮৫]। 'তারা কি চায় আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কোন দ্বীন ? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুই ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক আল্লাহর আনুগত্য করেই চলছে, তাঁর দিকেই প্রত্যবর্তন করছে।' [আলে ইমরান : ৮৩]।

'আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন হলো ইসলাম। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা পরস্পর বিদ্বেষবশত তাদের নিকট জ্ঞান আসার পরও মতানৈক্য করেছিল। আর কেউ আল্লাহর নির্দেশকে প্রত্যাখ্যান করলে আল্লাহর হিসেব গ্রহণে বিলম্ব হয় না।' [আলে ইমরান : ১৯]। ঈমানের অনিবার্য দাবী হচ্ছে আল্লাহর হুকুমের সামনে নিজেকে সর্বাত্তোমভাবে সমর্পন করে দেয়া, ইসলামী জীবন-বিধানের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পন করা। আংশিকভাবে দ্বীন পালন করা; সুবিধাবাদী নীতি অবলম্বন করে বাতিলের সাথেও আপোষ করে চলা এবং নিজেদের পছন্দমত দ্বীনেরও কিছু কিছু আনুষ্ঠিকতা মানা, হক ও বাতিল উভয় নৌকাতেই পা দেয়া, আল্লাহর উলুহিয়াত ও রুবুবিয়াতের সাথে গাইরুল্লাকেও যুক্ত করার কোন সুযোগ অন্তত ঈমান্দারীর মধে নেই। কোন ভেজাল মিশ্রিত ঈমান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল কুরআন কোন অসম্পূর্ণ, সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ পথনির্দেশ নয়; জীবনের কোন একটি ক্ষেত্রের মধ্যেই তার বিচরণ সীমাবদ্ধ নয়। বরং আল-কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ হেদায়াত; একটি সর্বপ্লাবী দ্বীনের আলো, একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ জীবনাদর্শ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন, 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহকে সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন [জীবনব্যবস্থা] মনোনীত করলাম।' [আল মায়েদা :৩]। সুতরাং বাতিলের পথে চলে হকের অনুসারী হওয়ার কোন সুযোগ নেই। বরং এর জন্য রয়েছে কঠিন হুশিয়ারী। কারণ এই সুবিধাবাদী ঈমান শিরকের নামান্তর এবং আরশে আজীমের ইজ্জতের খেলাফ। আর শিরক কবিরা গুনাহ ও সবচেয়ে বড় জুলুম। পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করলো, সে যেন বড় অপবাদ আরোপ করল।' [আন নিসা : ৪৮]। 'যখন লোকমান উপদেশ হিসেবে তার পুত্রকে বললো, 'হে আমার ছেলে, আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় শিরক হচ্ছে বড় জুলুম।' [লুকমান : ১৩]। 'তাহলে কি তোমরা আল্লাহর কিতাবের একাংশ বিশ্বাস কর আর অপর অংশকে কর অবিশ্বাস? জেনে রেখো, তোমাদের মধ্যে যারাই এ ধরনের আচরণ করবে তাদের জন্য রয়েছে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ও অপমান আর পরকালের জীবনে কঠিন আযাব। তোমরা যা কিছুই কর আল্লাহ সে সম্পর্কে বেখবর নন।' [আল-বাকারা : ৮৫] #

www.pathagar.com

কোমল অতি
ধবল জ্যোতি

মালিক ইমতিয়াজ

হযরত আনাস [রা] সম্পর্কে আগেই আমরা অনেক কিছু জেনেছি। কিন্তু এমন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে জানার কি কোনো শেষ আছে!

মূলত তিনিই তো ছিলেন কোমল অতি ধবল জ্যোতি।

উমাইয়্যা শাসন আমলে হযরত উমার ইবন আবদিল আযীয (রা) যুবরাজ থাকাকালে একবার মদীনার গভর্নর ছিলেন। যেহেতু শাহী খান্দানের সদস্য ছিলেন, এ কারণে জাতীয় জীবনের অনেক কিছুই তাঁর জানা ছিল না।

সে যুগের প্রচলন অনুযায়ী নিজেই নামাজের ইমামতি করতেন এবং মাঝে মধ্যে কিছু ভুল-ত্রুটিও হয়ে যেত। হযরত আনাস [রা] প্রায়ই তাঁর ভুল ধরিয়ে দিতেন। তিনি একবার হযরত আনাস [রা]কে বললেন, আপনি এভাবে আমার বিরোধিতা করেন কেন?

হযরত আনাস [রা] বললেন, আমি যেভাবে রাসূলুল্লাহকে [সা] নামাজ পড়তে দেখেছি আপনি যদি সেইভাবে নামাজ পড়ান তাহলে আমি সন্তুষ্ট হবো। অন্যথায় আপনার পিছনে নামাজ আদায় করবো না।

হযরত উমার ইবন আবদিল আযীয ছিলেন বুদ্ধিমান ও সৎ স্বভাব-বিশিষ্ট ব্যক্তি। হযরত আনাসের [রা] কথায় তিনি প্রভাবিত হলেন। তিনি আনাস [রা]কে উস্তাদ হিসাবে গ্রহণ করলেন। কিছুদিন তাঁর সাহচর্য ও শিক্ষার প্রভাবে তিনি এমন সুন্দর নামাজ পড়াতে লাগলেন যে, খোদ আনাস [রা]ই বলতে লাগলেন, এই ছেলের নামাজের চেয়ে আর কারও নামাজ রাসূলুল্লাহর [সা] নামাজের সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।

একবার খলীফা আবদুল মালিক হযরত আনাস [রা]সহ আরও চল্লিশজন আনসারী ব্যক্তিকে দামেশকে ডেকে পাঠান। সেখান থেকে ফেরার পথে ফাজ্জুন নাকাহ নামক স্থানে পৌঁছলে আসর নামাজের সময় হয়ে যায়।

www.pathagar.com

যেহেতু সফর তখনও শেষ হয়নি, এই কারণে হযরত আনাস [রা] দুই রাকায়াত নামাজ পড়ান। তবে কিছু লোক আরও দুই রাকায়াত পড়ে চার রাকায়াত পুরো করেন।

একথা হযরত আনাস [রা] জানতে পেরে দারুণ ক্ষুব্ধ হন এবং বলেন, আল্লাহ যখন কসরের অনুমতি দিয়েছেন তখন এ সুবিধা গ্রহণ করবে না কেন? আমি রাসূলকে [সা] বলতে শুনেছি, এমন একটি সময় আসবে যখন মানুষ দ্বীনের ব্যাপারে অহেতুক বাড়াবাড়ি করবে। আসলে তারা দীনের প্রকৃত রহস্য সম্পর্কে থাকবে গাফিল।

সত্যকথা বলা এবং সত্যকে পছন্দ করা ছিল হযরত আনাসের [রা] চরিত্রের এক উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য।

খিলাফতে রাশেদার প্রথম দুই খলীফার পর এমন অনেক যুবক সরকারের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয় যারা ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল। এজন্য তাদের অনেক কাজই কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী হতো।

যে সাহাবায়ে কিরাম জীবনের বিনিময়ে ইসলাম খরীদ করেছিলেন তাঁরা এটা সহ্য করতে পারতেন না। তাঁরা ভয়-ভীতির উর্ধ্বে উঠে সব সময় সত্য কথাটি স্পষ্টভাবে বলে দিতেন।

হযরত আনাস [রা] রাসূলুল্লাহর [সা] ওফাতের পর দীর্ঘ দিন জীবিত ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ জীবনে বহু স্বৈরাচারী শাসকের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন যারা প্রকাশ্যে শরীয়াতের প্রতি অবহেলা করতো।

হযরত আনাস [রা] এ অবস্থায় চুপ থাকেননি। তিনি প্রকাশ্য জনসমাবেশে তাদের সতর্ক করে দিতেন।

ইয়াযীদের সময়ে আবদুল্লাহ ইবন যিয়াদ ছিলেন ইরাকের গভর্নর। তাঁর নির্দেশে হযরত ইমাম হুসাইনের পবিত্র মাথা সামনে আনা হলে তিনি হাতের ছড়িটি দিয়ে হযরত হুসাইনের চোখে টোকা দিয়ে তাঁর সৌন্দর্য সম্পর্কে কিছু অশালীন কটাক্ষ করেন। হযরত আনাস [রা] নিজেকে আর সম্বরণ করতে পারলেন না। ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে বললেন, এই চেহারা রাসূলুল্লাহর [সা] চেহারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উমাইয়্যা রাজবংশের বিখ্যাত স্বৈরাচারী গভর্নর হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ আস–সাকাফী নিজের ছেলেকে বসরার কাজী নিয়োগ করতে চায়। হাদীস শরীফে বিচারক অথবা আমীরের পদের আকাংখী হবার নিষেধাজ্ঞা এসেছে। তাই হযরত আনাস [রা] হাজ্জাজের এই ইচ্ছার কথা জানতে পেরে বলেন, এমনটি করতে রাসূল [সা] নিষেধ করেছেন।

www.pathagar.com

উমাইয়্যা শাসকদের আর এক আমীর হাকাম ইবন আইউব। তাঁর নৃশংসতা মানুষের সীমা অতিক্রম করে জীব-জন্তু পর্যন্ত পৌঁছে যায়।
একবার হযরত আনাস তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখেন, মুরগীর পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে তীরের নিশানা বানানো হচ্ছে। তীর লাগলে মুরগীটি ছটফট করছে।
হযরত আনাস [রা] এ দৃশ্য দেখে খুবই মর্মাহত হলেন এবং মানুষকে তাদের এ কাজের জন্য ধিক্কার দিলেন।
একবার কিছু লোক জুহরের নামাজ আদায় করে হযরত আনাসের [রা] সাক্ষাতের জন্য আসে। তিনি তখন চাকরের নিকট অজুর পানি চাইলেন। লোকেরা জানতে চাইলো, এ কোন্ নামাজের প্রস্তুতি?
বললেন, আসর নামাজের।
এক ব্যক্তি বললো, আমরা তো এখনই জুহর পড়ে এলাম।
হযরত আনাস [রা] আমীর উমরাহের দ্বীনের প্রতি উদাসীনতা এবং জনগণের দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা দেখে দারুণ ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি বললেন, এ তো হবে মুনাফিকদের নামাজ। মানুষ বেকার বসে থাকবে, তবুও নামাজের জন্য উঠবে না। যখন সূর্য অস্ত যেতে থাকবে তখন খুব তাড়াতাড়ি মোরগের মত চারটি ঠোকর মেরে দেবে। সেই ঠোকরে আল্লাহর স্মরণ থাকবে অতি অল্পই। প্রকৃত দীনদারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'আমর বিল মারূফ'– সৎ কাজের আদেশ দান করা। আর এজন্যই কুরআন মজীদে উম্মাতে মুসলিমাকে সর্বোত্তম উম্মাত হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। হযরত আনাসের [রা] মধ্যে এই গুণটির বিশেষ বিকাশ ঘটেছিল।
একবার উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদের একটি মজলিসে হাউজে কাওসার প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। উবাইদুল্লাহ এর বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন।
একথা হযরত আনাসের [রা] কানে গেল। তিনি সরাসরি উবাইদুল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেন, তোমার এখানে কি হাউজে কাওসার প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা হয়েছিল?
বললেন, হ্যাঁ। কেন, রাসূল [সা] কি এ সম্পর্কে কিছু বলেছেন?
হযরত আনাস [রা] হাউজে কাওসার সম্পর্কে রাসূলের [সা] হাদীস তাঁকে শুনিয়ে দিলেন। হযরত মুসয়াব ইবন উমাইর [রা] একজন আনসারী ব্যক্তির ষড়যন্ত্রের রিপোর্ট পেলেন।
এই অপরাধের জন্য তিনি লোকটিকে পাকড়াও করার চিন্তা করলেন। লোকেরা হযরত আনাসকে [রা] কথাটি জানালেন।

www.pathagar.com

তিনি সোজা মুসয়াবের কাছে গিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ [সা] আনসারদের প্রতি ভালো ব্যবহার করার জন্য আমীরদের অসীয়াত করেছেন। তাদের ভালো লোকদের সাথে উত্তম আচরণ এবং খারাপ লোকদের ক্ষমা করতে বলেছেন। এই হাদীস শোনা মাত্র মুসয়াব ইবন উমাইর [রা] খাট থেকে নীচে নেমে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে বললেন, রাসূলুল্লাহর [সা] আদেশের স্থান আমার চোখের ওপর। আমি লোকটিকে ছেড়ে দিচ্ছি।

সাবিত আন-নাবানী বলেন, একদিন আমি বসরার যাবিয়া নামক স্থানে আনাসের [রা] সঙ্গে চলছিলাম। এমন সময় আজান শোনা গেল। সাথে সাথে আনাস [রা] মন্থর গতিতে চলতে শুরু করলেন এবং এভাবে আমরা মসজিদে প্রবেশ করলাম। তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বলতে পার কেন আমি এভাবে হেঁটে মসজিদে এলাম?

তারপর নিজেই বললেন, নামাজের জন্য আমার পদক্ষেপ যাতে বেশি হয় সেই জন্য।

হযরত আনাস [রা] ইলম হাসিলের চেয়ে অর্জিত ইলম অনুযায়ী আমলের ওপর বেশি জোর দিতেন। তিনি বলতেন : যত ইচ্ছা ইলম বা জ্ঞান হাসিল কর। তবে আল্লাহর কসম, আমল না করলে সে সব ইলমের প্রতিদান দেওয়া হবে না।

তিনি আরও বলতেন : প্রকৃত আলেমের কাজ বুঝা ও সেই অনুযায়ী কাজ করা। আর মূর্খদের কাজ শুধু বর্ণনা করা।

তিনি রাসূলুল্লাহর [সা] সুন্নাতের প্রতি অপরিসীম গুরুত্ব দিতেন। এ সম্পর্কে তিনি রাসূলুল্লাহর [সা] হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূল [সা] বলেছেন, যে আমার সুন্নাত ছেড়ে দেবে সে আমার উম্মাতের কেউ নয়। তিনি আরও বলেছেন, যে আমার সুন্নাত অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত।

হযরত আনাস [রা] রাসূলুল্লাহর [সা] ব্যবহৃত বেশ কিছু জিনিস স্মৃতি হিসাবে সংরক্ষণ করেছিলেন। যেমন, জুতো, একটি চাদর, একটি পিয়ালা, তাঁবুর কয়েকটি খুঁটি ইত্যাদি। আনাস [রা] বলতেন, আমার মা উম্মু সুলাইম মৃত্যুকালে আমার জন্য রেখে যান রাসূলুল্লাহর [সা] একটি চাদর, একটি পিয়ালা যাতে তিনি পানি পান করতেন, তাঁবুর কয়েকটি খুঁটি এবং একটি শীলা যার ওপর আমার মা রাসূলুল্লাহর [সা] ঘাম মিশিয়ে সুগন্ধি পিষতেন।

হযরত আনাসের [রা] মত নির্মল চরিত্র, ঈমানের দৃঢ়তা আর রাসূল [সা] ও দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা আমাদের মধ্যেও জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন। #

www.pathagar.com

যতো ভালোবাসা রাসূলের [সা] জন্য

আলতাফ হোসাইন রানা

নবুয়তের তখন একদম শিশুকাল। মক্কার ছোট্ট গন্ডির ভেতর নবুয়তের বাতি তখন জ্বলছে। জাহেলিয়াতের অন্ধকার এই আলোকবর্তিকা গলা টিপে মারার চেষ্টার রত। কিন্তু নবুয়তের আলোক শিখা যে ভবিষ্যৎ তৈরি করতে।

এরকম এক ভবিষ্যৎ আলোক শিশু হযরত শোয়াইব [রা]। শোয়াইব [রা] ছোটবেলা থেকেই বেড়ে উঠেছেন অনেক সহনশীলতার মধ্য দিয়ে। তার উপর দিয়ে অত্যাচারের স্টীম রোলার চলেছে। আর এসব নির্যাতন, অত্যাচার নীরবে সয়ে যাচ্ছেন হযরত শোয়াইব [রা]। আল্লাহর এই বীর সৈনিকের উপর এ ধরনের অমানুষিক নির্যাতন কেমন করে এমন ভাবনা কার হতে পারে? কতোদিন কেই বা সহ্য করে যাবেন? যেমন সহ্য করতে পারেননি আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]। প্রিয় নবীর মন কেঁদে উঠলো, সাহাবা হযরত শোয়াইব [রা]-এর অবস্থা দেখে। সে সময় মক্কা থেকে হিজরতের জন্য অনেক জনকে আমাদের প্রিয় নবী পরামর্শ দিতেন। সকলের মতো একদিন মহানবী [সা] সাহাবা শোয়াইব [রা] কেও মক্কা থেকে হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। নবী মুহাম্মাদ [সা]-এর নির্দেশ কে অমান্য করে! হযরত শোয়াইব [রা] মহানবীর নির্দেশকে খুশী মনে কবুল করে নেন। মহানবীর [সা] আদেশের কাছে, ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকারের কাছে, খোদার সন্তুষ্টির কাছে, স্বদেশের মায়া, স্বীয় সহায়-সম্পদের মায়া, আত্মীয়-স্বজনের মায়া মুহূর্তে উবে গেলো। তার যতো ভালোবাসা সবটুকু ছিলো আল্লাহ ও রাসূল [সা]-এর জন্য।

প্রচুর ঐশ্বর্যের মালিক তখন শোয়াইব [রা]। কোনো কিছুরই অভাব ছিলো না। এত বিত্ত-সম্পদ সবকিছু ফেলে কাউকে কিছু না বলে একদিন হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েন। তার সঙ্গে শুধু পরিধানের পোশাকটুকু আর আত্মরক্ষার জন্য কিছু অস্ত্র ছাড়া আর কিছুই নেই।

ইসলাম প্রচারের যখন কঠিন সময় এবং ইসলামের ইতিহাসে যাকে বলা হতো অন্ধকার যুগ, সে সময়ে মক্কার চারিধারে গুপ্তচরের বেশ আনাগোনা ছিলো।

www.pathagar.com

তাদের নজরদারী ছিলো সকলের উপর। সাহাবা হযরত শোয়াইব [রা] এ যাত্রা ধরা পড়ে যান কুরাইশ গুপ্তচরের চোখে। সংবাদ পেয়ে ছুটে এলো একদল কুরাইশ। তারা শোয়াইব [রা]কে চারিদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলে। শোয়াইব [রা]কে কুরাইশরা মক্কায় ধরে নিয়ে যাবে। কারণ, তাদের ধারণা সাহাবা শোয়াইব মক্কার বাইরে গিয়ে দল পাকাবে। মুসলমানদের দলভারী করবে। সুসংগঠিত করবে। কুরাইশরা তা হতে দেবে কেন?

মহানবী মুহাম্মাদ [সা]-এর প্রিয় সাহাবা শোয়াইব [রা]ও দমে যাবার লোক নন। তিনিও ছিলেন অনেক শক্তিধর। একজন তীরন্দাজ। শোয়াইব [রা] একাই রুখে দাঁড়ালেন মারমুখো কুরাইশ দলটির বিরুদ্ধে। হযরত শোয়াইব [রা] কুরাইশদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা জান, আমি তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ। আমার হাতে একটি তীর থাকা পর্যন্ত তোমরা কেউ আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। তীর ফুরিয়ে গেলে তরবারী আছে। তরবারী ভেঙ্গে গেলে কিংবা হাত ছাড়া হলে তারপর তোমরা আমাকে যা খুশী করতে পারো। তার চেয়ে বরং ভালো, তোমরা মক্কায় আমার যা কিছু ধন সম্পদ যেখানে যা রয়েছে সব নিয়ে নাও আর আমিও চলে যাই। আমাকে যেতে বাধা দিও না।

গুপ্তচর কুরাইশ দল ভাবলো, হযরত শোয়াইব [রা]কে ধরা অনেক বিপদপূর্ণ। তার সাথে সংঘর্ষে আমাদেরও অনেক লোক মারা পড়তে পারে। তার চেয়ে তাকে ছেড়ে দিলেই বরং ভালো। তার প্রচুর ধন সম্পদ রয়েছে, সেসব পাওয়া যাবে। দুনিয়া লোভী কুরাইশ দল পথ ধরলো মক্কার। আর ভোগ বিলাস ধন সম্পদ, মাতৃভূমির মায়া কাটিয়ে রিক্ত নিঃস্ব রাসূল মুহাম্মাদ [সা]-এর প্রিয় সাহাবা হযরত শোয়াইব [রা] অনিশ্চিতের পথে পাড়ি জমালেন হিজরতের জন্য।

মহানবী [সা]-এর হিজরতের পর মদিনার সন্নিকটবর্তী কুবা পল্লীর এক জায়গায় একদিন উঁচু মর্যাদাবান, জ্ঞানতাপস, ইসলামের বীর সৈনিক, রাসূল মুহাম্মাদের [সা] প্রিয় সাহাবা হযরত শোয়াইব [রা] সাথে সাক্ষাত হলো আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর সাথে। রাসূল মুহাম্মাদ [সা] শোয়াইব [রা]কে কাছে ডাকলেন। তারপর বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আল্লাহ এবং তার রাসূলের প্রতি শোয়াইব [রা]-এর এমন উদারতা এবং ভালোবাসা দেখে প্রিয় নবী রাসূল [সা] হযরত শোয়াইব [রা]কে বললেন–বড় লাভের ব্যবসাই করলে শোয়াইব। #

www.pathagar.com

সত্য পথে যারা হার মানেনা তারা

রিয়াজ পারভেজ

হযরত জাবির [রা]! মহান এক সাহাবী। যেন উজ্জ্বল এক নক্ষত্র, যা জ্বলতে থাকে জ্বলজ্বল করে। তেমনি এক সাহাবী ছিলেন হযরত জাবির [রা]। জাবির যখন রাসূলুল্লাহর [সা] হাতে বাইয়াত করছিলেন তখন রাসূল [সা] বলেছিলেন, তোমরা সারা দুনিয়ার মধ্যে উত্তম ব্যক্তি। এই বাইয়াত সম্পর্কে অন্যান্য সাহাবীরা পরবর্তীকালে বলতেন, আমরা মৃত্যুর ওপর বাইয়াত করেছিলাম। কিন্তু জাবির [রা] বলতেন, আমরা মৃত্যুর ওপর বাইয়াত করিনি। আমরা বাইয়াত করেছি এই কথার ওপর যে, আমরা পালিয়ে যাব না।

সাহাবীরা হুদাইবিয়া থেকে চলা শুরু করেন। পথে সুকইয়া নামক স্থানে যাত্রাবিরতি হয়। সেখানে পানি ছিল না। ছিল না কোনো ভালো ব্যবস্থা। হযরত মুয়াজ ইবন জাবালের [রা] মুখ দিয়ে ঘোষণা হলো, কেউ যদি পানি পান করতো। ঘোষণা শুনে জাবির [রা] কয়েকজন আনসারকে সঙ্গে করে পানির সন্ধানে বের হলেন।

দীর্ঘ তেইশ মাইল দূরে কুরসায়া নামক স্থানে পানির সন্ধান পান। সেখানে থেকে মশকে ভরে পানি আনেন। এশার নামাজের পর দেখেন, এক ব্যক্তি উটে সাওয়ার হয়ে হাউজের দিকে যাচ্ছে। তিনি ছিলেন হযরত রাসূলে কারীম [সা]। জাবির [রা] রাসূলুল্লাহর [সা] উটের লাগাম টেনে ধরে উট বসিয়ে দেন। রাসূল [সা] নেমে নামায আদায় করেন। জাবির [রা] নিজেও রাসূলের [সা] পাশে দাঁড়িয়ে নামাযে শরিক হন।

হিজরি ৪০ সনে আমীর মুয়াবিয়ার গভর্নর বসুর ইবন আরতাত হিজায ও ইয়েমেনে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আসেন এবং মদীনায় এক ভাষণ দান করেন। ভাষণে তিনি বলেন, যতক্ষণ জাবির [রা] আমার সামনে হাজির না হবে ততক্ষণ বনু সালামাকে আমান বা নিরাপত্তা দেয়া হবে না।

জাবির [রা] জীবনের আশঙ্কা করছিলেন। তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মু সালামার [রা] কাছে গিয়ে পরামর্শ করেন। উম্মু সালামা [রা] তাঁকে বলেন, আমি

www.pathagar.com

আমার ছেলেদেরকেও বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) করতে বলেছি, তুমিও বাইয়াত করে নাও। জাবির [রা] বলেন, এটা তো হবে গোমরাহির ওপর বাইয়াত। উম্মু সালামা [রা] বলেন, না, এটা হবে মজবুরী বা বাধ্য অবস্থার বাইয়াত। আমার মত এটাই। তাঁর পরামর্শ মতো জাবির [রা] বসুরের সামনে হাজির হন এবং হযরত আমীর মুয়াবিয়ার খিলাফতের সপক্ষে বাইয়াত করেন।

হিজরি ৭৪ সনে হাজ্জাজ ছিলেন মদীনার গভর্নর। তাঁর জুলুম অত্যাচার থেকে সাহাবীরাও নিরাপদ ছিলেন না। তিনি কিছুসংখ্যক সাহাবীর ওপর এতটুকু করুণা করেন যে, তাঁদের ঘাড়ে, আর জাবিরের [রা] হাতে সিলমোহর মেরে দেন।

শেষ জীবনে জাবির [রা] বলতেন, আমি আকাবায় উপস্থিত ছিলাম। হাজ্জাজ ও তার কর্মকান্ডও প্রত্যক্ষ করেছি। আমার চোখের মত কান দু'টিও যদি নষ্ট হয়ে যেত, কতই না ভালো হতো! তাহলে অনেক কিছুই আমাকে আর শুনতে হতো না।

কী আফসোসের কথা! হযরত জাবির শেষ জীবনে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন। চোখেও দেখতেন না। তার ওপর সরকারের জুলুম অত্যাচার তাঁকে আরও কাহিল করে ফেলে। তাঁর মৃত্যু সন হিজরি ৭৮, ৭৭, ৭৪ অথবা ৭৩ বলা হয়েছে। তবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে হিজরি ৭৮ সনে ৯৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন তৃতীয় আকাবায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশেষ দুনিয়া থেকে বিদায়গ্রহণকারী সাহাবী।

জাবির ছিলেন মদীনায় রাসূলুল্লাহর [সা] সাহাবীদের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি। তৃতীয় আকাবায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে এ সময় পর্যন্ত একমাত্র জাবির [রা]ই জীবিত ছিলেন। আর সাহাবীদের যুগও তখন শেষ হতে চলেছিল। অল্পসংখ্যক সাহাবী জীবিত ছিলেন। এই কারণে তৎকালীন মুসলিম উম্মাহর জন্য তাঁর অস্তিত্ব ছিল রহমত ও বরকত স্বরূপ।

হাজ্জাজের জুলুম অত্যাচার তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং নিজেও সহ্য করেছিলেন। তাই মৃত্যুর পূর্বে অসিয়ত করে যান যে, হাজ্জাজ যেন তাঁর জানাযার নামায না পড়ায়।

সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কারও প্রভাব-প্রতিপত্তি জাবিরকে [রা] কক্ষনো বিরত রাখতে অথবা বিপথগামী করতে সক্ষম হয়নি।

হযরত সাদ ইবন মুয়াজ [রা] ছিলেন আউস গোত্রের নেতা। তাছাড়া একজন উঁচু মর্যাদার সাহাবী। তিনি ইন্তেকাল করলে হযরত রাসূলে কারীম [সা] বললেন, আজ আরশ কেঁপে উঠেছে! হযরত জাবির [রা] ছিলেন এমনই এক মর্যাদাবান সাহাবী। তিনি সত্য ও স্পষ্টভাষী।

www.pathagar.com

হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ মদীনার গভর্নর হয়ে আসার পর নামাযের সময়ে কিছু আগে-পিছে করেন। লোকেরা জাবিরের [রা] কাছে ছুটে আসে। তিনি ঘোষণা করেন, রাসূল [সা] জোহরের নামায দুপুরের পরে, আসর সূর্য স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল থাকা পর্যন্ত, সূর্যাস্তের সময় মাগরিব ও ফজরের নামায অন্ধকারে আদায় করতেন। আর এশার সময় লোকদের জন্য অপেক্ষা করতেন। তাড়াতাড়ি লোক সমাগম হলে তিনি তাড়াতাড়ি আদায় করতেন। অন্যথায় দেরি করতেন।

একবার আবদুল্লাহ ইবন জাবির তাঁর বাগানে ফল তিন বছরের জন্য বিক্রি করেন। জাবির [রা] এ কথা জানতে পেরে কিছু লোক সঙ্গে করে মসজিদে আসেন এবং সকলের সামনে ঘোষণা করেন যে, রাসূলুল্লাহ [সা] এমন ধরনের বেচা-কেনা নিষেধ করেছেন। ফল যতক্ষণ খাওয়ার উপযোগী না হয় ততক্ষণ তা বেচা-কেনা জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহর [সা] অনুসরণের আবেগ-উৎসাহ তাঁর মধ্যে এত প্রবল ছিল যে, যে সকল বিষয়ে অনুসরণ আদৌ প্রয়োজনীয় নয়, সে ক্ষেত্রেও তিনি অনুসরণ করতেন।

একবার রাসূলুল্লাহকে [সা] মাত্র একখানা কাপড়ে নামায আদায় করতে দেখেন হযরত জাবির [রা]। এ কারণে তিনিও সেইভাবে নামায আদায় করলেন। লোকেরা যখন বললো, আপনি এভাবে নামায আদায় করলেন, অথচ আপনার নিকট অতিরিক্ত কাপড় আছে। তিনি বললেন, এটা এই জন্য করলাম যে, তোমরা রাসূলুল্লাহর [সা] এই অনুমতিকে দেখে বুঝতে পার।

হযরত রাসূলে কারীম [সা] মসজিদে ফাতহ-এ তিন দিন দু'আ করেছিলেন। তৃতীয় দিন নামাযের মধ্যে দু'আ কবুল হলে তাঁর চেহারা মুবারকে এক প্রকার নূরের চমক খেলে যায়। হযরত জাবির [রা] এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই যখনই তিনি কোন বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হতেন, একটা নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে গিয়ে দু'আ করতেন। রাসূলের [সা] এমনই অনুসারী ছিলেন হযরত জাবির [রা]। তিনি ছিলেন সত্য ও সাহসের উজ্জ্বল প্রতীক। এজন্যই তিনি দুনিয়া ও আখিরাতকে জয় করতে পেরেছিলেন। সফল করতে পেরেছিলেন তার জীবন। মূলত সত্য পথে থাকে যারা হার মানে না তারা। হযরত জাবিরই [রা] তার দৃষ্টান্ত। এমন জীবনইতো আমাদের কাম্য হওয়া উচিত! #

www.pathagar.com

অপসংস্কৃতির কুফল ও আমাদের করণীয়

ইব্রাহিম মন্ডল

আজ আধুনিক বিশ্বে নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়েই চলেছে। বেড়ে চলেছে খুন, ধর্ষণসহ নানা প্রকার নেতিবাচক আচরণ। এ আচরণ ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিতসহ সকল পেশাজীবী মানুষের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। আইন আছে, আদালত আছে, আইনের প্রয়োগ থাকলেও কিছুতেই কিছু যেন হচ্ছে না।

অনেক নারীবাদী সংস্থা ও ব্যক্তিত্ব ভেবেছিলো যে, নারীর ক্ষমতায়ন এবং অর্থায়ন হলে হয়তো নারীর প্রতি সহিংসতা হ্রাস পাবে, সম্মান বাড়বে; সেই সাথে মেয়েরা পূর্ণ স্বাধীনতাও ভোগ করতে পারবে। নারীবাদীদের এ স্বপ্ন খানিকটা সফল হয়েছে বোধ হয়, কিন্তু নারীর মুক্তি আজও আশাব্যাঞ্জক হয়নি, এ কথা দ্ব্যার্থহীনভাবেই বলা যায়।

বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় আগের তুলনায় নারীর ক্ষমতায়ন এবং অর্থায়ন দুটিই হয়েছে। গৃহকর্তী থেকে শুরু করে মেম্বার-চেয়ারম্যান; এমপি-মন্ত্রী, ডিসি-এসপিসহ সবই রয়েছে মেয়েরা। এমনকি বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার সবচেয়ে দায়িত্বশীল এবং গুরুত্বপূর্ণ দুটি পদ; প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিরোধীদলের প্রধান; এ দুটি পদও দীর্ঘদিন যাবৎ ধরে রেখেছে দু'জন মহিলা। অনেকে মনে করেন, এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নারীর ক্ষতায়ন হয়েছে বাংলাদেশে। এ কথা ঠিক যে, কোটা পদ্ধতির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থায়ন করা হয়েছে ব্যাপকভাবে। যে হারে ক্ষমতায়ন হয়েছে, তার সাথে পাল্লা দিয়ে সহিংসতাও বেড়েছে উল্লেখযোগ্য গতিতে।

একথা না বললেই নয় যে, সমাজের সকল পুরুষের ক্ষমতায়ন যেমন সম্ভব হয়নি, তেমনি সকল নারীরও ক্ষমতায়ন যে সম্ভব নয়; তা অনায়াসেই বলা যায়। শুধু বাংলাদেশে নয়, গোটা পৃথিবীতে যেখানে অর্থবিত্ত, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বহু

www.pathagar.com

পুরুষকে লাঞ্ছিত হতে হয়; তারই সমজাত পুরুষের হাতে। মাত্র লাখ টাকার সম্পদ সঙ্গে করে দিনদুপুরেও ছিনতাই, লুট হওয়ার ভয়ে সর্বদা শঙ্কিত থাকেন একজন পুরুষ নিজেই; সেখানে অর্থবিত্ত আর ক্ষমতা দিয়ে একজন নারীর শালিতাহানীর প্রতিরোধ হবে কিভাবে? বিষয়টি অনেক বিজ্ঞজনের কাছেই পরিষ্কার নয়।

নারী একজন পুরুষের সম্পত্তি নয়। রবীন্দ্রনাথ স্ত্রী জাতিকে সম্পত্তি নয়, সম্পদের সাথে তুলনা করেছেন। সম্পত্তি হস্তান্তর যোগ্য, কিন্তু সম্পদ নয়। কাজেই নারীর অর্থবিত্ত থাক আর না থাক, সে নিজেই একটি অমূল্য সম্পদ। নারীর নিরাপত্তার দায়িত্ব; ক্ষমতায়ন বা অর্থায়নের ওপর নির্ভর করে না। যদি তাই হতো, তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা রোমানা মঞ্জুরকে তার চোখ খোয়াতে হতো না। ঢাবির টিএসসি চত্বরে থার্টিফাস্ট নাইটে বাঁধনকে তার সম্ভ্রম হারাতে হতো না। কিংবা ডাক্তার হোসনেয়ারা, আইনজীবী রেহেনাকে ছুরিকাঘাতে মৃত্যুবরণ করতে হতো না।

আসলে নারীর নিরাপত্তা বা শালিতাহানীর বিষয়টি ক্ষমতায়ন কিংবা অর্থবিত্তের মধ্যে শুধু সীমাবদ্ধ নয়। এ সমস্যার সমাধান অন্য কোথাও বা অন্য কোনোখানে।

একথা এখন জোরালোভাবে ওঠে এসেছে যে, মানুষের বা সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন ছাড়া শুধু অর্থবিত্ত ও ক্ষমতা দিয়ে এসব সহিংসতা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। যদি সেটাই হয়; তাহলে আজকের এই সহিংসতার পিছনে কোন শক্তি কাজ করছে? কারা সমাজের এই মানসিকতাকে প্রতিপালন করছে, তাদেরকে আগে চিহ্নিত করতে হবে।

অনেকেই না জেনে নারীর স্বাধীনতার ব্যাপারে ধর্মকে অযথা দোষারোপ করে থাকেন। অন্য ধর্মে কি আছে, সেটা সে ধর্মের লোকদের ব্যাপার, কিন্তু ইসলামে নারীর সম্মান, মর্যাদা, ক্ষমতা, অধিকার ও জীবনবিধান সমুন্নত রাখা হয়েছে। কোথাও কোনো প্রকারে এতটুকুও জুলুম করা হয়নি; বরং অনেক ক্ষেত্রে মেয়েদেরকে অনেক বেশিই সম্মান প্রদান করা হয়েছে। রোজ হাশরের ময়দানে স্ত্রীর সার্টিফিকেট ছাড়া কোনো স্বামী মুক্তি পাবে না। স্ত্রী যদি বলে যে আমার স্বামী ভালো তবেই অনন্ত জীবনের কঠিন আজাব থেকে মুক্তি পাবে। এখন বলুনতো স্ত্রীর কাজ থেকে এই সার্টিফিকেট আদায় করা কতই না কঠিন কাজ এবং তা পেতে হলে তাকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে। ইসলামেই মেয়েদেরকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার দিয়েছে। ভাই-এর সম্পত্তির অর্ধেক এবং স্বামীর অর্ধেক।

www.pathagar.com

ইসলাম বলেছে, 'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।' এভাবেই নারীকে বিরল সম্মানে ভূষিত করেছে ইসলাম।

সুস্পষ্ট ভাষায় বলা যায় যে, মেয়েদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে যারা, তারা হলো কিছু কুরুচিকর বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, নাট্যকার, টিভি-সিনেমার প্রযোজক-পরিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, ফ্যাশান শো, বিজ্ঞাপনী সংস্থাসহ কিছু বহুজাতিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। কেউ হয়তো প্রশ্ন তুলতে পারেন, তারা যে সরাসরি ধর্ষণের সাথে বা শ্লীলতাহানীর সাথে জড়িত, তেমন কোনো খবর তো আমরা দেখি না? এটা সত্য যে, খালি চোখে তাদের অপকর্মগুলো দেখা যায় না। কারণ, তাদের কৌশলটা মারাত্মক অভিনব। তাদের ঐ অভিনব কৌশলের ফরমেট নারীকে খুব সহজেই ধরাশায়ী করতে পারে এবং তা সম্পূর্ণভাবে হাঙ্গামা মুক্ত। শুধু তাই নয়, তারা এত শক্তিশালী যে, তাদের অপকর্মগুলো সহজেই লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যেতে বাধ্য হয়।

আমরা জানি যে, মেয়েদের শরীর থেকে বস্ত্রহরণ করে তাকে প্রকাশ্য জনসম্মুখে নিয়ে আসা অপরাধ এবং তা নারীর শ্লীলতাহানীরই সামিল। অথচ সেই কাজটিই তারা নাটক, সিনেমা, ফ্যাশান শো, মডেলিং, টিভিবিজ্ঞাপন, সুন্দরী প্রতিযোগিতাসহ নানান প্রকার চরিত্র হননকারী প্রোগ্রামের মাধ্যমে করে যাচ্ছে অবলীলায়। নাটক-সিনেমা কিংবা মডেল-বিজ্ঞাপনের মেয়েরা তো স্বেচ্ছায় বস্ত্রহীনতায় ক্যামেরার সামনে পোজ দিতে আসে। মনে রাখতে হবে, ইচ্ছে করলেই একজন মানুষ বিবস্ত্র অবস্থায় জনসম্মুখে আসতে পারে না। সে নারীই হোক আর পুরুষই হোক। কেননা সমাজের একটা মূল্যবোধ আছে, আর সেই মূল্যবোধ পরিপন্থী কাজই বেপরোয়াভাবে চলতে থাকলে সমাজের শৃঙ্খলা ধরে রাখা সম্ভব হয় না এবং সেটাই আজকে অনেক দূর গড়িয়েছে।

একথা না বললেই নয় যে, তথাকথিত এসব বুদ্ধিজীবী ও সংস্থা তাদের নিজেদের মধ্যে লালিত জীবনদর্শন ও আইডোলজিকে সমাজে প্রয়োগ করে, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিকে অবাধ যৌনাচার বা যৌনস্বাধীনতার দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। অবাধ যৌনাচার যে মানবজীবনের শান্তি কেড়ে নিয়ে অস্থিরতা বাড়ায় এবং এতে মেয়েরাই যে সবচেয়ে বেশি নিগৃহীত হয়, এ সহজ সত্যটাকে তারা মেনে নিতে চায় না। ফলে দিনে দিনে প্রসারিত হচ্ছে এসব সহিংসতা।

মানুষের মন ও মেজাজ গঠিত হয় সমাজে প্রচারিত সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে। সে সংস্কৃতি যদি সুস্থ না হয়, মানুষও অসুস্থ হয়ে বেড়ে ওঠে। একটা কথা প্রায় শোনা যায়; আমরা আজ সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া আমাদের মূল্যবোধ পরিপন্থী যে কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করছে; তার

www.pathagar.com

ফলাফলই হচ্ছে আজকে নারীর শ্লীলতাহানী বা ধর্ষণ। মিডিয়ায় যে মেয়েদেরকে বেআব্রম্ন করে দেখানো হচ্ছে; তার প্রতিবাদ আমরা আজ পর্যন্ত কেউই করতে পারিনি। পশ্চিমাদের উদাহরণ টানবেন না। তারা পচে গেছে। এই পচন রোধ করার রাস্তা তারা খুঁজে পাচ্ছে না। আমাদের থেকে তাদের সমাজে মেয়েদের অবস্থা আরো বেশি করুণ। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে; পশ্চিমা সমাজে প্রতি দুই মিনিটে একজন মেয়ে ধর্ষিতা হয়। প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ পশ্চিমাদের বৈধ কোনো বাবা নেই। বাবা না থাকাটা যে সুখকর কিছু, তা কিন্তু নয়। পশ্চিমাদেশগুলোতে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নয় বছরেও মেয়েরা মা হচ্ছে, জন্ম দিচ্ছে জারজ সন্তান আর এই জারজ সন্তানের লালন-পালনের দায়ভার পরছে তার মা-বাবার উপর। অন্যের সন্তান গর্ভে অথবা হাত ধরে বাবার সংসারে নিয়ে আসছে। মা-বাবা এই ভার বহন করতে হিমসিম খাচ্ছে। আজ এই সব বাবা-মা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মামলা করছে, 'যে সন্তান ভালো করার জন্য শাসন করতে পারছি না, যে আমাদের উপদেশ মানবে না তার অপকর্মের দায়ভার কেন আমাদেরকে বহন করতে হবে?' পশ্চিমা দেশগুলোতে সমাজ-কল্যাণ প্রতিষ্ঠানগুলো জারজ সন্তানের ভারে নুজ্য। লাখ লাখ জারজ সন্তান লালন-পালন করতে হিমসিম খাচ্ছে। তারা এখন বিকল্প পথ খুঁজছে। অন্যদিকে ১২/১৩ বছরের মা-বাবা হয়ে পড়াশুনা চুকিয়ে কর্মসংস্থানের খোঁজ করছে অনেক মা-বাবা।

মেয়েরা আজ অধিকারের বিভিন্ন দাবিতে রাজপথে নেমেছে অথচ বিভিন্ন সংস্থায় যে তাদেরকে বিবস্ত্র করে উপস্থাপন করা হয়, তা বন্ধ করার কোনো দাবি তেমন একটা চোখে পড়ে না। কেনো? কাদের ইঙ্গিতে এতবড় একটা বিষয়কে তারা পাশ কাটিয়ে যায়?

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিগত কয়েক দশকের পত্রিকার খবর পর্যালোচনা করে দেখা যায়, যারা ধর্মের অনুশাসন মেনে চলে না, যারা বামপন্থি, যারা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী, যারা নারী-স্বাধীনতার নামে প্রতারণা করে; তাদের দ্বারাই মেয়েরা সবচেয়ে বেশি শ্লীলতাহানীর স্বীকার হয়েছে। এ অবস্থার পরিবর্তন না হলে জাতি যে চোখে অন্ধকার দেখবে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। ধর্ষণ ছেলেরাই করে। কেননা ছেলেদের মানসিকতার কোনো উন্নতি হচ্ছে না বরং অবনতির দিকেই ক্রমান্নয়ে এগিয়ে যাচ্ছে; আর তাতে রসদ যোগাচ্ছে আমাদের শিক্ষা, নিজদেশী ও পরদেশী অপসংস্কৃতি। তথ্য-প্রযুক্তির প্রভাবে ভিতরে ভিতরে আমাদের যুবসমাজ পর্ণগ্রাফি আর যৌনতা নিয়ে মেতে ওঠেছে। বিকৃত রুচিতে অভ্যস্ত হয়ে মেয়েদেরকে তারা পণ্য ভাবতেই বেশি পছন্দ করছে। সেই ভাবনাকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন আরো বেশি বেগবান করে তুলছে।

www.pathagar.com

সংস্কৃতিতে যৌন সুড়সুড়ির ছন্দ থাকবে, আর সেই ছন্দে ছেলে-মেয়েরা নাচবে না, এমন ভাবাটা বাতুলতা মাত্র। আসুন যে সংস্কৃতি মানুষ মানুষের সম্মান ও মর্যাদা দিতে শেখে সেই সংস্কৃতি লালন করি, বাকিগুলো প্রতিরোধ করি।

শিল্প, সংস্কৃতি, সভ্যতা সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষী, শিল্পতাত্ত্বিক, দার্শনিক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামতকেও আমরা আমলে নিচ্ছি না। আবুল মনসুর আহমদ বলেছেন, 'আনন্দ-তৃপ্তি মানুষের পেটের ক্ষুধা এবং যৌন ক্ষুধার মতোই তীব্র।' সুতরাং আমরা যদি সুস্থ স্বাভাবিক সুন্দর পাপাচারমুক্ত সংস্কৃতি দিতে ব্যর্থ হই, তবে সাধারণ জনগণ পাপাচারের পথে ধাবিত হতে বাধ্য। যা বর্তমানেও হচ্ছে, বিশেষ করে আমরা যারা সুস্থ, সত্য সুন্দর সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখি তাদের উপরেই এ দায়িত্ব বর্তায়। এই বিষয়টি নিয়ে তাদেরকেই চিন্তা করতে হবে। ইসলাম মানেই প্রগতিশীল, পরিচ্ছন্ন, সুন্দর। সুতরাং ইসলামী শিল্প-সংস্কৃতি সুন্দর, পরিচ্ছন্ন। ইসলামই পাপাচারে লিপ্ত মানুষগুলোকে পরশ পাথরের মতো সোনায় পরিণত করেছিল। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, সভ্যতাকেও প্রভাবিত করেছিল। আজও সে রকম উজ্জীবিত করা সম্ভব, প্রয়োজন শুধু যোগ্য লোক এবং সুচিন্তিত কর্মপন্থার। সে কর্মসূচি নেয়া এখন সময়ের দাবি।

বর্তমানে আমরা অজ্ঞতাবশত সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা না করায় এবং পৃষ্ঠপোষকতা না দেয়ায়, আমরা অন্যদের প্রভাবিত করা তো দূরের কথা, নিজেরাই জাহেলিয়াতের কালচারে ক্রমাগত নিমজ্জিত হচ্ছি। স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে আমাদের ঈমান, আকিদা, ধর্মীয় মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতাকে নি:শেষ করে দেয়া হচ্ছে। স্লো পয়জনের মতো তারা অপসংস্কৃতি ঢুকিয়ে দিচ্ছে আমাদের কচি কচি নিষ্পাপ ভবিষ্যত প্রজন্মের দেহে। যা হিরোশিমার এটমের চাইতেও মারাত্মক। এখন এমন মনে করা নির্বুদ্ধিতা যে, আগ্রাসী শক্তি আগের মতো খোলা তালোয়ার হাতে ঘোড়ায় চড়ে দেশ জয় করতে আসবে। সংস্কৃতি এখন আগ্রাসনের হাতিয়ার, যা আমাদের জাতিসত্তাকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। হৃদয় মনে স্থান করে নিচ্ছে অপসংস্কৃতি। আমাদের ভূখন্ডে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে যদি আমরা সফলও হই আর কালচারালভাবে সফল না হই তবে রাজনৈতিক সফলতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। অর্থনীতি ও রাজনীতিতে সফল হওয়া আর ঈমান রক্ষা এক কথা নয়। সবার আগে প্রয়োজন ঈমানের হেফাজত। আর তা সংস্কৃতির মাধ্যমেই সম্ভব। আমরা লাখ লাখ সিনেমার হল, শিল্পকলা একাডেমি, নাট্যশালা এবং বিভিন্ন পার্বণগুলোতে কি করবো? এগুলো বন্ধ করে দেবো? এমনটা ভাবা কি আদৌ বাস্তবসম্মত? আমরা চাইলেই কি এসব বন্ধ করে রাখা সম্ভব হবে? এর পরিণতি কি হতে পারে ভেবেছেন? পবিত্র

www.pathagar.com

ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা দুইটি বড় ইসলামী উৎসব। অথচ এই দুইটি ঈদের অনুষ্ঠানে যে কালচার আমরা দেখি তা কতটুকু ঈদের অনুষ্ঠানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? কতটুকু ইসলামিক? সাহিত্য বলুন, সংস্কৃতি বলুন সর্বত্র অপসংস্কৃতির সয়লাব। জাতীয় পত্রিকাগুলোতে যে লেখা প্রকাশিত হয় তার কয়টাতে ঈদের নির্মল আনন্দ থাকে? টিভি চ্যানেলগুলোতে চাঁদ দেখার পর থেকেই শুরু হয় নৃত্য, অশ্লীল সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড। পহেলা বৈশাখ বাঙালী মুসলমানদের সন, এই উপলক্ষে পুঁজিবাদীরা যে কর্মকান্ড ঘটায় তা কি আমাদের সংস্কৃতি? শুধু সমালোচনা করে গলা ফাটালে কোনো লাভ হবে না। বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। দুর্বার গতিতে কাজ করতে হবে। আমার এ মতের সাথে খুব কম লোকই দ্বিমত পোষণ করবেন। সমস্যা দেখা দেয় যোগ্য লোককে উপযুক্ত কাজ দিতে গিয়ে। যোগ্য লোকরা সাধারণত চাটুকার হয় না, কিন্তু আমরা চাটুকারদেরই বেশি পছন্দ করি। ফলে অযোগ্য চাটুকারদের হাতে কাজের ভার দিয়ে পাহাড় সমান অপসংস্কৃতি পাল্টে দিতে চাই। এ মানসিকতা পাল্টাতে না পারলে পরিকল্পনার 'পরী' উড়ে যাবে 'কল্পনা' মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে মাটিতে। তাই আমি মনে করি, খুব শীঘ্রই কালচারাল একাডেমি প্রতিষ্ঠা করে যোগ্য লোককে পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে। বিভিন্ন সেক্টরের দায়িত্ব দিতে হবে আলাদা আলাদা লোকের হাতে। তাদের কাজ করার স্বাধীনতা দিতে হবে, তবে প্রয়োজনীয় গাইডলাইন এবং সমন্বয়ও করতে হবে। সেক্টরভিত্তিক আলাদা বাজেট এবং বার্ষিক টার্গেট নির্ধারণ করে দিতে হবে। এমন লোকদের কাজ দিতে হবে যারা সুচিন্তিভাবে সময় উপযোগী সিলেবাস চালু করে কোর্স বা ডিপ্লোমা পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দিবেন এবং দক্ষ শিক্ষকমন্ডলী ক্লাস নেবেন।

নবী রাসূল, সাহাবীগণ, মুজাদ্দেদ, বিভিন্ন ইসলামী মনীষী ব্যক্তিত্বদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমে নান্দনিকভাবে উপস্থাপন করার সাথে সাথে তা যেন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া যায় সে ব্যবস্থাও নিতে হবে। ইসলামী জীবনব্যবস্থা মানা এবং ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে তার বাস্তব প্রতিফলন ঘটানোর জন্য সবাইকে সচেতন হতে হবে। শিল্প সংস্কৃতির শুধু বাহন নয় সমাজ পরিবর্তনের বলিষ্ট হাতিয়ার। শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমগুলো সর্বশ্রেষ্ঠ নান্দনিকভাবে উপস্থাপন করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি সমাজে তা চালু করাও জরুরী। সর্বক্ষেত্রে ইসলামী সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটানোর জন্য ইসলামী জনতাকে সচেষ্ট এবং ইসলামী সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। ইসলামের কুরআন, হাদিস, ইসলামী বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে কাব্য, সাহিত্য, গল্প, নাটক, সিনেমা, উপন্যাস রচনার জন্য লেখকদের পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে। শিল্পীদের সম্মানী দিতে হবে।

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনী একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এবং তাদেরকে উজ্জীবিত করা, গণচেতনা জাগ্রত করা ছাড়া অপসংস্কৃতির সয়লাব রোধ করা সম্ভব নয়। পত্র-পত্রিকা ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া বাড়াতে হবে। ব্যবহার করতে হবে সকল অডিটোরিয়াম, হলরুম, প্রদর্শনীর গ্যালারি। আমাদের দেশের রাষ্টায়ত্ত ব্যবস্থায় এমন লোকজন বসে আছে যারা ইসলামের নাম শুনলে গা জ্বালা করে অথচ এরা মুসলমান। ইসলামী কোনো অনুষ্ঠান করতে টাকা দিলেও হল বা গ্যালারি দিতে চায় না। ২০১০-১১ সালে আমাদের নিয়মিত ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর জন্যে জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারি পর্যন্ত বুকিং বাতিল করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক। প্রয়োজনে নতুন গ্যালারি সৃষ্টি করতে হবে।
সু-পরিকল্পিতভাবে ইসলামী ব্যক্তিত্ব তৈরির লক্ষ্যে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে গবেষক তৈরি করতে হবে। যে, যে বিষয়ে আগ্রহী তাকে যে বিষয়ের ওপর নিরীক্ষাধর্মী কাজ করতে হবে। এই সব কাজ কোনোভাবে দায়সারা ধরনের হবে না, আল্লাহর দেয়া সৃজনশীল চিন্তা সবটুকু ঢেলে দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিসটিই তুলে আনতে হবে। শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে সে বিষয়ে। মনে রাখতে হবে এখন সবজান্তা নয়, বিশেষজ্ঞের যুগ। ভাষাবিদ, পন্ডিত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছিলেন, 'যে দেশে জ্ঞানী লোকের কদর নেই সে দেশে জ্ঞানী লোক জন্মায় না।' তার মানে, সে সমাজে জ্ঞানী লোকের কদর নেই সে সমাজে জ্ঞানী লোক জন্মায় না। যে দলে জ্ঞানী লোকের কদর নেই সে দলে জ্ঞানী লোক জন্মায় না।'
আমরা যে পণ্ডাদপদ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বসবাস করছি এই সমস্যা আমাদের তীব্র। আমরা কবি-সাহিত্যিক শিল্পীদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে পারিনি। মর্যাদা তো দূরের কথা, সাধারণভাবে বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করতেও ব্যর্থ। আজ লিখতেও লজ্জা হচ্ছে যে, সামান্য খাওয়া পড়া এবং চিকিৎসার অভাবে অসামান্য অনেক প্রতিভাবান হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ হাদিসে বলা আছে; 'তোমরা কেউ যদি দুস্থ কবি-শিল্পীদের সাহায্য করো তবে সে যেন তার মাতা-পিতাকে সাহায্য করলো।' কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকরা দেশ ও জাতির সম্পদ, কারণ এরা দেশ ও জাতি নিয়ে চিন্তা করে, ব্যক্তিচিন্তা, আত্মচিন্তার মতো তাদের সংকীর্ণ মন নয়। তাদের মন প্রশান্ত মহাসাগরের মতো উদার। মেঘমুক্ত আদর্শের মতো পবিত্র। সুতরাং এদের চিন্তা সমাজে বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরই করতে হবে। যারা ইসলামের বিজয় চান তাদেরকেই করতে হবে।
শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার কাজ স্বভাবগতভাবেই বিত্তবানদের ওপর নির্ভরশীল। এক সময় রাজাবাদশারা পৃষ্ঠপোষকতা করতো; এখন করে পুঁজিপতিরা, কর্পোরেট ব্যবসায়ীরা, আধিপত্যবাদী মাড়োয়ারীরা,

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষবাদী লুটেরা শোষকরা। তারাই কবি সাহিত্যিক শিল্পীদের তাদের কর্ম সাধন ও পণ্য প্রচারের জন্য ব্যবহার করছে, ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য ব্যবহার করছে। স্বভাবতই তারা যা বিনিয়োগ করছে লাভ তুলে নিচ্ছে তার হাজার গুণ।

ইসলামকে এরা যেমন তাদের স্বার্থের প্রতিপক্ষ মনে করে তেমনি প্রতিপক্ষ মনে করে ইসলামী কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীদের। ফলে পুঁজিপতি, কর্পোরেট ব্যবসায়ী, আধিপত্যবাদী মাড়োয়ারী, ধর্মনিরপেক্ষবাদী লুটেরা শোষকরা এদের পৃষ্ঠপোষকতা করবে এমনটা কল্পনা করাও অন্যায়। কায়েমী স্বার্থবাদী শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতার তো প্রশ্নই উঠে না। অথচ পানি ছাড়া যেমন বৃক্ষ বাঁচে না, পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া তেমনি শিল্প-সাহিত্যও বাঁচে না। কাজেই কেউ যদি চান এখানে ইসলামের বিজয় ঘটুক, ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ ঘটুক তবে পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্বটা তাদের নিতেই হবে। বিশেষ করে যারা এ দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন এ ক্ষেত্রে তাদের পালন করতে হবে গুরু দায়িত্ব। এ ছাড়া বিভিন্ন ইসলামী সমিতি, সংগঠন, ইসলামী ব্যাংক-বীমা, বিত্তবান ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে পৃষ্ঠপোষকতার জন্যে। আমরা যারা মসজিদ, মাদ্রাসা, এতীমখানা প্রতিষ্ঠাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি তাদের ভেবে দেখা দরকার ঈমান রক্ষার জন্য সাংস্কৃতিক কার্মকান্ডও আজ যথেষ্ট গুরুত্বের দাবীদার। নইলে হাদীসের সেই সময়টির সম্মুখীন হতে হবে যেখানে বলা হয়েছে, এমন এক সময় আসবে যখন কারুকার্যময় মসজিদ থাকবে, কিন্তু সেখানে নামাজ পড়ার জন্য কোন মুসল্লি পাওয়া যাবে না।

একজন লেখক, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্যকার একশটি পান্ডুলিপিও যদি লিখে ড্রয়ারে রেখে দেয় তবে সমাজের কোনো উপকারে আসবে না, যদি তা প্রকাশ করে মানুষের হাতে না পৌঁছে। একজন চিত্রশিল্পী যদি হাজারটা চিত্রকার্য বা ক্যালিগ্রাফি এঁকে স্টোর রুম ভর্তি করে রাখে, যদি প্রদর্শনী না করতে পারে তবে তাও কোনো কাজে আসবে না। তেমনি চলচ্চিত্র এবং নাট্যশিল্পেও।

কাজেই বাংলাদেশে ইসলামি কালচার ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও তার পৃষ্ঠপোষকতায় বিত্তবানদের অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। শিল্পী, সাহিত্যিকদের কাজের মূল্যায়ন করে তাদের যথাযোগ্য পুরস্কার দিতে হবে, সম্মান দিতে হবে। মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করা যাবে না। মৃত্যুর পর দেয়া না দেয়া একেবারেই সমান। মরা ঘোড়াকে যতই ঘাস দেন, সে আপনাকে নিয়ে মরু পাড়ি দিতে পারবে না। ঘাস যদি দিতেই চান জীবিত ঘোড়াকে দেন, সে আপনার কিছুটা হলেও কাজে লাগতে পারে। কারণ পুরস্কার দেয়াই হয়

www.pathagar.com

উৎসাহের জন্যে। কেউ যদি তার কাজের স্বীকৃতি পায় তবে সে উৎসাহ পেয়ে কাজের গতি বাড়িয়ে দেয়। সক্ষম অবস্থায়ই এটা দেয়া উচিত, বার্ধক্যে নয়। তবেই আমাদের মাঝে জন্ম নিবে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। জন্ম নিবে কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক।

নজরুলের ইসলামী গান শুনলে এখন আমাদের চিত্ত উথলে উঠে। আমাদের কোন ইসলামী পর্বই নজরুল ছাড়া হয় না। অথচ তার বিরুদ্ধে ফতোয়ার কোন অভাব ছিল না। নজরুলকে যারা নাকচ করেছিল তাদের পদ্ধতি এস্তেমাল না করে যার যতটুকু ভাল আছে সেটুকু গ্রহণ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে না পারলে অন্তহীন আফসোসই হবে আমাদের নিত্যসঙ্গী। আমাদের নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন সংগঠন, সমিতি, ইসলামী ব্যাংক-বীমা, ধনাঢ্য ব্যবসায়ী, বিত্তবান সমাজসেবক ও সামর্থবান প্রতিষ্ঠানের কর্তা ব্যক্তিরা কি সময় থাকতে এ কথাটুকু বুঝবেন? এ দেশে ইসলামী সাহিত্য সংস্কৃতি বিস্তারে তারা একটু ভূমিকা রাখবেন? যেমন রেখেছিলেন আমাদের নবী এবং নবীর প্রিয় সাহাবীরা? #

www.pathagar.com

এক মৌলিক সাহাবী-কবি

মুস্তাফা মনজুর

এক অসম্ভব প্রতিভাবান কবি ছিলেন হযরত কাব [রা]। তিনি ছিলেন সাহাবী-কবি। রাসূলের [সা] একান্ত সাহায্য, সহানুভূতি ও সাহচর্যে থেকে তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক আলোকিত উজ্জল নক্ষত্র। তৎকালীন কবিদের মধ্যে হযরত কাব [রা] ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর কবিখ্যাতি ছিল আকাশচুম্বি। রাসূল [সা] এই সাহাবী-কবিকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। অন্য সাহাবী-কবিদের মত হযরত কাবকেও অকুণ্ঠভাবে সহযোগিতা করতেন। অনুপ্রাণিত করতেন নানাভাবে। রাসূলের [সা] যে কত ভালোবাসা ছিল কবিদের প্রতি, কত যে আন্ত রিকতা ও দরদ ছিলো তাঁদের প্রতি তার কোনো তুলনাই হয় না। কবি ও কবিতার প্রতি রাসূলের [সা] ছিল বিশেষ অনুরাগ। প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন তিনি কবি ও কবিতাকে। সে কথা আজও ইতিহাসে সমজ্জল হয়ে আছে। বর্তমান সময়ে রাসূলের [সা] সেই আদর্শের অনুসারী কোন নেতা, শাসকের মধ্যে দেখা যায় না। কবি ও কবিতাকে ভালবাসা, কবিদেরকে সার্বিক সহযোগিতা করা রাসূলের [সা] সুন্নত। সেই পথ থেকেও আজকের সময় ও কাল অনেক দূরে সরে গেছে। যেটা খুবই বেদনাদায়ক।

হযরত কাব [রা] রাসূল [সা]কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। ভালবাসতেন আল্লাহর দ্বীনকে। সেই ভালোবাসার জন্য তিনি সকল কিছুই কুরবানি করতে প্রস্তুত ছিলেন। রাসূলের [সা] প্রতি তাঁর কতটা ভালোবাসা ছিলো তার কিছুটা নজির পাওয়া যায় তাঁরই রচিত 'আল্লাহর নূর' কবিতাটিতে। কবিতাটি এখানে তুলে ধরা হলো:

'শুনেছি, আল্লাহর রাসূল আমাকে
দিয়েছেন হত্যার নির্দেশ, আর
আল্লাহর রাসূলের কাছে
আমার আশা তো ক্ষমার!

www.pathagar.com

রাসূল তো আল্লাহর নূর
উৎস তিনি জ্যোতিধারার, আর তিনি
আল্লাহর পথের দীপ্ত মুক্ত তলওয়ার!'

উসমানের [রা] শাহাদাতের দু:খজনক ঘটনায় হযরত কাব [রা] একটি মারসিয়া [শোকগাথা] রচনা করেন এবং আলীকে [রা] আবৃত্তি করে শোনান। তার কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ :

১. উসমান তাঁর হাত দু'টি গুটিয়ে নিলেন,
তারপর দ্বার রুদ্ধ করে দিলেন।
তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করলেন,
আল্লাহ্ উদাসীন নন।

২. গৃহে যারা ছিল তাদের বললেন,
তোমরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না।
যারা যুদ্ধ করেনি আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করুন।

৩. বন্ধুত্ব সৃষ্টির পর আল্লাহ কেমন করে
তাঁদের অন্তরে শত্রুতা, হিংসা ও
বিদ্বেষ ঢেলে দিলেন?
আর কল্যাণ কিভাবে তাঁদের দিকে
পশ্চাদ্দেশ ফিরিয়ে উটপাখির মত দৌড় দিল?

আলী [রা] কবিতাটি শোনার পর মন্তব্য করলেন, 'উসমান আত্মত্যাগ করেছেন। আর এ ত্যাগ ছিল অতীব দু:খজনক। আর তোমরা তখন ভীত হয়ে পড়েছিলে। সে ভীতি ছিল অতি নিকৃষ্ট ধরনের।'

আলী ও মুআবিয়ার [রা] মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঘটেছিল তাতে হযরত কাব [রা] কোন পক্ষে যোগ না দিয়ে উভয়ের থেকে দূরে থাকেন।

সততা ও সত্য বলা ছিল হযরত কাবের [রা] চরিত্রের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যকে যেভাবে তিনি ধারণ করেন সেভাবে অনেকেই ধারণ করতে পারেননি। দু'আ কবুল হওয়ার পর জীবনে কোনদিন বিন্দুমাত্র মিথ্যার আশ্রয় নেননি। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আল্লাহর কসম! যে দিন আমি রাসূলুল্লাহকে [সা] সেই কথাগুলি বলেছিলাম সেদিন থেকে আজকের দিনটি পর্যন্ত আর কোন প্রকার মিথ্যা বলিনি।' তাবুক বিপর্যয় নেমে এলো তখন তাঁর নিজ গোত্র বানূ সালিমা তাঁকে বলতে পেরেছিল, 'আল্লাহর কসম! তোমাকে তো আমরা এর পূর্বে আর কোন অপরাধ করতে দেখিনি।'

www.pathagar.com

হযরত কাব [রা] ছিলেন তাঁর সময়ের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তৎকালীন আরব কবিদের মধ্যে যাঁরা বেশী বেশী কবিতা রচনা করেছেন তিনি তাঁদেরই একজন। জাহিলী আমলেও কবি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সাহিত্য সমালোচকদের মতে, তাঁর কবিতা খুবই উন্নতমানের। মদীনায় রাসূলুল্লাহ [সা]-এর পাশে যে তিনজন কবি কুরাইশ ও তাদের স্বগোত্রীয় কবিদের মুকাবিলায় দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করেন, হযরত কাব [রা] সেই তিনজনের অন্যতম। তাঁরা ইসলামবিদ্বেষী কবিদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতেন। এই তিন বিখ্যাত কবি হলেন হাসসান ইবন সাবিত, আবদুল্লাহ্ ইবন রাওয়াহা ও হযরত কাব ইবন মালিক। তাঁরাই রাসূলুল্লাহ [সা]-এর সাহাবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি।

কাব ইসলাম গ্রহণের পর কুরাইশদের দেবদেবীর সমালোচনা করে প্রচুর কবিতা রচনা করেছেন। তিনি একটি কবিতায় বলেছিলেন:

'আমরা আল-লাত, আল-উয্যা ও
উদ্দাকে ভুলে যাব। তাদের গলার হার
ও কানের দুল ছিনিয়ে নেব।'

রাসূলুল্লাহ [সা]-এর দরবারের প্রধান তিন কবির কবিতার বিষয় ছিল ভিন্ন ভিন্ন। হযরত কাবের কবিতার মূল বিষয় ছিল যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে কাফিরদের অন্তরে ভীতির সৃষ্টি করা এবং মুসলমানদের অন্তর থেকে ভীতি দূর করে তাদেরকে অটল ও দৃঢ় করা। হযরত কাব কবিতায় যুদ্ধের কথা বলে কাফিরদের ভয় দেখাতেন। বলতেন, আমরা এমন করেছি, এমন করছি বা করবো। হাস্‌সান তাঁর কবিতায় কাফিরদের দোষ-ত্রুটি এবং তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা বর্ণনা করতেন। আর ইবন রাওয়াহা কুফরী এবং আল্লাহ ও রাসূলের [সা] অস্বীকৃতি ও অবাধ্যতার উল্লেখ করে তাদেরকে ধিক্কার ও নিন্দা জানাতেন।

হযরত কাবের [রা] ছেলে আবদুর রহমান বলেন, 'আমার পিতা একদিন বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কবিদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তো যা নাযিল করার তা করেছেন। উত্তরে রাসূল [সা] বললেন, একজন প্রকৃত মুজাহিদ তার তরবারি ও জিহবা– উভয়টি দিয়ে জিহাদ করে। আমার প্রাণ যে সত্তার হাতে তার নামের শপথ! তোমরা তো শত্রুদের দিকে [জিহবা দিয়ে] তীরের ফলাই ছুঁড়ে মারছো।'

যখন সূরা আশ-শূআরার ২২৪ থেকে ২২৬ নং আয়াত: "বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে। তুমি কি দেখনা যে, তারা প্রতি ময়দানেই উদভ্রান্ত হয়ে ফেরে? এবং এমন কথা বলে, যা তারা করে না" নাযিল হলো তখন তিন কবি হাস্‌সান, আবদুল্লাহ ও হযরত কাব কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ [সা]-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তাঁরা বললেন, 'হে আল্লাহর নবী! আল্লাহ যখন এ আয়াত

www.pathagar.com

নাযিল করেছেন তখন তো অবশ্যই জেনেছেন, আমরা কবি। রাসূল [সা] তখন তাঁদেরকে আয়াতের ব্যতিক্রমী অংশ: "তবে তাদের কথা ভিন্ন যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহকে খুব স্মরণ করে এবং নিপীড়িত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে" পাঠ করে শোনালেন। তারপর বললেন, 'এ হচ্ছো তোমরা।'

হযরত কাব [রা] ইসলামের প্রতিপক্ষ কুরাইশদের নিন্দায় বহু কবিতা রচনা করেছেন। আল্লাহর দরবারে অন্তত: তার একটি কবিতা যে গৃহীত হয়েছে, সে কথা স্বয়ং রাসূল [সা] বলেছেন।

একদিন রাসূল [সা] হযরত কাবকে বললেন, 'তুমি যে কবিতাটি বলেছো, তাতে তোমার রব তোমাকে ভোলেননি।' কাব জানতে চাইলেন, 'কোন কবিতাটি?' রাসূল [সা] তখন আবু বকরকে [রা] বললেন, 'আপনি কবিতাটি একটু আবৃত্তি করুন তো। আবু বকর [রা] তখন কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনান। প্রাচীন আরবী সূত্র সমূহে কবিতাটি সংকলিত হয়েছে। কবিতাটি এই রকম:

'সাখীনা ধারণা করেছে, সে তার রবকে [প্রভু] পরাভূত করবে।
সকল বিজয়ীদের ওপর বিজয়ী [আল্লাহ] অবশ্যই জয়ী হবেন।'

এখানে সাখীনা অর্থ আটা ও ঘি অথবা আটা ও খোরমা দিয়ে তৈরী এক প্রকার খাবার। এটি ছিল কুরাইশদের খুবই প্রিয় খাদ্য। তারা খেতও খুব বেশী বেশী। এ কারণে কবি কুরাইশদেরকে সাখীনা বলেছেন। এ দ্বারা মূলত: তাদেরকে হেয় ও অপমান করা হয়েছে।

হযরত কাব [রা] কবিতা রচনা করে রাসূলকে [সা] শোনাতেন। মাঝে মাঝে রাসূল [সা] তাতে কিছু শব্দ রদ-বদল করে সংশোধন করে দিতেন। হযরত কাব তা সবিনয়ে গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। যেমন হুবায়রা ইবন আবী ওয়াহাবকে লক্ষ্য করে হযরত কাব [রা] একটি কবিতা রচনা করেন। তার একটি পংক্তি ছিল নিম্নরূপ:

'আমাদের সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করে
এমন সব বীর পুরুষ
যাদের চকচকে ধনুকগুলি তীর নিক্ষেপ করে।'

রাসূল [সা] পংক্তিটি শুনে বললেন, 'পংক্তিটি 'আমাদের দীনের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করে' এমনটি হলে ভাল হয় না?' হযরত কাব [রা] বললেন, 'হ্যাঁ।' রাসূল [সা] বললেন, 'এভাবে হওয়াই উত্তম।' অত:পর হযরত কাব কবিতাটি সেভাবে সাজিয়ে নেন।

www.pathagar.com

সমকালীন আরব সমাজে হযরত কাবের [রা] কবিতা এক অসাধারণ প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। রাসূলে কারীম [সা] হুনায়ন যুদ্ধ শেষ করে যখন তায়েফের দিকে যাত্রা করেন তখন হযরত কাব দুটি কবিতা রচনা করেন। কবিতা দু'টি দাউস গোত্রের ওপর এত গভীর প্রভাব ফেলে যে, তারা তা শুনেই ইসলাম গ্রহণ করে। কবিতা দু'টি নিম্নরূপ:

'তিহামা ও খায়বার থেকে আমরা সকল প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ
বিদূরিত করে তরবারি কোষে আবদ্ধ করে ফেলেছি।
এখন আবার আমরা তাকে যে কোন দু'টির মধ্যে
একটি স্বাধীনতা দিচ্ছি।
যদি তরবারি কথা বলতে পারতো
তাহলে বলতো, এবার দাউস অথবা ছাকীফের পালা।'

দাউস গোত্র যখন উক্ত পংক্তি দু'টি শুনলো তখন তারা ভীত হয়ে পড়লো। তারা বললো, 'এখন মুসলমান হয়ে যাওয়াই উচিত। তা না হলে আমাদের দশাও হবে অন্যদের মত।' এরপর তারা একযোগে ইসলাম গ্রহণ করে।

হযরত কাব [রা] ইসলাম গ্রহণের পর থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্বীয় কাব্য প্রভাকে ইসলাম ও মুসলমানদের সেবায় নিয়োগ করেন। প্রয়োজনের মুহূর্তে তিনি যেমন তরবারি হাতে তুলে নিয়েছেন তেমনিভাবে সাহিত্যের যুদ্ধও চালিয়েছেন। তাঁর জীবনকালে ইসলামের ইতিহাসের সকল ঘটনা তিনি তাঁর কবিতায় ধরে রেখেছেন। বদর যুদ্ধে শহীদদের স্মরণে তিনি অনেক কবিতা রচনা করেছেন। বদরে উবায়দাহ ইবনুল হারেছ শহীদ হন। তাঁর স্মরণে রচনা করেন এক শোকগাথা। উহুদ যুদ্ধ এবং সে যুদ্ধে শহীদদের সম্পর্কে বহু কবিতা তিনি রচনা করেছেন। এ যুদ্ধের অন্যতম শহীদ রাসূলুল্লাহ্ [সা]-এর চাচা সায়্যিদুশ শুহাদা হামযার [রা] স্মরণে তিনি অনেক কবিতা রচনা করেছেন। এ সময় মক্কার পৌত্তলিক কবিদের সাথে তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। হামযার [রা] শানে রচিত একটি মর্সিয়াতে তিনি হামযার বোন সাফিয়্যা বিনতু আবদিল মুত্তালিবকে লক্ষ্য করে বলেছেন:

১. ওঠো সাফিয়্যা, ভেঙ্গে পড়ো না।
হামযার স্মরণে বিলাপের জন্য নারীদের প্রতি আহবান জানাও।
২. মানুষের অন্তর কাঁপানো যে বিপদ
আল্লাহর সিংহের ওপর আপতিত হয়েছে,
সেজন্য দীর্ঘ ক্রন্দনে ক্লান্ত হয়ো না।
৩. তিনি ছিলেন পিতৃ-মাতৃহীনদের জন্য মর্যাদার প্রতীক।

www.pathagar.com

অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় ছিলেন সিংহের মত।

৪. তাঁর সকল কর্ম দ্বারা তিনি শুধু
আহমাদের সন্তুষ্টি এবং আরশ ও ইজ্জতের
একচ্ছত্র মালিক আল্লাহর খুশীই কামনা করতেন।

বীরে মাউনায় রাসূলুল্লাহ [সা]-এর প্রতিনিধিদের নৃশংস হত্যাকান্ডে কবি হযরত কাবের যবান সোচ্চার হয়ে ওঠে। তিনি হত্যাকারীদের নিন্দায় অনেক কবিতা রচনা করেন। মদীনার ইহুদী গোত্র বানু নাদীরের নির্বাসন ও ইহুদী নেতা কাব ইবন আশরাফের হত্যার চিত্র তাঁর একটি দীর্ঘ কবিতায় ধরা পড়েছে। এ ঘটনা লক্ষ্য করে প্রতিপক্ষ কবিদের নিন্দাবাদের জবাবও তিনি দিয়েছেন।

খন্দক যুদ্ধের চিত্রও তাঁর কবিতায় ধরা পড়েছে। প্রতিপক্ষের বাহিনী ও কবিদের নিন্দায় তিনি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছেন। বানু লিহইয়ানের যুদ্ধও তাঁর কবিতায় ধরা পড়েছে। জি-কারাদের ঘটনায়ও তাঁকে সোচ্চার দেখা যায়। খায়বার বিজয়ের চিত্রও তাঁর কবিতায় বিধৃত হয়েছে। মূতার যুদ্ধের শহীদরা তাঁর হৃদয়ে দারুণ ছাপ ফেলেছিল। তাঁদের স্মরণে তিনি রচনা করেছেন আবেগ-ভরা এক কাসীদা। এভাবে রাসূলুল্লাহর [সা] এ মহান কবির জিহবা ইসলামের প্রথম পর্বের সকল ঘটনা ও যুদ্ধে সোচ্চার থেকে আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভার যথাযথ ব্যবহার করে ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর কিছু কিছু পংক্তি আরবী ভাষা–সাহিত্যে প্রবাদ-প্রবচনে পরিণত হয়েছে। হযরত কাবের [রা] নিজ গোত্রের এক ব্যক্তির প্রশংসায় রচিত তাঁর একটি কবিতা আরবী কাব্য জগতে সর্বাধিক বীরত্বব্যঞ্জক হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

হযরত কাবের [রা] একটি বিখ্যাত কবিতা 'বানাত সুয়াদ'। কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না। কবিতাটি এই রকম:

'বার্তা পেলাম আমার পরে রুষ্ট নাকি শ্রেষ্ঠ রাসূল
ভয় কি তাতে এই জগতে সত্যি তিনি ক্ষমায় অতুল।
চিত্তে আশা ভিক্ষে পাব সেই সাগরের বিন্দু বারি
হাজার পাপী অশেষ ভুলে পায় যে ক্ষমা নিত্য তারি।

মাফ করে দিন সে পাক নামে সহজ সুপথ করল যে দান
জ্ঞানের সোপান ন্যায়ের বিধান কোরান যাঁহার পুত অবদান।
নিন্দুকেরা পণ করেছে প্রাণটা আমার হানবে নাকি
সত্য তো নয় বিন্দু তারা সকল তাদের মিথ্যে ফাঁকি।

www.pathagar.com

সাহিত্য

আমার হেথায় রইতো যদি মস্ত কোন মত্ত হাতি
আজব ব্যাপার নজর করে কাঁপত ভয়ে দিবস রাতি।
আশার আলো মিটির মিটির জোনাকসম জ্বলছে মনে
কেইবা জানে দয়ার সাগর উথলে উঠে কোন লগনে।

কাফেরতরাস যুগল বাহু দখিন বাহু রাখনু তাতে
ফেলব না তাঁর পুণ্যবাণী সন্দেহ নেই বিন্দু যাতে।
ভয় শুধু এই, সে সব কথা শুধান যদি রাসূল আবার
নিন্দুকেরা রটাইল যা আমার নামে শহর বাজার।

বাঘ কিবা ছার ভয় করি তায় ভয়ংকর সে বাঘের চেয়ে
অগুণতি বাঘ দাস হয়ে যার কাটায় বনে ভয় লুকিয়ে।
ভোর না হতে বাচ্চাটি যার নাস্তা করে আস্ত নরে
একশ নরের ধুসর দেহের ধুম আয়োজন একের তরে।

সমস্বরে বাঘ যদি তায় সাহস ভরে হামলা করে
হয় না হালাল তিলেক দেরী আছড়ে দিতে মাটির পরে।
হিংস্র পশু রয় যা বনে দিবস রাতি কাটায় ত্রাসে
ভ্রান্তি বশে যায় না মানুষ শংকাতে সেই বনের পাশে।

হাজার সবল হোক না সে বীর যায় যদি সেই কানন মাঝে
লড়ার আগেই হার মেনে যায় শির পেতে দেয় শংকা লাজে।
মানতে হবে দীপ্ত নূরে ব্যপ্ত ভুবন সেই রাসূলের
খোদার গড়া খাস তলোয়ার নিধান ঘেরা দূর ভারতের।

তরুণ কোরেশ জাগলো একা জ্বাললো দেশে দ্বীনের মশাল
বলল ডেকে দূর হয়ে যাক ঘোর কুফরীর আঁধার ভয়াল।
সব পালালো শত্রুতা আর মত্ততাই রইল বেঁচে
চূর্ণ হল রণাংগনে হিংসাকারীর দর্প মিছে।

জাতির বাছা বীর মুজাহিদ বর্ম হল ধর্ম ধ্বজার
দাউদ নবীর বর্ম যেরূপ রণাংগনে জামিন সবার।

www.pathagar.com

সফেদ বরণ বর্মগুলোর গড়ন ধরন নিপুন এমন
সবুজ ক্ষেতে দীঘল ঘাসের ঠাস বুনানী দৃশ্য যেমন।

সংযমী তাই নেইকো গরব বিজয় দেখে নেই উছলন
বিপদ দেখে শংকিত নয়, নয়কো দুখী, নেই বিচলন
চলন তাদের শান্ত ও ধীর কুলীন ভদ্র উটের মতন
কাফ্রী বীরও তাদের দেখে প্রাণ বাঁচাতে চালায় যতন।

আঘাত তাদের এতই কঠিন হাজার যতন ব্যর্থ করে
শত্রু সবায় এক নিমেষে পাঠিয়ে দেবে যমের ঘরে।'

মূলত সাহাবী-কবি হযরত কাব [রা] ছিলেন এক অসামান্য প্রতিভাবান কবি। ছিলেন তেমনি সৌভাগ্যবান। যিনি রাসূলের [সা] প্রত্যক্ষ সোহবত পেয়েছেন। আর কাব্য জগতে তিনিতো হয়ে আছেন এক উজ্জল নক্ষত্রস্বরূপ। তিনি আমাদের কাব্যক্ষেত্রে একজন পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। অমর হয়ে আছেন তিনি। থাকবেন আগামীতেও। বার বার আমাদের স্মরণে আসবেন নানাভাবে হযরত কবি কাব ইবন মালিক [রা]। #

www.pathagar.com

ভাষা ও সাহিত্যে বিশ্বনবীর [সা] ভালোবাসা

আসাদুজ্জামান আসাদ

পৃথিবীর শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দেশে দেশে, বিভিন্ন বংশে, গোত্রে, শহরে, বিভিন্ন ভাষা-ভাষীর মানুষ রয়েছে। প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ মাতৃভাষায় কথা বলে থাকে। আমরা আরবী, ইংরেজী, ফার্সি, উর্দু, তামিল, হিব্রম্ন, স্যামিষ্টিক, বাংলা, হিন্দি, চিনাসহ নানা ভাষায় কথা বলে থাকি। সে হিসাবে বিশ্বনবী [সা]-এর মাতৃভাষা ছিল আরবী। তিনি মাতৃভাষা আরবীকে প্রচন্ডভাবে ভালোবাসতেন। তিনি ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ছিলেন খুবই সজাগ এবং সাহিত্য কর্মে ছিল তার গভীর অনুরাগ। তাই তার আদর্শ বাস্তবায়নে আমাদের হৃদয়-মন হলো ধন্য এবং কর্মজীবন হলো পূর্ণ।

যুগে যুগে, সমাজ জীবনে যে বিষয়ের ওপর যে প্রভাব ছিল, সে বিষয়ের মোকাবিলা করার জন্য মহান আল্লাহ্ মহা গুণের অধিকারী করে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছিলেন। যেমন, হযরত দাউদ [আ]-এর যুগে সুরের প্রচলন ছিল অনেক বেশী। তাই দাউদ [আ]কে মহা সুরের ডালি নিয়ে এ ধরাতে হাজির করেন। শক্তি এবং ঐতিহ্যের প্রভাব নিয়ে ফিরাউন, সাদ্দাম, নমরুদের অন্তর যখন অহংকারের উঁচু পাহাড়ে, তখন মহান আল্লাহ তাআলা হযরত ইব্রাহীম ও সোলায়মান [আ]কে সারা বিশ্বের মহা সম্রাট রূপে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। সারা পৃথিবীতে সবাই যখন যৌবন জোয়ারে ভাসছে, তখন পূর্ণ রূপলাবন্য নিয়ে হযরত ইউসুফ [আ] এই পৃথিবীতে আগমন করেন। মিশরীরা যে সময় জাদু বিদ্যার পারদর্শীতা অর্জন করেন, সেই যুগে হযরত মুসা [আ] স্বর্গীয় আস্থা নিয়ে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। গ্রীকবাসীর চিকিৎসা বিজ্ঞানের যুগে অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে হযরত ঈসা [আ] ধরায় এলেন। তিনি স্বীয় হস্ত স্পর্শে অন্ধকে দৃষ্টি দান, কুষ্ঠকে নিরাময় প্রদান এবং মৃতক জীবন দান করতে পারতেন।

বিশ্বনবী [সা] জন্মের পূর্বে অর্থাৎ জাহেলি যুগে সত্যে পথে চলার জন্য প্রচন্ড হাহাকার ছিল। কিন্তু ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় প্রচুর প্রভাব ছিল। কেননা, পৃথিবীতে যত ভাষা আছে, তার মধ্যে আরবী ভাষার মান-মর্যাদা কয়েক গুণ বেশী। আরবী একটি শব্দের অনেক প্রতিশব্দ রয়েছে। কথিত আছে যে, সেই

www.pathagar.com

সময় এক উট শব্দের দুইশত সমার্থক শব্দ ছিল। যা অন্য ভাষায় ছিল বিরল। আরববাসীরা আরবী ভাষার চর্চা করে সাহিত্যের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। সে সময়ে সাহিত্যের যে প্রভাব ছিল, সেই প্রভাবের প্রতি দৃষ্টি রেখে মহান আল্লাহতাআলা বিশ্বনবী [সা]কে পৃথিবীতে বিশুদ্ধ ভাষার অধিকারী করে প্রেরণ করেন। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝা যায়, বিশ্বনবী [সা] ভাষা এবং সাহিত্যের ওপর অগাধ দখল অর্জন করেছিলেন। বিশ্বনবী [সা] নিজে সুললিত কণ্ঠে ভাষা ব্যবহার করে ভাষার সীমাহীন সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন। কোনদিন কেউ তার মুখে মিথ্যা কথা শোনেনি। তিনি কখনো কোন অসুন্দর শব্দ উচ্চারণ করেননি। মিষ্টি কথা দ্বারা, সবার মন-প্রাণ কেড়ে নিতেন। তিনি কথা বলতেন স্পষ্ট ভাষায়। তার বিশুদ্ধ উচ্চারণে আমরা জিহবার গোড়ায় 'ইলমুল কিরাত' বা মাখরাজের ব্যবহার পাই। বিশ্বনবী [সা]-এর ভাষার সৌন্দর্যতায় বাককুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি দু'জনের সামনে ওসিয়ত এবং লক্ষ্য জনের সামনে নসিহত করেছেন। তিনি যান্ত্রিক সুবিধা ছাড়াই সবার অন্তরকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ভরিয়ে দিয়েছেন। তার কথায় হাজার হাজার সাহাবী ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসেছেন।

বিশ্বনবী [সা] ছিলেন সাহিত্যের একজন ভক্ত ও অনুরাগী। মিথ্যার বিষাক্ত থাবায় সাহিত্য যখন কলুষিত, তখন মহানবী [সা]-এর নির্দেশে সত্য পথের লড়াকু সেনারা সাহিত্য চর্চায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। আয়িশা [রা] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই রাসূল [সা] ইরশাদ করেন, তোমরা কুরাইশদের নিন্দা জ্ঞাপন করে কবিতা আবৃত্তি কর। কেননা এটা তাদের ওপর, তীরের চেয়েও তীব্র আঘাত হানবে।' বিশ্বনবী [সা] বলেন, 'নিশ্চই কোন কোন কবিতায় রয়েছে জ্ঞান ও কৌশল'। সারা বিশ্বে কুরআন ছাড়া এমন কোন গ্রন্থ নেই, যা কেউ এভাবে মুখস্ত করতে পেরেছে। কুরআনের শব্দের অপূর্ব মিল থাকার কারণে অল্পতেই মানুষ তা মুখস্ত করতে পারে। যার অন্তরে কুরআনের স্পর্শ লেগেছে, তার অন্তর চিরকালের জন্য মুগ্ধ হয়ে গেছে। আল কুরআনের আলোকে সব ভাষার সাহিত্য ধন্য হয়েছে। কবিতা প্রসঙ্গে এরশাদ হচ্ছে, 'এবং কবিদের সম্বন্ধে বলা যায়, বিভ্রান্ত লোকেরাই তাদের অনুস্মরণ করে। তুমি কি দেখতে পাও না, তারা উপত্যকায় উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ায়। তদুপরি তারা মুখে যা বলে কাজে তা করে না। তবে যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, এবং আল্লাহর স্মরণে অতিমাত্রায় তৎপর রয়েছে, তাদের সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য নয়।' এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, যারা ঈমান এনেছে তারা কবিতার মাধ্যমেও আল্লাহর জিকির করে থাকেন। এ সব কবির কবিতা সম্পর্কে যখন আয়াত নাজিল হলো, তখন বিশ্বনবী [সা]-এর কাছে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা [রা], কাব ইবনে মালিক [রা], হাসসান ইবনে সাবিত [রা]সহ বড় বড় কবিরা ছুটে আসেন। তারা অশ্রুস্বজল চোখে বলেন, 'আমরা কবি, এখন আমাদের কি উপায় হবে'। তারপর, বিশ্বনবী

www.pathagar.com

[সা] তাদেরকে বলেন, 'তোমরা সম্পূর্ণ সূরাটা পড়, ঈমানদার ও নেককারদেরকে উদ্দেশ্যে করে এ কথা বলা হয়নি'। বিশ্বনবী [সা]-এর কথা শুনে, কবিরা খুশি মনে নিজ নিজ কাজকর্মে ফিরে যান।

আরবী ভাষার ব্যাপারে বিশ্বনবী [সা] বলেছেন, 'তিন কারণে তোমরা আরবীকে ভালবাসবে। যেহেতু আমি আরব, কুরআনের ভাষা আরবী এবং জান্নাত বাসীদের ভাষাও আরবী'। আরব জাতির বিশ্বাস ছিল যে, কবিরা বিশেষ বুদ্ধি ও জ্ঞানের অধিকারী। কবিরা সবসময় কবিতার মাধ্যমে জ্ঞানের কথা বলে থাকেন। ইসলামের পূর্বে জাহেলি বা অন্ধকার যুগে কবিরা গোত্রের মুখপাত্র, শান্তির পথপ্রদর্শক ছিল। যুদ্ধ ক্ষেত্রে শৌর্যবীর্যের 'প্রতীক' হিসাবে থাকত। কেননা সে সময় শাসন ব্যবস্থা ছিল গোত্র ভিত্তিক। গোত্রে গোত্রে মারামারি, যুদ্ধ ও লড়াই চলত। মক্কায় বনু হাশিম এবং বনু উমায়্যা গোত্রের মাঝে তর্ক বিতর্ক হতো। তর্ক বিতর্কের সময় কবিরা নিজ নিজ গোত্রের প্রশংসা করত এবং অপর গোত্রকে নিন্দা করে কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করত। কবিতা রচনা ও আবৃত্তির পর শুরু হতো তরবারির লড়াই। তরবারির লড়াই ছিল জীবন মরণের লড়াই। আরব দেশে অধিকাংশ মানুষই কবিতা চর্চা করত। ওখানে প্রতি বছর বিনোদনের জন্য সাহিত্যের মেলা বসত। সমাজপতি বা গোত্র প্রধানরা মেলায় শ্রেষ্ঠ কবিকে পুরস্কৃত করত। আরবী কবিতায় শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে প্রতি বছরই কবি ইমরুল কায়েস পুরস্কৃত হতো। তার কবিতায় 'ভাষার প্রাঞ্জলতা, শব্দ ব্যবহারের দক্ষতা, উপমা, উৎপ্রেক্ষার অভিনবত্ব, ছন্দের পরিপাট্য আর সর্বোপরি জীবন বোধের এক অপূর্ব দ্যোতনা বিদ্যমান ছিল। তিনি ছিলেন প্রতিভাবান একজন শ্রেষ্ঠ কবি।

মক্কা-মদিনার কাফের ও মুশরিকরা বিশ্বনবী [সা]কে আল্লাহর মনোনীত রাসূল [সা] হিসাবে মেনে নিতে পারেননি। তাই তারা বিশ্বনবী [সা]কে কবি আখ্যা দিয়ে অমান্য করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মহানবী [সা] কোন দিনই কবি ছিলেন না। তিনি জাহেলি যুগের কবিতা পছন্দ করতেন না। এ ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ এরশাদ করেন, 'আমি তাকে কবিতা রচনা করা শিখাইনি এবং তা তার মর্যাদার উপযুক্ত নয়।' পবিত্র কুরআনের বাণী প্রমাণ করে যে, তিনি কবি নন। তার পক্ষে কবিতা লিখা সম্ভব নয়। কবিদের মর্যাদার চেয়ে বিশ্বনবী [সা]-এর পদমর্যাদা অনেক বেশী। বিশ্বনবী [সা] কবিতার প্রতি কৌতুহলী ছিলেন। পৌত্তলিক কবিদের নিন্দা, অপপ্রচার, ব্যঙ্গ এবং বিদ্রুপের জবাব দানের জন্য মদিনার সর্বশ্রেষ্ঠ তিনজন কবি হযরত কাব বিন মালিক [রা], হাসসান বিন ছাবিত [রা] এবং আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা [রা] বিশ্বনবী [সা]-এর পাশে থাকতেন। হাস্‌সান বিন সাবিত ও কাব ইবন যুহাইর [রা] কবিতা লিখে প্রতিপক্ষ কবিদের লিখা কবিতার জবাব দিতেন। এ দু'জন কবি সর্বদা সভা কবি হিসাবে বিশ্বনবী [সা]-এর পাশে উপস্থিত থাকতেন। একদা হযরত কাব ইবন যুহাইর [রা] আরজ

www.pathagar.com

করলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ [সা], আল্লাহপাক তো কবিতা পাঠের নিন্দা করেছেন। রাসূল [সা] বলেন, 'মুমিন তরবারির দ্বারাও জিহাদ করে আবার কবিতা দ্বারাও জিহাদ করে। কবিতার আঘাত তীরের চেয়েও তীক্ষ্ণ হয়।' বিশ্বনবীর এ কথা শুনে বুক টান করে হযরত হাসসান বিন ছাবিত [রা], কাব ইবন মালিক [রা] এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা [রা] সামনে এগিয়ে এলেন। তারা কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করা শুরু করেন।

ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বিশ্বনবী [সা]-এর ভালোবাসা ছিল অপরিসীম। বর্তমান যুগের কবি, সাহিত্যিক, লেখকরা যদি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন কিংবা বিমাতাসুলভ আচরণ করে তবে এ দেশের আলেম সমাজের জন্য তা হবে জাতীয় আত্মহত্যার নামান্তর। ভাষার ব্যাপারে মহান আল্লাহতাআলা বলেছেন, 'এবং তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র সাধন। এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।'

আমরা জাতি হিসাবে মুসলমান। বিশ্বনবী [সা] আমাদের নেতা। তিনি সাহিত্যকে ভালোবাসতেন। সাহাবীদেরকে কবিতা লিখতে পরামর্শ দিতেন এবং কবিতা আবৃত্তি শুনতে পছন্দ করতেন। কেউ যদি তরবারি দিয়ে আঘাত করে, তবে তাকে তলোয়ার দ্বারা প্রতিহত করতে হবে। কলম দ্বারা যারা ইসলামের সৌন্দর্যে হাত লাগাবে তাদেরকে কলমের সাহায্যেই দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে হবে। বিশ্বনবী [সা] বলেন, 'তোমরা, জান মাল এবং জবান দ্বারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো।'

'ভাষা ও সাহিত্য বিশ্বনবী [সা]-এর ভালোবাসা' আমাদেরকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। বাংলা ভাষার কবি, সাহিত্যিক, লেখকবৃন্দ যদি ছড়া, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি লেখার সময় বিশ্বনবী [সা] ও সাহাবী গণের আর্দশকে সামান্যতম অনুসরণ করে তবেই সাহিত্যের আকাশে অসংখ্য আলোময় উজ্জল নক্ষত্র জ্বলে উঠবে। #

www.pathagar.com

সত্যদ্রষ্টা

জামাল দ্বীন সুমন

মরুভূমির তপ্ত রোদে
হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত যে মুখ
তবু সে মুখে রোদমাখা হাসি
তাকে আমি চিনি।

যে মুখ দেখেছি আমি বিশ্বলোকে
যে সুর শুনেছি আমি মহাপৃথিবীতে
যার ধ্যানে যার জ্ঞানে
মানুষ খুঁজে নেয় মুক্তির পথ
সে আমার মহানবী নূর-নবী হযরত।

মানুষকে ভালবেসে
যে দিয়ে গেল মুক্তির পথ
যে পথ চির শান্তির, চির কল্যাণকর
সে পথেই হেঁটে যাবো
সত্যদ্রষ্টার মতো খুঁজে নেবো
তাঁর দেখানো পথ।

ফোটে ফুল

আমীর উল রুমী

বিশ্ব মানবতার পথিক তুমি
হে প্রিয় নবী
হৃদয়ের কোমল বৃক্ষ ছায়ায়
শুনি তোমার শীতল বাণী

www.pathagar.com

অমর বাণীর স্রোতে
ভেঙে যায় সীমারের বুক
বন্ধা মাটিতে ফোটে ফুল
কে পারে তুমি ছাড়া
শুনাতে শানে-নযুল।

পৃথিবীতে আগমন যত মনীষী
সকলের স্মরণে তুমি যে দিকপাল
প্রাচীন অন্ধকারের ভ্রান্ত চেতনায়
জ্বালিয়ে দিয়েছো সত্যের আলো।

উঁচু-নিচু প্রাচীরগুলো ভেঙেছো তুমি
সমভূমির সমতল সমবেদনা
সহসা সয়েছো তুমি শত যাতনা
তবুও স্নেহের স্পর্শে হৃদয় করেছো শীতল।

খোদার প্রতিনিধি

শাহীন আল মামুন

এলো রে এলো খোদার প্রতিনিধি
চারিপাশে উঠলো মোহাম্মাদ বলে ধক্ষনি
দুনিয়ার বুকে এলো নতুন নূরের খনি।

দ্বীনের নবী মোস্তফা এলেন দুনিয়াতে
যার আলোকে আলোকিত হলো সারাজাহান।
নূরের নবী চেয়ে আনলেন নূরের বাণী
পূর্ণ হলো এই ধরাতে কুরআন খানি।

নবী সারা জীবন করলেন যা জবানী
তাই ছিলো আল্লাহর মহান হুকুমের বাণী।
যার কথা শুনেন আপনি গাইরুল আলামীন
মরুর বুকে আনলেন প্রথম ইসলামেরই দিন।

www.pathagar.com

মনের ভিতর রাসূল [সা]

সোলায়মান আকন্দ

রাসূল আমার মনের ভেতর স্বপ্ন হয়ে আছে,
মিষ্টি রোদের আলো হয়ে প্রাণ ভরে যে হাসে।
নূরের রূপে চাঁদের মতো আমার চোখে থাকে,
মধ্যরাতের স্বপ্নক্ষণে ফুল হয়ে যে ফোটে
সেতো নয়নমনি আমাদের প্রিয় রাসূল।

এক দমে আর নামে পথ চলি পথে,
রাখি তারে স্মরণে সারাক্ষণ সাথে।
সবুজ শোভিত প্রকৃতি দুলছে বাতাসে
তোমারই বিচরণ আছে আমাদের চারপাশে।
ভিতর বাহির শুধু তুমি
তুমিহীনে কাঁদি শূন্যতায় আমিও এই মরুভূমি।

প্রশংসিত প্রিয় নবী

সোনিয়া সাইমুম বন্যা

তখনো হয়নি ধুলি ধুসরিত মরুতে সবুজ চাষ,
অনাগত কাল রেখেছিলো বুকে গোলাপের অভিলাষ।
মনিব ভৃত্যের অধিকার ছিলো যোজন যোজন দুর,
নিরালায় একা কেঁদে ফিরে সে তো মানবতা ব্যাথাতুর।

তখনও ছিলো জাহেলিয়াতের তমসায় ঢাকা-চাঁদ,
মেয়ে শিশু যেনো সবচেয়ে বড় জন্মের অপরাধ।
বাবার স্নেহ-মায়া, মমতা মিশে যেতো লজ্জায়,
ফুল না ফুটেই কুঁড়িদের হতো মাটির বুকেতে ঠাঁয়।

বছরের পর বছর চলতো রক্তের প্রতিশোধ,
ছিলো না আদল, ইহসান, ন্যায়-নীতি সাম্যের বোধ।
মানুষে-পশুতে ছিলো না তফাৎ হিংসা-ক্রোধের আগুন,

www.pathagar.com

বিজন মরুর প্রান্তর জুড়ে ছড়াতো রক্ত ফাগুন।

তখনই হঠাৎ ঝাপটায় যেনো মরু ঈগলের ডানা,
তামাম, জাহান, মশগুল হলো পেয়ে সেই নাজরানা।
জান্নাতী সেই নুরের পরশে আলোকিত দশদিক,
তৃষিত মরুর বুকে যেনো আবহায়াতের ঝিকমিক।

হৃদয় থেকে হৃদয়ে ওঠে বিনা তারে সারগাম,
আকাশ বাতাস ধ্বনিত–সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
অবারিত সেই শান্তির ধারা ঝরে পড়ে পৃথিবীতে,
বিক্ষুব্ধতার সৌরভ সব হৃদয়ের আরশিতে।

তার দরদে ধুয়ে যায় যতো অন্যায়-অহমিকা,
মনে ও মননে জ্বলে স্নিগ্ধ সাম্যের প্রীতিশিখা।
তিনি প্রিয় নবী প্রশংসিত রহমত পৃথিবীর।
তারই নুরের রোশনীতে আজ আলোকিত সব নীড়।

মহিমান্বিত রাসূল

স্বপন মোহাম্মদ কামাল

গহীন তিমির রাতে —
শাশ্বত নবী সত্যের আলো জ্বালালেন নিজ হাতে।
আঁধার যুগের খুন রাহাজানি জুলুম হিংসা ত্রাসে
পীড়িতের বুকে শোকের মাতম, পশুরা কুটিল হাসে
পাশবিকতার রুদ্র ঝড়ের মহা প্রলয়ের তোড়ে
মানবতা ধুলো কাদায় মলিন, সত্য বাতাসে ওড়ে।

যেখানে সকল মানুষেরা ছিল ধ্বংসের কাছাকাছি
অগ্নির ঝাঁ ঝাঁ কুণ্ডের পাশে করছিলো নাচানাচি
শোষিতরা ছিলো ব্যথা ভারানত বিভীষিকাময় রাতে
আর্তের দেহে কামড়ের ক্ষত, জুলুমের বিষদাঁতে
দানবেরা সেই উৎপীড়িতের ক্ষত বিক্ষত ঘা-য়ে

www.pathagar.com

লবণ ছিটিয়ে উল্লাসে মাতে দম্ভ নৃত্য পায়ে।
বঞ্চিতদের সেই চিৎকারে সাগরে উঠেছে ঝড়
তবুও সে ঝড় টলাতে পারেনি স্বৈরাচারীর ঘর।
কন্যা শিশুর পরিণতি ছিলো মৃত্যুর পরোয়ানা
বৈষম্যের কালাকানুনের প্রয়োগে ছিলো না মানা
মনুষ্যত্ব ও মানবিক গুণ হারিয়েছিলো যে লোকে
জুলুমের স্রোতে অসহায় যতো ভেসে গেছে দুখে শোকে।

একদিকে মহানন্দের পাশে কান্নার রোল ওঠে
পীড়নের মহা ক্ষিপ্ত দানব ঝটিকার মত ছোটে।
বর্বরতার এরকম দিনে নবী এলো দুনিয়াতে
পাপাচারীদের প্রতিরোধে তিনি বিপ্লবী অভিঘাতে
এগিয়ে এলেন আলোকিত দূত নতুন বার্তা নিয়ে
দিশাহারা আর বঞ্চিত যতো তাঁর ছায়াতলে গিয়ে।

আশ্রয় তারা খুঁজে পেলো আজ সেই মহীরুহ তলে
নব জাগরণে তাদের হৃদয়ে আলোকের জ্যোতি জ্বলে
নবী বললেন, মানব সমাজে ভেদাভেদ ভেঙ্গে দিতে
অস্ত্র ধরতে নিপীড়নকারী শাসকের বিপরীতে
দুর্যোগ রাতে সূর্যের মতো নবীজী উদিত হয়ে
পাশবিকতা ও বৈষম্যের জঞ্জাল দিলো ধুয়ে।

তিনি আহ্বান জানালেন সব মক্কার ঘরে ঘরে –
বিভীষিকা দিন করবই লীন, আজ হতে চরাচরে।
তাগুতি শক্তি রুখে দিতে নবী ধরলেন তরবারী
হিংস্র সকল থাবা হতে তিনি থামালেন আহাজারি
জাহিলী যুগের স্বৈরাচারীর শোষণ পীড়ন যতো
রাসূলের কাছে সেই প্রতিভূরা পরাজিত ক্রমাগত।

ঘোষণা দিলেন– এক আল্লাহর অনুগত হও সব
পবিত্র সেই অনাদি সত্তা তিনিই সবার রব।
আল্লাহ ব্যতীত কোন সৃষ্টির কোনোই ক্ষমতা নাই
জীবনে মরণে আমরা যে আছি তাঁরই করুণাতে ঠাঁই
আমরা সসীম, প্রভু যে অসীম, আমরা যে তাঁরই দাস

www.pathagar.com

তাঁর নির্দেশ মানলেই হবো আলোকিত উদ্ভাস।
আমাদের সব কৃত কর্মের দিতে হবে যে হিসাব
হাসরের মাঠে পুনরুত্থানে চলবে না কোন ভাব।
কোর্‌আনী আইন বাস্তবায়নে সকল শক্তি দিয়ে
তোমরা সকলে সোচ্চার হও ঈমানের তেজ নিয়ে
সংগ্রামী হাতে ধরো হাতিয়ার, অশুভকে করো নাশ
জালিমের মনে শঙ্কা জাগিয়ে প্রতিহত করো ত্রাস।

সেই আহ্বানে দিকে দিকে মহা জাগরণী সঙ্গীতে
একতাবদ্ধ হয়েছে মানুষ কাফেরের বিপরীতে।
দীপ্ত সেনানী বিশ্বাসীগণ প্রত্যয়ে বলিয়ান
ঈমানের জ্যোতি জ্বালাবে বিশ্বে চিরায়ত অম্স্নান
যে কোন মূল্যে কায়েম করবে আল্লাহর হুকুমত
প্রাণ দিয়ে তাই খুঁজে নিলো তাঁরা দুই জগতের পথ।
যাঁরা রাসূলের অনুগত হয়ে করেছেন সংগ্রাম
শহীদ কিংবা হয়েছেন গাজী ইতিহাসে তাঁর নাম
স্বর্ণাক্ষরে শোভিত হয়েছে সম্মানিত সে অতি
সেই সাহাবীরা আজো প্রোজ্জল যেনো তারকার জ্যোতি।

শেষ নবী

মীম ওহিদুজ্জামান

জন্মিলেন শেষ নবী আমিনার কোলে
মহাকালের সাজানো স্নিগ্ধ এ উদ্যানে।
আল-আমিন হলেন সত্য কথা বলে
বঞ্চিত মজলুমের স্বত্ব দিল এনে।

নবুয়াত পেয়ে নবী দাওয়াত দিলে
ইসলাম সমাদর করল গোপনে।
মুসলিমরা মর্দিত অতি নির্যাতনে
অবশেষে মক্কা ছেড়ে মদিনায় গেলে।

মর্সিয়া খাদিজা [রা] ও চাচার মৃত্যুতে

www.pathagar.com

বোরাকে চড়ে গেলেন তিনি উর্দ্ধালোকে।
মক্কা বিজয় করলে বিনা রক্তপাতে
স্পর্শ করেনি হিংসা বিদ্বেষ তোমাকে।

দ্বিষ্ট আসল যখন দ্বীনের ছায়াতে
বিচারহীন করলে ক্ষমা তাদেরকে।

BEST AGRO INDUSTRIES

Best Food For Best Health

। বেস্ট মিনিকেট রাইস (প্রিমিয়াম)
। বেস্ট মিনিকেট রাইস (স্ট্যান্ডার্ড)
। বেস্ট নাজিরশাইল রাইস (প্রিমিয়াম)
। বেস্ট নাজিরশাইল রাইস (স্ট্যান্ডার্ড)
। বেস্ট ডাল (দেশী)

করপোরেট অফিসঃ
১০/জে, শতাব্দী সেন্টার
ইনার সার্কুলার রোড, মতিঝিল
ঢাকা- ১০০০, ০১৭৬১৫১৮৬৫১

ফ্যাক্টরী অফিসঃ
শেরপুর, বগুড়া।
০১৭২২৪৬১৪৭১

www.pathagar.com

সবুজ গম্বুজের ঘ্রাণ

ইবনে নাসিম

অনেকদিন আগে একজন পরিশীলিত কবির কবিতার শিরোনাম দেখেছিলাম 'সবুজ গম্বুজের ঘ্রাণ'। কবি সাহেবের নাম ও কবিতার বিষয়বস্তু কোন কিছুই এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না। বিশেষত হজ্বের মৌসুম ও অতিরিক্ত ভাবাবেগের কারণে মনে করতে না পারলেও সম্ভবত মানবতার মহান বন্ধুকে [সা] উদ্দেশ্য করেই তাঁর এ লেখাটি হবে হয়তো। দীর্ঘদিন পর মানব সভ্যতার কারিগর ও নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষের বন্ধু হুজুরে আকরাম [সা]-এর একান্ত কাছে এসে সবুজ গম্বুজের কথা মনে পড়লো। এই সেই সবুজ গম্বুজ, যার ছায়াতলে শুয়ে আছেন সীমাহীন কৃতিত্বের অধিকারী, সতত প্রবাহমান ঝর্ণাধারা সৃষ্টিকারী রাহমাতুল লিল আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সা]।

এই সেই সবুজ গম্বুজ যার ছায়াতলে তাঁরই পাশে শুয়ে আছেন উত্তাল সংগ্রামমুখর জীবনের সাথী, হিজরতের সাথী, সওর গুহার সাথী, দু:সহ জীবনের সাথী, সারা জীবনের সাথী, এমন কি দীর্ঘ কবর জীবনের সাথী সাইয়েদুনা আমিরুল মুমেনীন হযরত আবু বকর সিদ্দিক [রা]। আরো শুয়ে আছেন সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী, আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার জনক, অর্ধেকটা পৃথিবীর বাদশা আমিরুল মুমেনীন সাইয়েদুনা হযরত ওমরে ফারুক [রা]। আল্লাহর কি অপার মহিমা, সম্ভবত রাসূলের [সা] কোন পূর্ব নির্দেশনা ছিল না। অত্যন্ত নাজুক ও স্পর্শকাতর জীবনের সাথী, সুখ-দু:খে শান্তনাদানকারী হুজুরের সম্মানিত স্ত্রী হযরত খাদীজাতুল কুবরা [রা] নয়, কলীজার টুকরা হযরত ফাতেমা [রা] নয়, আমিরুল মুমেনীন হযরত আলী [রা] নয়, অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ইমাম হাসান ও হোসাইনও [রা] নয় কিন্তু কবর জীবনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় এই দু'জন মহান সাথীকে পাশে নিয়ে সময়ের পথ অতিক্রম করে চলেছেন দূর দিগদিগন্তরের পানে।

উচ্চাংগের মেধাবী ও বুদ্ধিমান, সাহসী বীর, ধৈর্যশীল, আদর্শে অবিচল, সৎ ও ন্যায়পরায়ণ, উদার ও মহানুভব, দাতা, দায়িত্ব সচেতন, বিনয়ী ও ভাবগম্ভীর

www.pathagar.com

এবং প্রিয়ভাষী ও শুদ্ধভাষী চরিত্র মাধুর্য ও আবিলতামুক্ত জীবনধারার আলোক রশ্মি সবুজ গম্বুজের চূড়া থেকে অবিরত বিচ্ছুরিত হয়ে পৃথিবীর প্রতিটি দেশ, প্রতিটি জনপদকে আলোকিত করে চলেছে। এর সুরভিত পবিত্র ঘ্রাণ পৃথিবীকে মোহিত করে চলেছে। পৃথিবীর শেষ অবদি এই আবহ চলবে। যেন সতত প্রবাহিত কোন এক নির্ঝর, যার স্বচ্ছ নির্মল পানি সারা পৃথিবীকে সিক্ত করে চলেছে। তাঁরই রূপের মহিমায় প্রকৃতি বার বার নতুন সাজে আবির্ভূত হয়, পৃথিবী ঢেকে যায় সবুজ বন-বনানীতে, ফুলে-ফলে সুশোভিত হয় মন ও মানস। এই সেই সবুজ গম্বুজ যেন একটি ভালো জাতের গাছ, যার সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেয় তৃণলতাহীন, কুলকিনারাহীন ও অন্তহীন মরভূমির দিকভ্রান্ত পথিক, খরতাপ রোদ্রে একটু ছায়ার জন্য যার প্রাণ ওষ্ঠাগত। এটি এমন একটি গাছ, যার শিকর মাটির অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত এবং শাখা-প্রশাখা আকাশে পৌঁছে গেছে। যার সবুজ পাতা মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণে সাহায্য করে। প্রতিটি মুহূর্তে নিজের রবের নির্দেশে ফলদান করে। যে ফল মানুষ ও পাখপাখালীরা খায় এবং আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করে।

মানবতার পরম সহৃদ সবুজ গম্বুজের নিবিড় ছায়ায় শুয়ে আছেন। যার গভীর চেতনাসমৃদ্ধ মিশন মেঘমালা পেরিয়ে অনন্তের দিগ্বলয় পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। ফলে এই সবুজ গম্বুজ পৃথিবীর প্রতিটি জনপদকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করে। তাই তারা অকৃত্রিম ভালবাসা ও প্রচন্ড আবেগের টানে ছুটে আসে সবুজ গম্বুজের একটু ঘ্রাণ নেয়ার জন্য। প্রচন্ড আবেগের কারণেই তাঁকে নিয়ে এত গান, এত সাহিত্য-প্রবন্ধ, কাব্যমালা ও জীবন চরিত রচিত হয়েছে। এমনটি দ্বিতীয় কোন জীবন চরিত আজো আবির্ভূত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও আর হবে না। এটিও যেন এক অনিশেষ ঝর্ণাধারা। জীবন চরিতের ভান্ডার নৈমিত্তিক যা রচিত হচ্ছে, তা নিত্য নতুনই মনে হয়।

যারা এই আবেশে পাগলের মতো তাঁর দিকে ছুটে আসেন, তাদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলতে চাই যে, এই সবুজ গম্বুজের সত্যিকারের ঘ্রাণ একমাত্র তারাই নিতে পারে, এই স্রোতস্বীনি নির্ঝর থেকে স্বচ্ছ ভালবাসার স্বাদ তারাই গ্রহণ করতে পারে, যারা তাঁর সংগ্রামমুখর জীবনের অনুসারী। যারা নিজ নিজ এলাকায় তাঁর মিশন বাস্তবায়নে রক্ত ঝড়ায়। যারা নিজ মাতৃভুমিতে জেঁকে বসা অসংখ্য প্রভুর নাকপাশ থেকে মানবতাকে রক্ষায় জানমাল খরচ করে। প্রচলিত অসংখ্য বাতিল জীবন ব্যবস্থার স্থলে সত্য-সরল জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় যাদের সময় ও শ্রম ব্যয় হয়।

www.pathagar.com

পৃথিবীর দেশে দেশে মানবতার লাঞ্ছনা যাদের মানবিকতাকে সামান্যতম বিচলিত করতে পারে না। যেখানে মানবজাতি নিকষ অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে, পাশবিকতা, হিংস্রতা, যুলুম ও নির্যাতন রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতিতে রূপ নিয়েছে, শিরক ও পৌত্তলিকতা সমাজের রন্দ্রে রন্দ্রে প্রবেশ করেছে। সমাজ জীবনের প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গে এমন ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে যে, সেখান থেকে উৎকট দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। সাধারণ মানুষ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরতে বসেছে। ক্ষমতাসীনরা রাষ্ট্রীয় অস্ত্রধারীদের জোরে নিদারুণ শোষণ-নিস্পেষণে জাতিকে পিষ্ট করছে। চারদিকে দলিত মথিত হচ্ছে মানবিক মর্যাদা। লাঞ্ছিত ও ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে মনুষত্ব। বিবেক ও মন যেন আজ কঠিন দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে গেছে, যার দরুন কোথাও প্রতিবাদ নেই। হতাশা ও ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাসে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে গেছে। এহেন অবস্থায় রাসূলের [সা] মিশন যে একমাত্র মুক্তির উপায় হতে পারে, তা যাদের মনে ক্ষীণতম আশার আলো জ্বালে না, মানবতার আত্মার আর্তনাদ যাদের কর্ণকুহরে পৌঁছে না। তারা রাসূলের [সা] প্রতি কিভাবে কোন ধরণের ভালবাসা পোষণ করেন, তা আমার বুঝে আসে না।

কিন্তু মনের কান পেতে শুনুন, সবুজ গম্বুজের চূড়া থেকে বয়ে আসা সম্মিলিত করুণ কান্না। মানবতার করুণ লাঞ্ছনায় সবুজ গম্বুজ থেকে সূরা রুমের ৪১ নং সেই আয়াতটি যেন তেলাওয়াত হচ্ছে, 'পৃথিবীর জলে-স্থলে যে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে, তা শুধু মানুষের কৃতকর্মের ফল। এভাবে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করাতে চান। হয়তো তারা সৎপথে ফিরে আসবে।'

নিপীড়িত বঞ্চিত বিপন্ন মানবতার নবী মুহাম্মাদ [সা] যেন ব্যথিত হৃদয়ে বিদায় হজ্জের সেই ঐতিহাসিক ভাষণের বার বার পূনরাবৃত্তি করছেন। রাতের অন্ধকারে মনের চক্ষু দিয়ে লক্ষ্য করুন, এই বুঝি মহাকালের মহান রাষ্ট্রপতি হযরত ওমর [রা] ক্ষুধার্ত মানুষের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছেন। যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি কায়েমের জন্য বার বার তাগাদা দিচ্ছেন সিদ্দিকে আকবর হযরত আবু বকর [রা]। যদি এই কান্নার সুর আপনি উপলব্ধি না করতে পারেন, তবে আপনার আবেগ-অনুভূতি সস্তা মায়াকান্নার রূপ নিবে।

সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর ছিল রাসূলের [সা] মিশনারী জীবন। মিশন কি ছিল তা নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে, 'তিনিই আল্লাহ, যিনি স্বীয় রাসুলকে হেদায়াত ও সত্য জীবন ব্যবস্থা সহকারে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি এই সত্য জীবন ব্যবস্থাকে অন্যসব ধর্মমত ও জীবন ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী করে দিতে পারেন। মুশরেকদের তা যতই অপছন্দনীয় হোক না কেন।' [৬১:৯]। তিনি মুশরেকদের পছন্দ-অপছন্দের তোয়াক্কা না করে, সকল প্রকার বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে সত্য

www.pathagar.com

জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের কাজ সুসম্পন্ন করেছেন। মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টা ও প্রভু আছেন এবং মানুষ তাঁরই গোলাম ও দাস শ্রেষ্ঠতম এই সত্য, যার ওপর সভ্যতার কল্যাণ-অকল্যাণ পুরোপুরি নির্ভরশীল। তিনি সৎ ও নিস্কলুষ সভ্যতার পবিত্র বৃক্ষ রোপন করেছেন। তিনি মানুষের মন-মননে দ্রুব সত্যের রূপ দিয়েছেন। যারা রাসূলের [সা] বিপ্লবী জীবন চরিত্রে মনোনিবেশ করেন কেবলমাত্র তারাই সবুজ গম্বুজের চূড়ায় আলোক রশ্মি দেখতে পায়। তারাই এই গম্বুজের সত্যিকার ঘ্রাণ নিতে পারে। #

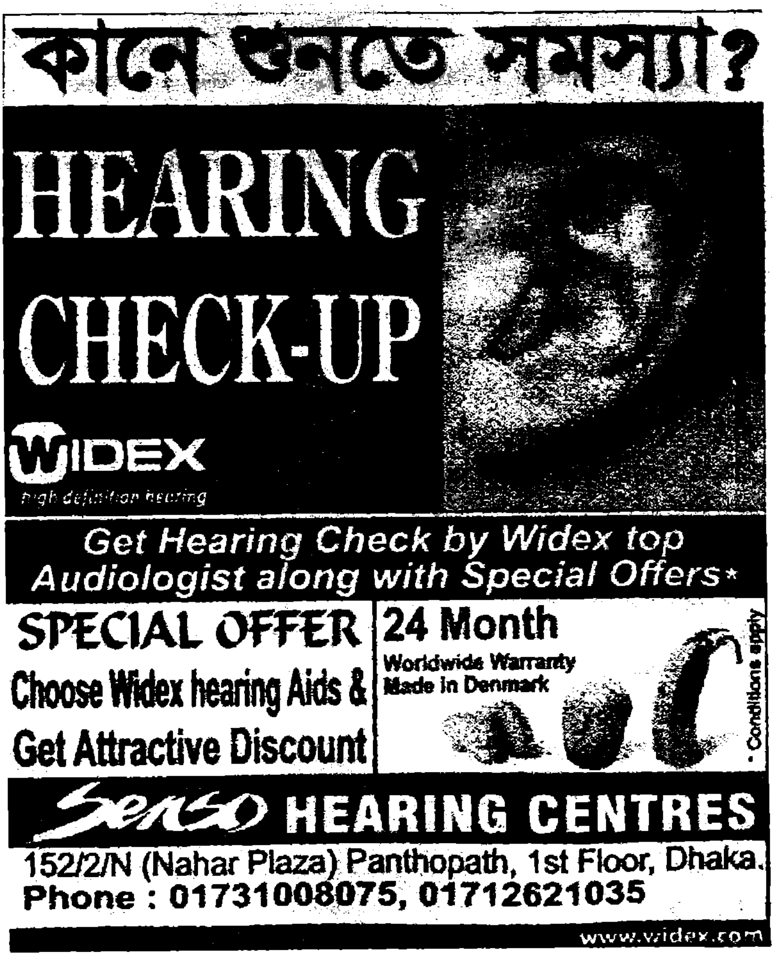

www.pathagar.com

হজ্জ এক ব্যতিক্রমি সফর
ভিন্ন এক অনুভূতি

শহীদুল ইসলাম

পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য অনেক বারই দেশের বাইরে যাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে। আমার পুরনো পাসপোর্টটাতে অনেক সিল পড়েছে। তবে হজ্জের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে যাওয়ার অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। যে কাবাঘরকে সারা দুনিয়ার মানুষ কেবলা হিসেবে ঐদিকে মুখ করে নামাজ আদায় করে, রুকু করে, সেজদা করে সেই কাবাঘরে নামাজ পড়া, তওয়াফ করার অনুভূতিই আলাদা। জনমানবহীন পাহাড়ের মধ্যে শিশুপুত্র ইসমাইলকে রেখে তার মা হাজেরা [আ] পবিত্র সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে পানির খোঁজে দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন, সেই দুই পাহাড়ের মাঝে সা'য়ী করার অনুভূতি যে না গিয়েছে তাকে বোঝানোর মত ভাষা আমার জানা নেই। কলমের কালি দিয়ে তা লিখে শেষ করা আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। যেখানে দাঁড়িয়ে শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সা] বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন, যেখানে দুনিয়ার প্রথম মানুষ হযরত আদম [আ]-এর দোয়া কবুল হয়েছিল সেই আরাফাতের ময়দানে না গেলে আল্লাহকে চেনা এবং তার নৈকট্য লাভে সেখানকার অনুভূতি বোঝানো যাবে না। বহু ধনী মানুষ আছে যাদের হজ্জে যাওয়ার শর্ত পূরণ হওয়া সত্বেও হজ্জে যান না, এটা তাদের দৈন্যতা বই কি। আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রাসূলকে কাছে থেকে চিনতে হলে প্রতিটি দ্বীনদার ঈমানদার মানুষেরই হজ্জে যাওয়া উচিত। আল্লাহ আমাকে সেই তৌফিক নসীব করেছেন, এজন্য রাব্বুল আল আমিনের প্রতি হাজারো শুকরিয়া।

হজ্জে যাওয়ার জন্য নিয়ত করার পর প্রাথমিকভাবে এয়ারলাইন্সকে প্রদেয় মোয়াল্লেম ফি জমা দেয়ার পরও বিষয়টি গোপন রেখেছিলাম। তারপর স্বাভাবিকভাবেই অনেকে জেনেছেন। জানার পরে যাদের সাথেই দেখা হয়েছে

www.pathagar.com

তারাই দোয়া চেয়েছে। অনেকে টেলিফোনে, আবার কেউ কেউ ফেইসবুকে এই বলে দোয়া চেয়েছেন যে, কাবাঘরে গিয়ে যেন আমি দোয়া করি তাদের জন্য। হজ্জের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব যাওয়ার পরও অনেকে ফেইসবুকে এবং ই-মেইলে দোয়া চেয়েছেন। এই অনুভূতিও আলাদা। আমি অভিভূত এজন্য যে, এটা ছিল আমার কল্পনার বাইরে। এত মানুষ দোয়া চেয়েছেন যে, আমি শেষ পর্যন্ত সকলের নাম মনে রাখতে পারি নাই। সেটা সম্ভবও নয়। তবে তাদের কাউকেই আমি বঞ্চিত করি নাই। পবিত্র কাবা শরীফে, সাফা-মারওয়া, মিনা, আরাফাহ, মুজদালেফা, মদীনা শরীফের রিয়াজুল জান্নাহসহ দোয়া কবুলের যত স্বীকৃত ও ঘোষিত জায়গা আছে সব জায়গাতেই তাদের জন্য দোয়া করেছি। আল্লাহ যেন সকলের নেক মকসুদ পুরা করে দেন। হজ্জ এবং ওমরার তওয়াফ ছাড়াও ৩৮ টি পুর্ণাঙ্গ নফল তওয়াফ [সাত পাকে এক তওয়াফ] করেছি আল্লাহর ঘরের চারদিকে। আমার নিজের জন্য, পিতা-মাতাসহ মরহুম আত্মীয়-স্বজন, মুসলিম উম্মাহ, দেশ, জাতি এবং জনগণের জন্য প্রতি তওয়াফের পরই দোয়া করেছি সকলের জন্য। সেখানকার ইমোশন বলে বোঝানো যাবে না। যারা দীলে ঈমান নিয়ে সেখানে গিয়েছেন তারাই বলতে পারবেন যে, হৃদয়ের অন্ত:স্থল থেকে কতো কান্না আসতে পারে। আল্লাহ কবুল করুন। অন্যান্য বিদেশ সফরের সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব গমনের পার্থক্য ছিল এখানেই।

হজ্জ একটি সার্বিক ইবাদত। এতে যেমন সৌদি আরবে সফর খরচ, যতদিন থাকতে হবে ততদিনের থাকা-খাওয়ার খরচ এবং এই সফরকালীন সময়ের জন্য অধিনস্তদের পারিতোষিক খরচ রেখে যেতে হবে তেমনি অর্থের পাশাপাশি থাকতে হবে সফরের মত শারীরিক সামর্থ। তাওয়াফ করা, সা'য়ী করা, মিনা, আরাফাত, মুজদালেফায় গমন করার মত শারীরিক তাগত থাকতে হবে। হুইল চেয়ারে করেও হজ্জ সম্পন্ন করা যায়। আবার আর্থিকভাবে হজ্জ ফরজ হলে শারীরিক সামর্থ না থাকলে কাউকে দিয়ে বদলী হজ্জ করালেও হজ্জের ফরজ আদায় হয়ে যায়। তবে শারীরিক সামর্থ থাকা অবস্থায় হজ্জে যাওয়াই উত্তম। তাতে হজ্জের সব হুকুম আহকাম সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব হয়।

আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের ধারনা যে, শেষ বয়সে হজ্জে গিয়ে সব পাপ মোচন করে আসব। এই ধরনের মনোভাব মোটেও সঠিক নয়। কারণ শরিয়তের স্পিরিট হলো আর্থিক সামর্থ হলেই তাকে হজ্জ সম্পন্ন করতে হবে। ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়ার হাজীদের কাছে শুনেছি, ছেলে-মেয়েরা প্রাপ্তবয়স্ক হলেই পিতা-মাতা তাদেরকে হজ্জে পাঠান। আমাদের দেশে বিয়ের আগে মেয়ে দেখার সময় জিজ্ঞেস করা হয় মেয়ে কি কি হাতের কাজ জানে।

www.pathagar.com

আর ঐসব দেশের জিজ্ঞাস্য থাকে বিয়ের আগে ছেলে-মেয়ে হজ্জ করেছে কিনা। যদি হজ্জ না করে থাকে তবে বিয়ের পরেই আমাদের দেশ বা পাশ্চাত্য জগতের মত হানিমুনের পরিবর্তে নব দম্পতিকে হজ্জে পাঠানো হয়। আর বিয়ের আগে উভয়ে হজ্জ করে থাকলে তাদেরকে ওমরাহ্ করতে পাঠানো হয়। এতে করে হজ্জের হক পুরোপুরি তারা আদায় করতে পারেন। আমাদের দেশের বহু হাজীকে দেখেছি জামারায় পাথর মারতে পারছে না, জামারাহ খুঁজেই পায়নি, ভীড়ের চাপে তারা স্বাভাবিক কাজও করতে পারছে না। আর ভাষা একটা বড় সমস্যা। আরবি ছাড়া কোন কিছুই বোঝে না সৌদি পুলিশ বা অন্যরা। এজন্যই আমার মতে, আমাদের দেশের এই বৃদ্ধ বয়সে হজ্জ করার প্রবণতা ত্যাগ করে যৌবন বয়সে সামর্থ হলেই হজ্জ করতে যাওয়া উচিত। হজ্জে না গেলে আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূলকে [সা] পুরোপুরি চেনা সম্ভব নয়।

আমাদের দেশের হাজীরা সাধারণত তিন প্রকার হজ্জের মধ্যে তামাত্তু হজ্জই করে থাকেন। আমিও তামাত্তু হজ্জই সম্পন্ন করেছি। তার অংশ হিসেবে ঢাকার বাসা থেকেই এহরামের কাপড় পরে নিয়ত করে বিমানে উঠেছি। দীর্ঘ সফর, ক্লান্তি আর নানা বিড়ম্বনা শেষ করে পয়লা মক্কায় বাসায় পৌঁছে গোছল করে খাওয়া সেরে ফ্রেস হয়ে নিই অন্যদের সাথে। গাইডের নির্দেশনা মতে তার সাথে আমরা এক গ্রুপের সবাই রাত ১২ টার পরে যাই ওমরা সম্পন্ন করার জন্য। কারণ তখন একটু ভীড় কম হওয়ার কথা । কিন্তু হজ্জের সময় রাত-দিন ২৪ ঘন্টাই আসলে একই অবস্থা। তার পরেও ওমরা সম্পন্ন করলাম ঐ রাতে। আল্লাহর ঘর চোখে পড়ার সাথে সাথেই যে দোয়া মনের মধ্যে আসে সেই দোয়া কবুল হয়ে থাকে। তাই প্রথম দোয়াই করলাম এই বলে যে, হে আল্লাহ্, এই হজ্জ সফরে যত দোয়া করবো সবই তুমি কবুল করে নিও। তার পরে মনের যত আবেগ ও অনুভূতি জমা করে রেখেছিলাম তার সবটুকু আল্লাহর কাছে চাইলাম। তওয়াফের জন্য মাতাফে ঢোকার সাথে সাথেই গোটা শরীরে শিহরণ বয়ে গেল। আমি অধমের কোনই সামর্থ ছিল না কাবা শরীফে পৌঁছা, যদি আল্লাহ মঞ্জুর না করতেন। তাই বার বার এই দোয়াই করেছি যে, হে আল্লাহ! এই পর্যন্ত যখন তুমি আমাকে নিয়ে এসেছো তখন তুমি আমাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিও না। ওমরার প্রথম ধাপ হিসেবে তওয়াফ করতে হয়। নিয়ত করে হজরে আসওয়াদ পাথরে চুমা দিয়ে শুরু করতে হয় তওয়াফ। কিন্তু ভিড়ের কারণে হজরে আসওয়াদ পাথরে চুমা দেয়া সম্ভব নয়। ঐ কুদরতি পাথর বরাবর হাত রেখে হাতে চুমা খেলেই এই সুন্নত আদায় হয়ে যায়। আমরাও গ্রুপ ধরেই তাই করলাম। ঐ বরাবর সবুজ বাতি বসানো আছে। এখান থেকে তওয়াফ শুরু করে

www.pathagar.com

আবার ঐ পর্যন্ত আসলে এক চক্কর সম্পন্ন হয়। আবারো একই নিয়মে হজরে আসওয়াদ পাথর বরাবর হাত রেখে হাতে চুমা দিয়ে আবার তওয়াফ। এই ভাবে সবুজ বাতি থেকে শুরু করে আবার সবুজ বাতিতে পৌঁছালে আরেক চক্কর। এইভাবে সাত চক্কর হলে এক তওয়াফ সম্পন্ন হলো। সবুজ বাতির ঠিক সোজাসুজিই মাকামে ইবরাহিমে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ার অনেক সওয়াব। তারপর প্রাণভরে দোয়া। এটা দোয়া কবুলের বিশেষ জায়গা। বায়তুল্লাহর চারদিকে তওয়াফের জায়গার নাম মাতাফ। পুরো মাতাফই দোয়া কবুলের জায়গা। তাই তওয়াফকালীন পুরো সময়টাতেই মহান আল্লাহর কাছে দোয়া মুনাজাত করতে হয়। ভয় শুধু মহিলা। কারণ নারী পুরুষ একত্রেই তওয়াফ এবং সা'য়ী করতে হয়। বিশেষ করে তওয়াফের সময় এত ভীড়ের মধ্যে মহিলাদের কাছ থেকে নিজেকে বাঁচানো বেশ কঠিন। আর বাঁচাতে না পারলে অপার সওয়াবের জায়গায় কঠিন গুনাহ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। মক্কায় একমাস অবস্থানকালে যতবারই তওয়াফ করেছি ততবারই এই সমস্যায় পড়তে হয়েছে, যা সবাইকে পড়তে হয়। বিশেষ করে সোমালিয়া, নাইজেরিয়ানসহ কালো নারীরা বেপরোয়া। মোহররম আত্মীয়ের সাথে মহিলাদের তওয়াফ করার বিধান থাকলেও এই কালো নারীদের সাথে তেমন কাউকে দেখা যায় না। তারা যেমন লম্বা তেমন গায়ে শক্তি। পর পুরুষ মানে না, তারা ঠেলে সামনে চলে যায়। তখন পুরুষ মানুষের সাথে তাদের শরীরের ঘষা লেগে যে গুনাহের অংশীদার হচ্ছে সেই অনুভূতিও তাদের আছে বলে মনে হয় না। আবার তারা থাকে দলবদ্ধ। একসাথে হয়তো ৫ থেকে ২০ জন পর্যন্ত। তাদের সাইড দিতে গিয়ে বিপরীত দিকে সরে দাঁড়ালে দেখা যায় যে, সে দিকেও অন্য নারী। তখন লা হাওলা লা কুওয়াতা, আস্তাগফিরুল্লা পড়া এবং আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এমন ঘটনা অনেক বারই ঘটেছে যা সবারই ঘটে। তবে আমি কতটা নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছি সেটাই আল্লাহর কাছে বিচার্য বিষয়। আশার কথা হলো, এবার হজ্জের পরে কাবা শরীফের ছাদ খুলে দেয়া হয়েছিল তওয়াফের জন্য। উপরে মহিলা আছে, তবে ভীড় কম থাকায় নারীদের স্পর্শ থেকে বাঁচার সুযোগ ছিল। পর নারীর সাথে শরীরের স্পর্শ এমনিতেই গুনাহের কাজ। তারপর যদি তা হয় আল্লাহর ঘরের সামনে! ভাবাই যায় না। ছাদ খুলে দেয়ার পর আমি অধিকাংশ নফল তওয়াফই ছাদে করার চেষ্টা করেছি। তবে ছাদের তওয়াফের বৃত্তটা এত বড় যে সাত পাক দিতে কম পক্ষে ৫ কিলোমিটার হাঁটতে হয়।

www.pathagar.com

তওয়াফের পরে মাকামে ইবরাহিমে দুই রাকাত নামাজ শেষে জমজমের পানি পেট ভরে খেতে হয়। আল্লাহ যেন আমাকে পর্যাপ্ত হালাল রুজি দিয়ে দেন, প্রয়োজনীয় জ্ঞান দেন এবং রোগ ব্যাধি থেকে মুক্তি দেন। এই দোয়া করে তিন শ্বাসে জমজমের পানি খেতে হয়। এটা কুদরতি পানি যার সুচনা হয়েছিল হজরত ইবরাহিম [আ]-এর শিশুপুত্র হযরত ইসমাইল [আ]-এর পায়ের আঘাতে। সাধারণ পানি নয়, এতে রয়েছে আল্লাহর কুদরত। সেই সাড়ে ৫ হাজার বছর ধরে প্রতিদিন তোলা হচ্ছে লাখ লাখ লিটার পানি জমজম কুয়া থেকে। কিন্তু তা অফুরন্ত। অথচ এই পবিত্র কাবা ও তার আশপাশের এলাকা শুধু মরুভূমিই নয় পাহাড় আর পাথরে ভরা। আল্লাহর বিশেষ কুদরত ছাড়া সেখানে এরূপ পানির কুপের কথা চিন্তাই করা যায় না। বর্তমানে কূপের উপর দিয়ে তাওয়াফ হয়। বেশ কিছু বছর আগেই মাতাফের নীচ দিয়ে পাইপ করে কুপের পানি তোলার যন্ত্রপাতি কাবা মসজিদের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর সেটা সাফা-মারওয়া পাহাড়ের এলাকায়।

তাওয়াফের পরেই সা'য়ী করতে হয়। এটা ওমরাহ এবং হজ্জের অবশ্য পালনীয় অংশ বা ফরজ। এই দুই পাহাড়ই দোয়া কবুলের জায়গা। এই স্থানেই পানির জন্য ইসমাইল [আ]-এর মা হাজেরা [আ] পানির খোঁজে দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন। সেই ঘটনা স্মরণে ৭ বার দৌড়াদৌড়ি করতে হয় এই দুই পাহাড়ের মাঝে। সাফা থেকে সামান্য দূরেই মারওয়ার দিকে যেতে প্রায় দেড় শ গজের মত এলাকায় সবুজ বাতি দিয়ে চিহ্নিত করা আছে। পুরুষ হাজী বা ওমরাহকারীকে এই এলাকা দৌড়ে অথবা জোরে হেঁটে অতিক্রম করতে হয়। মহিলাদের জন্য অবশ্য স্বাভাবিক হেঁটে গেলেই চলে। মা হাজেরা এই জায়গা দিয়ে অতিক্রমের সময় তার শিশুপুত্র ইসমাইলকে দেখতে পাচ্ছিলেন না পাহাড়ের আড়ালের কারণে। তখন ইবলিস তাকে বিপথগামী করতে উদ্যত হয়েছিল। মা হাজেরা তখন জোরে হেঁটে এই অংশটুকু অতিক্রম করেছিলেন। সে জন্যই এই অংশটুকু দ্রুত অতিক্রম করতে হয়। বর্তমানে ভীড় সামলে সা'য়ী করার সুবিধার্থে আন্ডাগ্রউন্ড থেকে শুরু করে চারতলা পর্যন্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর সে কারণে সাফা ও মারওয়া পাহাড় কাটতে হয়েছে। স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ পাহাড়ের সামান্য একটু অংশই আছে।

সা'য়ী করার পরে মাথা মুন্ডন করলেই ওমরার কাজ শেষ। এখন এহরাম খোলার সময়। আবার এহরাম পরতে হবে হজ্জের উদ্দেশ্যে মিনাতে যাওয়ার সময়। ৮ জিলহজ্জ তারিখে মিনাতে যাওয়া বাধ্যতামূলক। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভীড় সামাল দেয়ার জন্য ৭ তারিখ রাতেই নিয়ে যাওয়া হয় হাজীদের মিনাতে।

www.pathagar.com

৮ তারিখ পর্যন্ত মিনাতে অবস্থানের পর ৮ তারিখ রাতেই হাজীদের নিয়ে যাওয়া হয় আরাফাতের ময়দানে। ৯ জিলহজ্জ সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা হজ্জের ফরজ। সেখানে জোহর, আসর এক সাথে নামাজ পড়তে হয়। প্রচন্ড খরতাপের মধ্যে হাজীদের সারাদিন কাটাতে হয় নির্ধারিত তাবুতে। মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের লাগানো নিমগাছগুলো এখন বেশ বড় হয়েছে। অরো নিমগাছ লাগোনো হয়েছে আরাফার মযদানে। এতে হাজীদের কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব হয়েছে। সৌদি আরবে নিমগাছকে শহীদ জিয়ার স্মরণেই 'সাজারায় জিয়া' বা 'জিয়া গাছ' বলা হয়। এবার ৯ জিলহজ্জ তারিখে আরাফাতের ময়দানে তাপমাত্রা ছিল ৪৫ থেকে ৪৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আর সেটা ছিল শুক্রবার। হাজীরা যেহেতু মুসাফির তাই জুমার নামাজ পড়া জরুরী নয়। তারপরেও অনেকে মসজিদে নামিরায় জুমার নামাজ পড়তে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। যা প্রয়োজন ছিল না। কারণ আরাফাতে ঐদিন কোন এক সময় অবস্থান বাধ্যতামূলক। আবার হাজীর সামনে আরো অনেক কঠিন কাজ বাকি রয়েছে বিধায় তার জন্য সুস্থ থাকাটা বেশী জরুরী। এক টুকরো সাদা কাপড় পরণে আর এক টুকরো সাদা কাপড় গায়ে জড়ানো অবস্থায়, যা কাফনের কাপড়ের তুল্য সেটাই হাজীদের পোশাক। লাখ লাখ হাজীর লাব্বাইক ধক্ষনিতে মুখরিত আরাফার ময়দান। খাস দিলে আল্লাহর কাছে তওবা করার পর দোয়া করলে আল্লাহ তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না। আল্লাহ নিজেই বলেছেন, তার জন্য দোয়া কবুল করা তখন ওয়াজেব হয়ে যায়। আল্লাহকে পাওয়ার এ এক অপার সুযোগ যা সবার হয় না। তাই প্রতিটা মুহূর্তই কাজে লাগানো সকলের উচিত।

আর সূর্যাস্তের পর হাজীদের রওয়ানা দিতে হয় মুজদালেফার উদ্দেশ্যে। সেখানে মাগরিব ও এশা এক সাথে পড়তে হয়। তবে আরাফাতের ময়দান থেকে মুজদালেফায় পৌঁছাতে যত রাতই হোক মাগরিব পড়ি নাই, সে জন্য বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। মুজদালেফায় পৌঁছানোর পর এই দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্রে পড়ার পর খোলা আকাশের নীচে রাত কাটাতে হবে। পাথর, বালি আর গাড়ির শব্দের মধ্যেও ঐ রাতে এমন ঘুম হয় যা অন্য সময় কল্পনাও করা যায় না। পরের দিন ফজরের নামাজের পর হাজীদের ফিরে আসতে হয় আবার মিনাতে। ১০ জিলহজ্জ হাজীদের সবচেয়ে পরিশ্রমের দিন। যদিও ঈদের দিন কিন্তু হাজীদের ঈদের দিন সবচেয়ে কষ্টের দিন। ঐদিন সকাল থেকে সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত যে কোন সময় জামারায় বড় শয়তানের উদ্দেশ্যে ৭ টি পাথর মেরে কুরবানী করতে হয়। কুরবানী সম্পন্ন হলে মাথা মুন্ডন করার পর এহরাম খুলে

www.pathagar.com

ফেলে স্বাভাবিক নিয়মিত পোশাক পরা যায়। সবাই এইদিন এহ্রাম খোলার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সামনে বাকি আরও তাওয়াফে জিয়ারাহ্ ও সা'য়ী করা যা হজ্জের অন্যতম ফরজ। এহ্রাম পরা অবস্থায়ও তা করা যায় যদি তার আগে কুরবানী না হয়ে থাকে। তবে ১০ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত যেকোন দিন এই তওয়াফ ও সা'য়ী করা যায়। আমরা মুজদালেফা থেকে সকালে মিনাতে এসে গোসল করে নাস্তা সেরে তারপর জামারায় পাথর মেরেছি। পাথর মেরে মক্কাতে বাসায় ফিরে এসে ঐদিনই বিকেলে কুরবানী সম্পন্ন করেছি নিজেদের উদ্যোগে বাজার থেকে দুম্বা কিনে। মাথা মুন্ডন করে রাতের খাবার খাওয়ার পরে গভীর রাতে তওয়াফ ও সা'য়ী করে মিনার তাঁবুতে ফিরেছি শেষ রাতে। পরের দিন ১১ জিলহজ্জ জামারায় ৭ টি করে ২১ টি পাথর মেরে আবার মিনাতে ফিরে এসে রাত থাকতে হয় তাবুতে। ১২ তারিখে আবারো জামারায় ২১ টি কংকর নিক্ষেপের পর আমরা আর মিনাতে ফিরে যাইনি, মক্কাতে বাসায় চলে এসেছি। ১২ তারিখ সূর্যাস্তের আগেই মিনা ত্যাগ না করলে ১৩ তারিখ বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে মিনাতে এবং ঐদিনও সূর্য হেলে পড়ার পর আগের দিনের মত জামারায় ২১ টি পাথর নিক্ষেপ করে তারপর মিনার তাবু ত্যাগ করতে হবে।

৭ জিলহজ্জ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত এই ৭ দিনই মূলত হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা। মিনা,আরাফাত, মুজদালেফা, জামারাহ প্রতিটি জায়গাই গুরুত্বপূর্ণ এবং দোয়া কবুলের জায়গা। লাখ লাখ হাজীর মধ্যে দলছুট হলেই হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। কিছু অব্যবস্থাপনা বা ত্রুটি স্বীকার করেই নিতে হয়। হজ্জ মানেই কষ্ট। কষ্ট স্বীকার করতেই হবে। আমাদের মোয়াল্লিম নং ছিল ৭৭। যার দায়িত্বে ছিলেন পাকিস্থানী নাগরিক। আরাফাতের ময়দানে সন্ধ্যার পর থেকেই পাকিস্ত ানসহ অন্যান্য দেশের হাজীদের তারা মুজদালেফায় দ্রুত নিয়ে গেলেও আমরা বাংলাদেশী হাজীরা পড়েছিলাম বিপাকে। রাত ১২টা পর্যন্ত অপেক্ষার পর যখন পুরো আরাফাতের ময়দান ফাঁকা হয়ে গেছে তখনও আমরা দেড় শতাধিক বাংলাদেশী হাজী পড়ে আছি। আমাদের এই অবস্থা হেলিকপ্টারে বার বার অবলোকন করে সৌদি বিমান বাহিনী। পুলিশ বার বার টহল দিতে থাকে। এক পর্যায়ে পুলিশের ম্যানেজ করা তিনটি গাড়িতে আমরা যে যেভাবে পেরেছি মুজদালেফায় পৌঁছেছি। এই অবস্থার মধ্যে আমাদের গ্রুপের এক মহিলা হারিয়ে যায়। পঞ্চাশোর্ধ বিধবা মহিলার মোহররম তারই ছোট ভাই এবং গাইডসহ সবাই হজ্জ মিশন, সৌদি পুলিশসহ সব জায়গায় খবর দেন। পরে তৃতীয় দিনে প্রথমে হারাম শরীফে এবং পরে মক্কায় পূর্বের বাসায় পৌঁছতে সক্ষম হন তিনি

www.pathagar.com

অন্য গ্রুপের বাঙ্গালী মহিলা হাজীদের সহায়তায়। তিনি মুজদালেফায় বাথরুমে যাওয়ার সময় নিজের পরিচয়পত্রসহ সমস্ত কাগজপত্র এমনকি মোবাইল ফোনও সঙ্গীদের কাছে রেখে গিয়েছিলেন। পরে আর পথ চিনে ফিরতে না পারার কারণে এই ঝামেলায় পড়েন। তবে একটা কথা, কোন হাজীর হারিয়ে তিন দিনের বেশী থাকার সুযোগ নেই। আল্লাহর রহমত এর মধ্যে তাকে পাওয়া যাবেই। আর যদি তিনি ইন্তিকাল করেন তাহলে ভিন্ন কথা। কাবা শরীফে তার জানাজা হবে এবং পাশেই নির্ধারিত কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

হজ্জের দিনগুলোতে এহরাম পরা অবস্থায় মানুষের যে আহাজারি, আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের যে চেষ্টা সেটা চোখে না দেখলে বোঝা যাবে না। এ জন্যই যে একবার হজ্জ করতে যায় সে বার বার যেতে চায়। মনে হয় এমন যে, মানুষ যেন বার বার আল্লাহকে পেতে মক্কাতে ছুটে যায়।

হজ্জের মুল আনুষ্ঠানিকতা ৭ থেকে ১০ দিন হলেও হজ্জের সফর সাধারণত আমাদের দেশের হাজীদের জন্য এক মাস থেকে দুই মাস পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই সময়ে মক্কাতে যতদিন থাকা যায় ততদিনই আল্লাহর রহমত। যত বেশী তওয়াফ করা যায় তত বেশী সওয়াব। দ্বিতীয় আর কোন জায়গা নেই দুনিয়াতে যেখানে তওয়াফ বা হেঁটে হেঁটে এত সওয়াব কামাই করা যায়। প্রতিদিন কত তওয়াফ করা যায় এমন প্রতিযোগিতাও চলে সাথীদের মাঝে। আর প্রতি ওয়াক্ত নামাজ কাবা শরীফে পড়তে পারার মর্যাদাই আলাদা। অন্যান্য মসজিদের চেয়ে কাবা শরীফে প্রতি ওয়াক্ত নামাজে এক লক্ষ গুণ বেশী সওয়াব। তবে কিছু লোকের মাঝে ভুল ধারনা বিদ্যমান। তারা রাতে একাধিক তওয়াফ করে সকালে ফজরের নামাজ কাজা করেছেন। এমন হাজী বহু দেখা গেছে। ফরজ আর নফলের মধ্যে তারা পার্থক্য করতে পারেন না। প্রায়োরিটি নির্ধারণ করতে পারেন না। এটা কবিরাহ্ গুনাহ। নফল সওয়াব কামাই করতে গিয়ে ফরজ যারা মিস করেন তারা বড়ই হতভাগা।

মদীনায় যাওয়া হজ্জের অংশ নয়। তবে মদীনা মনোয়ারায় শুয়ে আছেন স্বয়ং রাসূল [সা]। তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ছালাম দিলে জবাব পাওয়া যায়। তার সুপারিশ ছাড়া উম্মতে মুহাম্মদীর কেউ বেহেশতে যেতে পারবে না। তাই মদীনায় কয়েক দিন থাকা এবং প্রতিদিন এক বা একাধিকবার রাসূলের রওজায় সালাম দেয়ার সুযোগ কেউ হাতছাড়া করতে নারাজ। এটা হজ্জ প্যাকেজের মধ্যেই থাকে। আর মদীনায় বদর, ওহুদ, খন্দকের প্রান্তর, মসজিদে কুবাসহ বিভিন্ন মসজিদ ও ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের সুযোগ হয়। এই সুযোগও কেউ হাতছাড়া করতে চায় না। মদীনার প্রতি সেকেন্ডের অবস্থানকালেই হৃদয়ে সাহস

www.pathagar.com

সঞ্চারিত হয়। মনে হয় আমি তো আমার নবীর পাশেই আছি। রাসূলের কবরের পাশেই রয়েছে আবু বকর [রা] এবং উমর [রা]-এর কবর। আর মসজিদে নববীর পাশেই রয়েছে জান্নাতুল বাকি, যেখানে হযরত ওসমান [রা], হযরত ফাতেমা [রা]সহ ১০ হাজার সাহাবীর কবর। হাজীদের মধ্যে বা ওমরাকারীদের মধ্যে যারা মদীনায় ইন্তিকাল করেন তাদেরকে এই কবরস্থানেই দাফন করা হয়।

মদীনায় আবহাওয়া মক্কার মত রুক্ষ্ম নয়। কিছুটা ঠান্ডা। মক্কার আশপাশে পাহাড় আর মরুভূমি। মদীনাতেও পাহাড় আছে, তবে আছে প্রচুর ফলের বাগান। মক্কার রুক্ষ্ম আবহাওয়ায় সুস্থ থাকার উপায় প্রচুর ফল আর জমজমের পানি খাওয়া। মসজিদে নববীতেও জমজমের পানি পাওয়া যায় যা খাওয়া এবং হাজীরা বাসায় এনে খেতে পারেন। সৌদি কর্তৃপক্ষ বড় বড় ড্রামে করে মক্কা থেকে জমজমের পানি নিয়ে যায় মদীনায়। মরুভূমি, পাথর আর পাহাড়ের দেশে এত ফল পাওয়া যায় এবং তা দামেও সস্তা এটা কল্পনা করা যায় না। কিন্তু আল্লাহর কাছে হযরত ইবরাহিম [আ] তার শিশু পুত্র ইসমাইলকে রেখে যাওয়ার সময় যে দোয়া করেছিলেন সেই দোয়া এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ [সা]-এর দোয়ায় দেশটি এখন সম্পদে ভরপুর। পাথর আর বালুর গভীরে আল্লাহ দিয়ে রেখেছেন খনিজ সম্পদ। আর পাহাড়ের ভ্যালিতে, মরুভূমিতে গাছ লাগিয়ে তা পানি দিয়ে বাঁচাতে পারলেই তাতে প্রচুর ফল ধরে।

হাজীদের খাবারের জন্য প্রতিদিন বড় বড় ওয়াগন ভর্তি করে মানুষ খাবার বিতরণ করে মক্কা, মদীনা, আরাফাসহ হাজীদের গমনের স্থানে। তাদের বিশ্বাস, হাজীরা আল্লাহর মেহমান। তাদের খাওয়ালে ব্যবসায় বরকত হবে, অনেক সওয়াব হবে, আল্লাহ হালাল রুজি সম্প্রসারিত করবেন। তাই খাদ্য বিতরণে এত আগ্রহ ও প্রতিযোগিতা।

পবিত্র হজ্জে আমার মধ্যে বিদ্যমান দ্বীনি চেতনা আরো শানিত হয়েছে। কাবা শরীফ ছেড়ে আসতে কষ্ট হয়েছে। সে দিন কেঁদেছি সেইভাবে যেভাবে বাচ্চা শিশু তার মায়ের জন্য কাঁদে। মদীনায় রাসূলের রওজা ছেড়ে আসতে যেন পারছিলামই না। ঠোঁট শুকিয়ে আসছিল। শরীরের রক্ত যেন শীতল হয়ে পড়ছিল। আমি আল্লাহর রাসূলকে [সা] ছেড়ে চলে যাচ্ছি– এমন একটা অপরাধবোধ যেন কাজ করছিল মনের মধ্যে। সবচেয়ে বড় উপলব্ধি হলো ফরজ ইবাদতের প্রতি আরো মনোযোগ। মক্কা-মদীনার কোন মসজিদেই নামাজের পরে ইমাম সাহেব কোন সম্মিলিত দোয়া বা মুনাজাত করেন না। 'নামাজ শেষ হলে তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ো রিজিকের সন্ধানে' পবিত্র কুরআনের এই স্পিরিট সেখানে কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়। সুন্নত এবং নফলকে গুরুত্ব

www.pathagar.com

দিতে গিয়ে ফরজ ত্যাগ করতে অহরহ্ দেখেছি অনেককে। একই দিনে দুইবার মক্কা থেকে আয়েশা মসজিদে গিয়ে এহ্রাম বেঁধে নফল ওমরা করেছেন কেউ কেউ। তার অর্থ দাঁড়ায়, তারা মক্কার অদূরে আয়েশা মসজিদে একই দিন দুইবার গিয়েছেন দুইবার এসেছেন। দুইবার তওয়াফ করেছেন– মানে ১৪ বার বায়তুল্লাহর চারদিকে চক্কর দিয়েছেন। দুইবার সা'য়ী করেছেন– মানে ১৪ বার সাফা মারওয়ায় দৌড়াদৌড়ি করেছেন এবং দুইবার মাথা মুন্ডন করেছেন। এই কাজ করতে গিয়ে তাদের অনেক রাত হয়ে গেছে। তারা এত পরিশ্রান্ত হয়েছেন যে সকালে ফজরের নামাজের জন্য উঠতে পারেননি। তাদের এই নফল ওমরায় কি লাভ হলো? ঠিক এভাবেই আমাদের দেশে সারারাত শবে কদর বা শবে বরাতের নফল নামাজ পড়ে সকালে ফজরের নামাজসহ পরবর্তীতে অন্যান্য ওয়াক্তের ফরজ নামাজ কাজা করতে কসুর করেন না। তাদের ধারনা, বিশেষ বিশেষ কিছুদিন বা রাতে নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলে সব মাফ হয়ে যাবে। একমাস রোজা রাখলে পুরো বছরের গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে– এমন বিশ্বাস তাদের মধ্যে জন্মেছে আমাদের দেশের আলেম ওলামাদের ওয়াজ শুনে। অবুঝ মানুষের এই ধারণা বদলিয়ে সঠিক বুঝ দেয়ার দায়িত্ব ওয়ায়েজিন, ইমাম, খতিবসহ আলেম সমাজকেই নিতে হবে। যারা শুধু মসজিদের মধ্যে দ্বীন আর বাইরের সব কাজই দুনিয়ার কাজ বলে মানুষকে মসজিদে আসার দাওয়াত দেন এবং শুধু সুন্নতের আমলের বয়ান করেন। তাদের দাওয়াতে পরিবর্তন আনতে হবে। ফরজ পালন না করলে আমাকে দোজখে যেতে হবে। এই উপলব্ধি প্রয়োজন। হালাল পথে নিজের এবং অধীনস্ত স্ত্রী, পুত্র, পরিজনের জন্য রিজিক অর্জন- এটা কি ফরজ নয়? হারাম বর্জন এবং শরিয়ত নির্ধারিত পন্থায় দুনিয়ার সমস্ত কাজ করা কি ইবাদত নয়? সুন্নতের আমল করতে করতে ফরজ হারিয়ে ফেলেছেন যারা আল্লাহ তাদের সহিহ্ বুঝ দান করুন। #

www.pathagar.com

প্রিয় নবী কখনও রাগ করতেন না

মাহবুবুল হক

'রাগ' মানুষের একটি আচরণগত খারাপ বৈশিষ্ট। এই বৈশিষ্ট আমাদের সমাজে দারুণভাবে বিরাজমান। রাগ নেই, রাগ করে না বা রাগান্বিত হয় না, এমন মানুষ বর্তমান সমাজে বিরল। এক সার্ভে রিপোর্ট দেখা গেছে,স্বাধীনতার পর যতই দিন গড়াচ্ছে শিশুরা পূর্বের তুলনায় রাগী বা মেজাজী হিসেবে বেড়ে উঠছে। খুব কম কিশোরই রাগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে বা উল্টোভাবে বলা যায়, রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে চাচ্ছে। রাগ ক্রোধের প্রাথমিক ধাপ। এখন ক্রোধের আগুনেই যেনো জ্বলছে তরুণ সমাজ। পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গন সর্বত্রই এখন ক্রোধের উপস্থিতি। ক্রোধের কারণে জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে সমাজ, সংসার, সব কিছু।

বড়রা ছোটদের রাগ করবে, আমাদের সমাজে এ এক স্বাভাবিক চিত্র। পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরে এ দৃশ্য বিরাজমান। অবস্থাদৃষ্টে মাঝে মাঝে এমনই মনে হয়, যে যতো বড় সে যেনো তত রাগী। ব্যক্তির উন্নতি বা পদবীর সাথে সাথে রাগের পারদও যেনো বাড়ে। একজন ব্যক্তি সহকারী সচিব থাকাকালে যে মাত্রায় রাগ করতেন, উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব এবং সচিব থাকাকালে তাঁর রাগের মাত্রা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। বাড়াটাই যেনো স্বাভাবিক। অবশ্য এর ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়। উন্নত দেশে এমনটি দেখা যায় না। রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারাই যেন সভ্যতার সূত্র। সভ্য দেশসমূহে রাগের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। সে সব দেশে যেযতো বড় সে ততো বিনয়ী। আমাদের দেশে ক্রমাগত রাগ বাড়ে, উন্নত দেশে ক্রমাগত বিনয় বাড়ে। এ অবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার। রাগ নয়, ক্রমাগত বিনয় চর্চা করতে হবে। বিনয়কে আমাদের ভূষণ বানাতে হবে। একটি বিনয়ী সমাজ আমাদের গড়ে তুলতে হবে। 'কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার ও ঈর্ষা'– এগুলো হলো ষড়রিপু। এর মধ্যে রাগ বা ক্রোধ হলো নিকৃষ্ট একটি মানসিক প্রবণতা। মূলত

www.pathagar.com

মানুষের মৌলিক ও প্রাকৃতিক স্বভাবগত সীমানা যখন ক্ষতিগ্রস্থ হয় তখন এই রাগের উদ্ভব হয়। শাসন, হুমকি, চাপ, শাস্তি বা ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হলে স্বভাবজাতভাবেই মানুষের মনে ক্রোধের উন্মেষ ঘটে, যার বহি:প্রকাশ ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। এটি মানুষের মন:চেতনায় চাঞ্চল্য উদ্রেককারী এমনই এক অনুভূতি যা খুবই অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে এবং উস্কানীর ফলে তা আরো আবেগতাড়িত হতে থাকে। আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকগণ এই রাগকে তিনটি ধাপে ভাগ করেছেন। প্রথম ধাপটি হলো 'রাগের প্রাথমিক রূপ' অর্থাৎ দ্রুত বা হঠাৎ করে রাগান্বিত হওয়া। দ্বিতীয় ধাপটি হল স্থির ও সুচিন্তিত রাগ এবং তৃতীয়টি হল বিরূপ বা চরম অন্ত:ক্রোধ। যাই হোক না কেন রাগান্বিত হওয়ার কারণ মূলত: কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন প্রাণীযখন অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রাণীর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় বা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন অবস্থার সম্মুখীন হয় তখন রাগ তৈরি হতে থাকে। সেরূপ অবস্থায় তখন নিজ কর্তৃত্ব জাহির করার ক্ষমতা থাকলে তখন রাগের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে, এমন কি তা চরম পর্যায়ে চলে যেতে পারে। আমরা যাকে পাশবিক আচরণ বলি, সেই পাশবিক আচরণের বহি:প্রকাশ ঘটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আর রাগান্বিত ব্যক্তির মধ্যে যদি কর্তৃত্ব-ক্ষমতা না থাকে তাহলে তাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নির্লিপ্ত থাকতে হয়। এটি ধ্রুব সত্য যে, রাগান্বিত হওয়ার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার নিজের বিচক্ষণতা, উদ্দেশ্য, চিন্তাশক্তি ও অন্যের আবেগ- অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তপ্ত মস্তিষ্কে আসলেই কোন সঠিক সিদ্ধান্ত তৈরি হয় না বা ফলপ্রসূ কোন বক্তব্য মুখ দিয়ে বের হয় না। এভাবে ক্রমেই মানুষের মুখভঙ্গি, দৈহিক আচরণ ও স্বাভাবিক চিন্তন ব্যহত হতে থাকে। যদিও ২০১০ সালে জার্মান বিজ্ঞানীদের দ্বারা সম্পন্ন এক গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষ যে বিষয় বা কারণের দ্বারা রাগান্বিত হয়, সেই বিষয় বা কারণের প্রতি তার আগ্রহ বা উৎসাহ অধিক মাত্রায় তৈরী হতে থাকে।রাগের হাজারো ক্ষতিকর দিক থাকলেও দু'একটি যে ভাল দিক রয়েছে- তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মানুষের ক্রোধের ফলে যে মিলিত ক্ষোভের জন্ম নিয়েছিল- তার দ্বারাই সমাজের অনেক অনাচার বন্ধ করা গিয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। আমাদের দেশে যারা আইন প্রণয়ন করেন, যারা দেশের কর্ণধার বা ক্ষমতাশীল দল- তাদের অনেক অনিয়মের বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিনিয়ত তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে চলছে। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গও তাদের ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ জাহির করে চলেছেন। সংযমী হয়ে বিনয়ের সাথে সমস্যা সমাধানের তেমন কোন প্রচেষ্টাই তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

www.pathagar.com

অস্বস্তিকর বাক্যবানে বা শারীরিক নির্যাতন অব্যাহত রেখে তারা প্রতিনিয়তই তাদের রাগের রূপ প্রকাশ করে চলেছেন। সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই বিভিন্ন দার্শনিক, মনস্তাত্ত্বিক, সাধু, আচরণ নিয়ে গবেষণাকারী– সকলই এই রাগের ব্যাপারে আমাদের সুন্দর সুন্দর মর্মস্পর্শী বাণী প্রদান করেছেন। সাইক্রিয়াটিস গ্যালেন ও সেনেকা মানুষের আচরণগত দিক নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন এবং রাগকে তারা পাগলামির সাথে তুলনা করেছেন। অনেক মনঃবিজ্ঞানীআছেন যারা অনিয়ন্ত্রিত রাগের বিপক্ষে গিয়ে বরং তা কিভাবে সংবরণ করা যায় তাই নিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন। একটু আলাদাভাবে গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটল দেখিয়েছিলেন যে, অনাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে ফেঁপে ওঠা রাগের বহি:প্রকাশের ফলেই সমাজের বিক্ষোভ–আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছে ও পরবর্তীতে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটা অবশ্য ব্যষ্টিক বিষয়, ব্যক্তির বিষয় নয়। মুসলিম, হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধসহ বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীগণ তাদের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থে এই রাগের ব্যাপারে অনেক মূল্যবান বাণী পেয়েছেন। খ্রিষ্টান ধর্মানুযায়ী সাতটি বড় পাপের মধ্যে রাগ একটি। সেইন্ট বেসিল রাগকে এক প্রকার অস্থায়ী পাগলামী বলে আখ্যায়িত করেছেন। এদিকে হিন্দু ধর্মের ভগবত গীতায় বলা হয়েছে– 'কাম, ক্রোধ ও লালসা হল মূর্খের আচরণ যা কোন কিছু আয়ত্ত করতে না পারার ফলে তৈরি হয়।" বৌদ্ধধর্মে বলা হয়েছে যে, 'কোন বস্তুকে কুক্ষিগত করতে অপরাগ হওয়া বা উক্ত বস্তুর ক্ষতিসাধনের আকঙ্খাই হল রাগ।" আধ্যাত্মিক ব্যক্তিবর্গ, সুফি-সাধক, অলি-আউলিয়া সকলেই তাদের আবেগ–আকাঙ্খাসহ অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্টের যথাযথ মূল্যায়নের ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। রিপুর তাড়না থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার কৌশলও তারা আয়ত্ত করেছিলেন। রাগ দমনসহ অন্যান্য লালসা বা মোহ তাদের কখনও যাতে স্পর্শ করতে না পারে সেই আরাধনাতেই তারা সর্বদা নিমগ্ন থাকতেন।

আমাদের প্রিয় নবী তাঁর জীবদ্দশায় কুরআনের আলোকে এই সমস্ত বিষয় আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। মহাপবিত্র গ্রন্থ আল কোরআনের বিভিন্ন সূরায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাগের ক্ষতিকর দিকসমূহ ও তা প্রকাশের বিভিন্ন রূপের অবতরণা রয়েছে। সূরা আলে ইমরানের ১৩৪নং আয়াতের সুস্পষ্টভাবে বলা আছে, 'যারা সুখে ও দুখে দান করে ও ক্রোধ সংবরণ করে এবং লোককে ক্ষমা করে, আল্লাহ্ সেই সকল সৎকর্মশালী লোককে ভালোবাসেন।'

'নিজেদের মধ্যে সদাশয়তায় বিস্মৃত হয়ো না' (বাকারা : ২৩৭), 'নির্বোধদের সাথে মিষ্ট কথা বলো।' (নিসা : ৫)। রাসূল সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আপনি অবশ্যই মহৎ চরিত্রের উচ্চতম স্তরে অধিষ্ঠিত।' (সুরা কালাম : ৪)।

www.pathagar.com

আলী (রা.) আবু জেহেলের কন্যাকে বিয়ে করার পয়গাম পাঠিয়েছে শুনে ফাতেমা (রা.) রাসূলুল্লাহর নিকট গিয়ে বল্লেন: 'আপনার আত্মীয়-স্বজন বলে থাকে যে, আপনি আপনার মেয়েদের পক্ষ হয়ে একটু রাগও দেখান না। ওই দেখুন, আলী (রা.) আবু জেহেলের কন্যাকে বিয়ে করতে চাচ্ছে।' (হাদিস নং ২৪৭২)।

রাসূল (সা.) কত অমায়িক ছিলেন এবং পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কত মধুর স্বভাবের পরিচয় দিতেন আনাস (রা.) এর চমৎকার ছবি এঁকেছেন: 'আমি দশ বছর যাবত রাসূল (সা.) সেবায় নিয়োজিত থেকেছি। তিনি কখনো বিন্দুমাত্র বিরক্তি বা ক্রোধ প্রকাশ করেননি। কোন কাজ যেভাবেই করে থাকি কখনো বলেননি এভাবে করলে কেন? আর না করলেও কখনও বলেননি এটা কেন করলে না! তিনি ভৃত্য ও গৃহকর্মীদের সাথেও এরকমই ব্যবহার করতেন। তিনি কাউকে কখনও প্রহার করেননি।' আয়েশা (রা.) বলেন, 'তিনি কখনো স্ত্রী বা গৃহকর্মীদের মারেননি। কারও কাছ থেকে ব্যক্তিগত প্রতিশোধও গ্রহণ করেননি।' আয়েশা (রা.) আরও বলেন, 'রাসূল সবচে বিনম্র স্বভাবের ছিলেন এবং হাসিমুখে প্রফুল্ল আচরণ করতেন। কখনো কোন ভৃত্যকে ধমক পর্যন্ত দেননি।' (আল মাওয়াহিবুলাদুন্নিয়া, প্রথম খন্ড, পৃ: ২৯৩) আপন পরিবার পরিজনের সাথে সহৃদয় আচরণে রাসুলুল্লাহর (সা.) কোন জুড়ি ছিল না (সহিহ্ মুসলিম)। রাসূল (সা.) যখন বাড়ীতে আসতেন, তখন ভোরের স্নিগ্ধ বাতাসের মত আসতেন এবং এক অপূর্ব প্রশান্তি ও আনন্দের হিল্লোল বয়ে যেত। কথাবার্তা হতো। কখনো কখনো গল্প বলাবলিও হতো। মজার মজার কৌতুক এবং রসিকতাও চলতো। রাতের বেলা যখন রাসূল (সা.) ঘুমাতে যেতেন, তখন পরিবার পরিজনের সাথে তাঁর সাধারণ কথাবার্তা হতো। কখনো ঘরোয়া বিষয়ে, আবার কখনো সাধারণ মুসলমানদের সমস্যাবলী নিয়ে। এমনকি কখনো কখনো গল্পও শোনাতেন। একবার তিনি হযরত আয়েশাকে উম্মে যারার গল্প বলেন। এই কাহিনীতে এগারো জন মহিলা পরস্পরের কাছে নিজ নিজ স্বামীর স্বভাব চরিত্র বর্ণনা করে। এদের মধ্যে এক মহিলা ছিল 'উম্মে যারা'। সে তার স্বামী আবু যারা'র মনোমুগ্ধকর চরিত্র বর্ণনা করেন। সাহিত্যিক দৃষ্টিতে এটা বড়ই মজার কাহিনী। উপসংহারে রাসূল (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)কে বলেন, 'উম্মে যারার জন্য আবু যারা যেমন ছিল, আমিও তোমার জন্য তেমনি'। হযরত ফাতেমা (রা.) এলে প্রিয় নবী দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করতেন। কখনো কখনো নিজে যেতেন। নিজের অবস্থা বলতেন এবং তাঁর অবস্থা শুনতেন। তাঁর দু' ছেলে ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেন (রা.)কে তিনি অত্যধিক স্নেহ করতেন। তাদের

www.pathagar.com

কোলে নিতেন, ঘাড়ে ওঠাতেন এবং নিজে ঘোড়া সেজে পিঠে চড়াতেন। নামাযের সময়ও তাদের ঘাড়ে উঠতে দিতেন। একবার হযরত আকরা বিন হাবিস নবী কর্তৃক হযরত হাসানকে চুমু খেতে দেখে অবাক হয়ে বললেন, আমার তো দশটা ছেলে রয়েছে। কিন্তু কাউকে এভাবে আদর করিনি। অথচ আপনি চুমু খান। রাসূল (সা.) বলেন, যে দয়া স্নেহ করে না, সে দয়া স্নেহ পায় না। ছেলে ইবরাহিম যখন মারা গেলো, তখন নবীজীর চোখ ছলছল করে উঠলো। আরো এক মেয়ে তাঁর সামনেই মারা গেল। গৃহকর্মী উম্মে আইমান চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো। রাসূল (সা.) তাকে নিষেধ করলেন। সে বললো, 'আপনিও তো কাঁদছেন।' রাসূল (সা.) বললেন, 'এভাবে (নিঃশব্দে বা মৃদু শব্দে) কাঁদা নিষিদ্ধ নয়। মনের যে কোমলতা ও মমত্বের কারণে এই (মৃদু) কান্না আসে, সেটা আল্লাহর রহমত স্বরূপ'। তাঁর মেয়ে উম্মে কুলসুমের কবরে যখন দাঁড়ান, তখন তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল। হযরত উসমান বিন মাযউনের লাশের সামনেও তাঁর চোখ অশ্রুসজল ছিল।

রাসূল (সা.)) সদা হাসিমুখ ছিলেন। তিনি বলেছেন: 'তোমার ভাই-এর দিকে মুচকি হাসি দিয়ে তাকানোটাও একটা সৎ কাজ'। রাসূল (সা.) এর সম্পর্কে সর্বক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, 'তিনি অত্যন্ত হাসিমুখ ও সদাপ্রফুল্ল ছিলেন।' একবার হযরত আবু হুরায়রা (রা.) অবাক হয়ে বললেন, 'আপনি দেখি আমাদের সাথে রসিকতাও করেন!' রাসূল (সা.) বলেন, 'হাঁ, তা করি। তবে অমি কোন অন্যায় ও অসত্য কথা বলি না'। এখানে আমরা রাসূল (সা.) এর রসিকতার কিছু নমুনা তুলে ধরছি, যা হাদিসের গ্রন্থাবলীতে সংরক্ষিত রয়েছে।

জনৈক ভিক্ষুক তাঁর কাছে একটা বাহক উঠ চাইল। রাসূল (সা.) বললেন, 'আমি তোমাকে একটা উটনীর বাচ্চা দেবো।' ভিক্ষুক অবাক হয়ে বললো, 'আমি ওটা দিয়ে কি করবো?' রাসূল (সা.) বললেন, 'প্রত্যেক উটই কোন না কোন উটনীর বাচ্চা হয়ে থাকে'। এক বুড়ি এসে বললো, 'আমার জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ আমাকে জান্নাত দান করেন।' রাসূল (সা.) রসিকতা করে বললেন, 'কোন বুড়ি জান্নাতে যেতে পারবে না।' বুড়ি কাঁদতে কাঁদতে চলে যেতে উদ্যত হলো। রাসূল (সা.) উপস্থিত লোকদের বললেন, 'ওকে বলো যে, আল্লাহ ওকে বুড়ি অবস্থায় নয় বরং যুবতী বানিয়ে জান্নাতে নেবেন। আল্লাহ্ বলেছেন, আমি জান্নাতের নারীদেরকে নতুন করে সৃষ্টি করবো, তাদেরকে কুমারী সমবয়সী যুবতী বানাবো।' মোট কথা, জান্নাতে গমনকারীনীদের আল্লাহ নবযৌবন দান করবেন।যাহের বা যোহোর নামের এক বেদুইনের সাথে রাসূল (সা.) এর সখ্য ছিল। তিনি তাঁর এই বেদুইন বন্ধুকে শহর সংক্রান্ত কাজে সাহায্য করতেন এবং

www.pathagar.com

বেদুইন রাসূল (সা.) কে গ্রাম সংক্রান্ত কাজে সাহায্য করত। কখনো কখনো সে আন্তরিক আবেগ সহকারে উপহার দিত। রাসূল (সা.) অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে ঐ উপহারের দাম দিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন, যাহের গ্রামে আমাদের প্রতিনিধি এবং আমরা শহরে তার প্রতিনিধি। এই যাহের একদিন বাজারে নিজের কিছু পণ্য বিক্রি করছিল। রাসূল (সা.) পেছন থেকে চুপিসারে যেয়ে তার চোখ ধরলেন এবং বললেন, বলতো আমি কে? বেদুইন প্রথমে তো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। পরক্ষণেই বুঝতে পেরে আনন্দের আতিশয্যে রাসূল (সা.) এর বুকের সাথে মাথা ঘষতে লাগলো। অতপর রাসূল (সা.) রসিকতা করে বললেন, এই দাসটা কে কিনবে? যাহের বললো, হে রসূলুল্লাহ, আমার মত অকর্মন্য দাসকে যে কিনবে, সেই ঠকবে। রসূল (সা.) বললেন, আল্লাহর চোখে তুমি অকর্মন্য নও।

একবার এক মজলিসে খেজুর খাওয়া হলো। রসূল (সা.) রসিকতা করে খেজুরের আঁটি বের করে হযরত আলীর (রা.) সামনে রাখতে লাগলেন। অবশেষে আঁটির স্তুপ দেখিয়ে বললেন, তুমিতো অনেক খেজুর খেয়েছ দেখছি। হযরত আলী (রা.) বললেন, আমি আঁটিসুদ্ধ খেজুর খাইনি। মহান অল্লাহ বলেন, মুত্তাকিনদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, তারা রাগ দমন করতে পারে। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রাগ দমন করতে পারে সেই ব্যক্তি অন্যান্য চারিত্রিক নিয়মগুলিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে পারে।' অহংকার, ইর্ষা, লালসা, মোহ ইত্যাদি চারিত্রিক মনোভাবগুলো হল ক্রোধের রাজ্যে প্রবেশের প্রথম সিঁড়ি। হাদিসে বর্ণিত আছে, 'কুস্তিতে পরাস্তকারী প্রকৃত শক্তিমান নয়, বরং প্রকৃত বীর সেই ব্যক্তি যে ক্রোধ বা রাগের সময় নিজকে বশীভূত রাখতে পারে।' আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবীজীকে বললেন, 'আমাকে উপদেশ দিন। নবীজী উত্তর দিলেন, 'কখনও রাগান্বিত ও অসংযত হবে না।' লোকটি বার বার একই কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল এবং নবীজীও প্রতিবার একই উত্তর দিলেন, 'কখনও রাগান্বিতও অসংযত হবে না।' এ ছাড়া নবী করিম (সা.) আমাদের দোয়া করতে শিখিয়েছেন, 'হে আল্লাহ, আমি তোমার সাহায্য কামনা করছি যেন রাগ এবং আনন্দের মুহূর্তে আমাদের মুখ দিয়ে ভাল বাক্য বের হয়।' একজন মানুষের উচিৎ তার নিজস্ব চারিত্রিক গুণাবলী দিয়ে সকলকে মুগ্ধ করা। দয়া, ধৈর্যশীলতা, মোহমুক্ত থাকা, ক্ষমাশীলতা ইত্যাদি গুণ প্রতিনিয়ত চর্চা করা হলে আপনা থেকেই রাগ নামক বাজে গুণটি মানুষের মন থেকে দূরীভূত হবে। ইসলামী চিন্তাবিদগণ বলেন, 'কখনও কোন ব্যক্তির মনে ক্রোধের সঞ্চার হতে থাকলে তখন তিনি যেন তা

www.pathagar.com

প্রাথমিক পর্যায়েই নিয়ন্ত্রণ করেন। তৎক্ষণাৎ ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে, যাতে উক্ত রাগের মাত্রা আর বৃদ্ধি না পায়।' মূলত: একজন মোমিন ব্যক্তির উচিৎ হবে কোন কাজ বা কথা বলার পূর্বে সে যেন অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে। নবী করিম (সা.) বলেন, 'আমি একটি শব্দ জানি যে তাকে প্রশমিত করবে যদি সে তা উচ্চারণ করে। যদি সে তা বলে 'আমি আল্লাহ্‌র নিকট বিতাড়িত শয়তানের আছর হতে দূরে থাকতে চাই'– তাহলেই তার সমস্ত রাগ চলে যাবে।' (আল বুখারী, ভলিউম-৪,নং- ৫০২)।

আসলে শয়তান মানুষের মধ্যে কুমন্ত্রণা দেয় যাতে তার সৎ গুণাবলী কলুষিত হয়ে পড়ে। এজন্য মহান রাব্বুল আলা-আমিনের নিকট প্রার্থনা করা প্রয়োজন যাতে শয়তানের কারসাজির কবলে নিজকে না পড়তে হয়। এ বিষয়ে একটি হাদিস আছে, 'ক্রোধ শয়তান থেকে আসে। শয়তান আগুনের তৈরী এবং তা পানিতে নিভে, তাই তোমাদের কেউ যখন রেগে যাবে তখন যেন সে অজু করে।' (আবু দাউদ, ভলিউম- ৪১,নং৪৭৬৬)।

আবু যার বর্ণনা করেছেন, নবী করিম (সা.) আমাদের বলেন, 'যখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ দন্ডায়মান অবস্থায় রাগান্বিত হয়, তখনই তার বসে পড়া উচিৎ। যদি এতে তার রাগ কমে, তা হলে তা ভাল। নইলে সে যেন শুয়ে পড়ে।' (আবু দাউদ, বলিউম–৪১, নং–৪৭৬৪)।

এছাড়া নবীজী আমাদেরকে রাগের সময় নীরব থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। আবু বকর (রা.)তার বিচারপতি সন্তানকে এই বলে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, রাগান্বিত অবস্থায় যেন বিচারিক কাজ না করে। রাগ থাকা অবস্থায় বিচার কাজ যথাযথভাবে হয় না। রাসূলুল্লাহ শুধু শরীয়াহ বিরোধী কার্যকলাপ দেখলেই রাগ করতেন, এছাড়া সচরাচর তিনি রাগ করতেন না এবং সুন্দর ভাষায় সকলকে পরামর্শ দিতেন। তাই আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বিধি-নিষেধ অমান্য হতে দেখলে আমরা যদি রেগেও যাই, তা হলে আমাদের কিছু বিষয়ের প্রতি সজাগ থাকতে হবে।

(ক) আমরা আসলেই স্বীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য রেগে যাচ্ছি কিনা। (খ) যথাযথভাবে অর্থাৎ শরীয়ার সীমা লঙ্ঘন না করে তার বহি:প্রকাশ ঘটাচ্ছি কিনা। (গ)শরীয়ার চাহিদা মোতাবেক লাভবান হওয়া যাচ্ছে কিনা। যদি লাভের পাল্লা ভারী না হয় এবং ক্ষতির আশংকা থাকে তাহলে তা বর্জন করা উচিৎ। আমরা যখন ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক কোন পরামর্শ প্রদান করব– তখন যেন তা অবশ্যই বিনয় ও নম্রতার সাথে করা হয়। আমাদের বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে কুরআন ও হাদিস অনুযায়ী রাগ নিয়ন্ত্রণ করলে– সেটিই হবে সর্বোত্তম পন্থা। কেউ কোন বিষয়ে তার নিজস্ব মতামত প্রকাশ করলে– সেই

www.pathagar.com

মতামতকে শ্রদ্ধা করা উচিৎ। সম্পূর্ণ ঘটনা বা বিষয়টি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে তবেই প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিৎ। অবশ্য অন্যে আঘাত পায় এমন মানসিক বা শারীরিক প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে বিনয়ের সাথে তাকে বোঝাতে হবে। রাগের পরিস্থিতি তৈরী হলে প্রার্থমিক পর্যায়ে সেই রাগ প্রশমন করা প্রয়োজন অথবা রাগান্বিত না হয়ে পরিস্থিতি কিভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা যায় সে চেষ্টাই করা উচিৎ।

www.pathagar.com

সর্বগুণে গুণান্বিত
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

এইচ. এম. মুশফিকুর রহমান

প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বগুণে গুণান্বিত। আল্লাহর বন্দেগীর পূর্ণ হক আদায়ে তিনিই ছিলেন খাঁটি এবং পরিপূর্ণ বান্দা। আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল [সা]। শুধু রাসূল নন বরং নবী ও রাসূলগণের দলপতি বা সাইয়্যেদুল মুরসালীন। তিনি আগমন করেছিলেন রহমাতুললিল আলামীন রূপে তথা শান্তিদূত ও মুক্তিদূত রূপে। আল্লাহ তা'আলা মহান রিসালাতের দায়িত্ব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অর্পন করেছিলেন আর তা তিনি পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন। মহান রাব্বুল আলামীন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টিগত, চরিত্রগত, আকৃতি ও প্রকৃতিগতভাবে পূর্ণতা দান করে সৃষ্টি করেছেন যা পৃথিবীর অন্য কোন মানবের জীবনে ঘটেনি। সুতরাং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টিগত ও চরিত্রগত উভয় দিক দিয়েই ছিলেন পরিপূর্ণ মানুষ।

প্রথমেই আমরা জেনে নিবো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৃষ্টিগত দিক নিয়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট, সৌরভে সুবাসিত, গঠনে মধ্যম, দেহে সবল. মস্তক ছিল বড়, দাঁড়ি ছিল ঘন, হস্ত ও পদদ্বয় ছিল মাংসল, উভয় কাঁধ ছিল বড়, চেহারায় ছিল রক্তিম ছাপ, নেত্রদ্বয় ছিল কালো, চুল ছিল সরল, গন্ডদ্বয় কোমল। চলার সময় ঝুঁকে চলতেন, মনে হত যেন উঁচু স্থান হতে নিচুতে অবতরণ করছেন। যদি কোন দিকে ফিরতেন, পূর্ণ ফিরতেন। মুখমণ্ডলের ঘাম সুঘ্রাণের কারণে মনে হত সিক্ত তাজা মুক্তো। তার উভয় কাঁধের মাঝখানে নবুওয়াতের মোহর অঙ্কিত ছিল।

'আলী ইবন আবি তালিব রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লম্বাও ছিলেন না, আবার বেঁটেও

www.pathagar.com

ছিলেন না। [তিনি মধ্যম আকৃতির ছিলেন]; আর তিনি ছিলেন [তুলনামূলক] বড় মাথা ও দাঁড়ির অধিকারী। তাঁর দুই হাতের তালু ও দুই পায়ের তলা ছিল মাংসবহুল। তাঁর চেহারা ছিল লোহিতাভ শুভ্র প্রকৃতির। বক্ষদেশ থেকে নাভি পর্যন্ত একটি সরু কেশ রেখা ছিল,... ।' [ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ : ১/৯৬, আল-মুসতাদরাক : ২/৬০৬]।

বারা ইবন আযেব রাদিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মধ্যম আকৃতির পুরুষ। তাঁর উভয় কাঁধের দূরত্ব ছিল অল্প বেশি। চুল ছিল কানের লতিকা পর্যন্ত লম্বা। আমি তাঁকে লাল পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। তাঁর চেয়ে সুন্দর কিছু আমি কখনো দেখিনি।' [বুখারী , আস-সহীহ : মানাকিব/২৩, ৪/১৬৫; মুসলিম, আস-সহীহ : ফাদায়েল /২৫, হাদীস নং -২৩৩৭, ৪/১৮১৮]।

কাতাদা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'আমি আনাস ইবন মালেক রাদিআল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেশ মোবারক কেমন ছিল? জবাবে তিনি বললেন, মধ্যম আকৃতির ছিল; খুব কোঁকড়ানো ছিল না, আবার একেবারে সোজাও ছিল না; তা ছিল কাঁধ ও দুই কানের মাঝ বরাবর।' [মুসলিম, আস-সহীহ: ফাযায়েল/২৬, হাদীস নং ২৩৩৮]।

আনাস ইবন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের [মোবারক শরীরের] চেয়ে সুগন্ধিময় কোন আম্বর, মিশক বা অন্য কোন বস্তুর ঘ্রাণ গ্রহণ করিনি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের [মোবারক শরীরের] চেয়ে কোমল কোন রেশম বা মোলায়েম কাপড় আমি স্পর্শ করিনি।' [মুসলিম, আস-সহীহ : ফাযায়েল/২১, হাদীস নং ২৩৩০]।

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, 'আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুখভরে হাসতে দেখিনি যে তাঁর আলা জিহ্বা দেখা যাবে; তিনি তো শুধু মুচকি হাসতেন।' [বুখারী, আস-সহীহ /৬৮, ৭/৯৪-৯৫]।

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের কথা বলার মত করে অনবরত কথা বলতেন না।' [বুখারী, আস-সহীহ : মানাকিব /২৩, ৪/১৬৪]।

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সুন্দর কিছু দেখিনি। সূর্য যেন তাঁর চেহারায় ছিল প্রমাণিত। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা দ্রুত হাঁটতে আমি কাউকে দেখিনি, মনে হত যেন তাঁর জন্য যমীনকে সংকুচিত করে দেয়া হয়েছে। আমরা তো খুবই চেষ্টা করতাম [তার সাথে তাল মিলিয়ে

www.pathagar.com

চলতো]; কিন্তু তিনি ছিলেন একেবারেই নিঃস্পৃহ।' [তিরমিযী, আস-সুনান : মানাকিব /১২, হাদীস নং -৩৬৪৮]।

এতক্ষণ আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৃষ্টিগত গুণাবলি সম্পর্কে কিছু জানলাম। এখন তাঁর চারিত্রিক ও মানবীয় গুণাবলি সম্পর্কে কিছু বর্ণনা দেয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ্।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সামগ্রিকভাবে উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ নৈতিকতাসম্পন্ন মানুষ। প্রমাণ হিসেবে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁকে দেয়া সার্টিফিকেটই যথেষ্ট। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, 'আর নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের উপর রয়েছেন।' [সূরা আল-কলম : ৪]।

কুরআনুল কারীমে আরো বলা হয়েছে, 'যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মাঝে উত্তম নমুনা রয়েছে।' [সূরা আহযাব : ২১]।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাপেক্ষা তাকওয়া অবলম্বনকারী ছিলেন। গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ্ সম্পর্কে আমি তোমাদের চেয়ে বেশি অবগত এবং আল্লাহকে আমি তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি।' [বুখারী : ২০]।

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করে মুমিনদের উপর বিরাট অনুগ্রহ করেছেন। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, 'অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইত :পূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল।' [সূরা আলে ইমরান : ১৬৪]।

অন্যান্য নবীগণ তাদের কওম বা জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্ববাসীর জন্য প্রেরিত রাসূল [সা]। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, 'বল, 'হে মানুষ, আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল, যার রয়েছে আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব। তিনি ছাড়া কোন [সত্য] ইলাহ নেই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন ও তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর প্রতি, যে আল্লাহ্ ও তাঁর বাণীসমূহের প্রতি ঈমান রাখে। আর তোমরা তার অনুসরণ কর, আশা করা যায়, তোমরা হিদায়াত লাভ করবে।' [সূরা আল-আরাফ : ১৫৮]।

তিনি এমন একজন রাসূল যিনি ঈমানদার বান্দাদের প্রতি স্নেহশীল ও কল্যাণকামী ছিলেন। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয় তোমাদের

www.pathagar.com

নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, তা তার জন্য কষ্টদায়ক যা তোমাদেরকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু।' [সূরা আত-তাওবাহ : ১২৮]।

প্রতিশোধ নেয়ার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সীমালঙ্ঘনকারীকে মার্জনা করার মহৎগুণ রাসূলের মাঝে ছিল। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, 'তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎ কর্মের আদেশ দাও, অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চলো।' [সূরা আ'রাফ : ১১৯]।

তিনি ছিলেন কোমল, নম্র, ভদ্র ও দয়াবান ব্যক্তি। তিনি অশ্লীলভাষী ছিলেন না। আর অশ্লীল কথা বানিয়েও বলতে পারতেন না। আবদুল্লাহ ইবন আমর রাদিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে উত্তম সে ব্যক্তি, যার চরিত্র ভাল।' [বুখারী : ১৬৬]।

আল্লাহ তা'আলা মহানবী মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক হিসাবে মনোনিত করেছেন। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, 'অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।' [সূরা আন-নিসা : ৬৫]।

তিনি যে সিদ্ধান্ত দেন সে বিষয়ে কোন এদিক-সেদিক করার কোন সুযোগ নেই। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, 'আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজেদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না; আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্প'ই পথভ্রষ্ট হবে।' [সূরা আল-আহযাব : ৩৬]।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় রবের অনুগত ছিলেন। তিনি মেনে চলতেন তার রবের আদেশ-নিষেধ। তিনি আমলে সালেহ বেশি বেশি করতেন। আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা নবী করীম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থার বিবরণ দিয়ে বলেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল ছিল ধারাবাহিক। তিনি যা পারতেন তোমাদের কেউ কি তা পারবে? তিনি সিয়াম পালন করতেন, এমনকি আমরা বলতাম তিনি এর ধারাবাহিকতা আর পরিত্যাগ করবেন না। তিনি সিয়াম পালন বাদ দিতেন এমনকি আমরা বলতাম তিনি আর সিয়াম পালন করবেন না। তুমি তাঁকে রাত্রে সালাতরত অবস্থায় দেখতে না চাইলেও সালাতরত অবস্থায় তাঁকে দেখতে পাবে। তুমি তাকে রাত্রে ঘুমন্তাবস্থায় দেখতে না চাইলেও ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁকে দেখতে পাবে।' [তিরমিযী : ৭০০]।

www.pathagar.com

বাদশাহর সামনে তার সম্মানে তাদের সেবক ও গুণগ্রাহিরা যে রকম বিনয়াবনত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্মানে সাহাবাদের এরূপ করতে নিষেধ করতেন। সাহাবায়ে কেরামদের সামনে তিনি সাধারণ মানুষের মতই বসতেন। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, 'আর মুমিনদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে, তাদের প্রতি তুমি তোমার বাহুকে অবনত কর।' [সূরা আশ্-শু'আরা : ২১৫]।

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করে মুমিনদের উপর বিরাট অনুগ্রহ করেছেন। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, 'বল, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' [সূরা আলে ইমরান : ৩১]।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বাধিক উদার দানশীল মানুষ। তিনি এত বেশি পরিমাণ দান করতেন, সে পর্যায়ে দুনিয়ার কোন রাজা-বাদশাও পৌঁছতে পারে নাই। 'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলো, তিনি তাকে এত বেশি ছাগল দিলেন যাতে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ হয়ে যাবে। তারপর সে ব্যক্তি তার সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে তাদের বলল, হে আমার জাতি ভাইয়েরা! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর; কেননা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বেশি দান করেন যে, তিনি অভাবের ভয় করেন না।' [মুসলিম, হাদীস নং ২৩১২]।

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর একজন বান্দা। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, 'আর নিশ্চয় আল্লাহর বান্দা যখন তাঁকে ডাকার জন্য দাঁড়াল, তখন তারা তার নিকট ভিড় জমাল।' [সূরা আল-জিন]।

সাহসিকতা, নির্ভীকতা, যথাসময়ে উদ্যোগ গ্রহণের মতো বিশেষ গুণে গুণবান ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর সাহসিকতা বড় বড় বীরদের নিকট অবিসংবাদিতভাবে স্বীকৃত। হাদীসে এসেছে, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বাপেক্ষা সুন্দর, সর্বাপেক্ষা দানশীল ও সর্বাপেক্ষা সাহসী। ' [বুখারী : ২৬০৮]।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দলীল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, 'হে মানুষ, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের নিকট স্পষ্ট আলো নাযিল করেছি।' [সূরা আন-নিসা : ১৭৪]।

www.pathagar.com

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের একজন সম্মানিত রাসূল। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই এটি এক সম্মানিত রাসূলের বাণী।' [সূরা আল-হাক্কাহ : ৪০]।
তার মাধ্যমে নবুওয়াতের সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, 'মুহাম্মাদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নয়; তবে আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ।' [সূরা আল-আহযাব : ৪০]।
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন দায়ী ইলাল্লাহ। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, 'হে নবী, আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। আর আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও আলোকদীপ্ত প্রদীপ হিসেবে।' [সূরা আল-আহযাব : ৪৫-৪৬]।
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমাত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, 'আর আমি তো তোমাকে সৃষ্টিকুলের জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।' [সূরা আম্বিয়া : ১০৭]।
আল্লাহ তা'আলা তার নবীর প্রতি দরূদ পাঠের নির্দেশ প্রদান করেছেন। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয় আল্লাহ [ঊর্ধ্বলোক জগতে ফেরেশতাদের মধ্যে] নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দু'আ করে। হে মুমিনগণ, তোমরাও নবীর উপর দরূদ পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।' [সূরা আল-আহযাব : ৫৬]।
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন নামাযীদের ইমাম। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, 'আর যখন তুমি তাদের মধ্যে থাকবে, অতঃপর তাদের জন্য সালাত কায়েম করবে, তখন যেন তাদের মধ্য থেকে একদল তোমার সাথে দাঁড়ায় এবং তারা তাদের অস্ত্র ধারণ করে। এরপর যখন সিজদা করে ফেলবে, তখন তারা যেন তোমাদের পেছনে অবস্থান নেয়। আর অপর একটি দল যারা সালাত আদায় করেনি তারা যেন তোমার সাথে এসে সালাত আদায় করে এবং তারা যেন তাদের সতর্কতা অবলম্বন ও অস্ত্র ধারণ করে।' [সূরা আন নিসা : ১০২]।
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের জন্যে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, 'হে নবী, আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে।' [সূরা আহযাব : ৪৫]।

www.pathagar.com

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যপথ অবলম্বনকারীদের কাছে কোন প্রতিদান বা বিনিময় প্রত্যাশা করেননি। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, 'বল, 'আমি এর উপর তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না। তবে যার ইচ্ছা তার রবের দিকে পথ অবলম্বন করুক।' [সূরা ফুরকান : ৫৭]।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোন মনগড়া মিথ্যা বানোয়াট কথা বলতেন না। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, 'তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট হয়নি এবং বিপথগামীও হয়নি। আর সে মনগড়া কথা বলে না।' [সূরা আন্-নাজ্ম : ২-৩]।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসারী। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, 'অত :পর [হে নবী] আমি আপনার ওপর ওহী পাঠালাম যে, আপনি একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের মিল্লাত অনুসরণ করুন; আর সে কখনো মুশরিকদের দলভুক্ত ছিল না।' [সূরা নাহল : ১২৩]।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যসব উম্মতের সাক্ষী হিসেবে আবির্ভূত হন। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, 'আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানুষের উপর সাক্ষী হও এবং রাসূল সাক্ষী হন তোমাদের উপর।' [সূরা বাকারা : ১৪৩]।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের মাধ্যমে একাধিকবার বক্ষ বিদীর্ণ করান। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, 'আমি কি তোমার জন্য তোমার বক্ষ প্রশস্ত করিনি?' [সূরা ইনশিরাহ : ১-৮]।

একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর দীদার লাভের উদ্দেশে উধর্ক্ষ গমনে আরোহনের অনুমতি দান করেন। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, 'পবিত্র মহান সে সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে নিয়ে গিয়েছেন আল মাসজিদুল হারাম থেকে আল মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার আশপাশে আমি বরকত দিয়েছি, যেন আমি তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।' [সূরা বনী ইসরাঈল : ১]।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা তাঁর উম্মতের জন্যে বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, 'বল, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। বল, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালবাসেন না।' [সূরা : আলে ইমরান : ৩১-৩২]।

www.pathagar.com

গোটা বিশ্বের কল্যাণকামী মানুষের জন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সত্য পথের দিশারী। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, 'আমার কাছে তো এ ওহীই আসে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।' [সূরা সোয়াদ : ৭০]।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবতার প্রতি কখনো বল প্রয়োগ করেননি। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, 'আর তোমার কওম তা অস্বীকার করেছে, অথচ তা সত্য। বল, আমি তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নই।' [সূরা আনয়াম : ৬৬]।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নবীদের মধ্যে অন্যতম একজন এবং সিরাতুম মুস্তাকীমের উপর প্রতিষ্ঠিত। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয় তুমি রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত। সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত।' [সূরা ইয়াসীন : ২-৩]।

আরো অনেক গুণের সমাহার রাসূলের জীবনে রয়েছে। তার মধ্য থেকে সংক্ষেপে কয়েকটির উল্লেখ করছি।

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম আরশে আজীমে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

২. পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের সুসংবাদ উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. নামাযের আযান ও ইকামাতে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়।

৪. তাঁর জন্য সদকা গ্রহণ করা হারাম করা হয়েছে।

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর সকলের জন্য তাঁর স্ত্রীগণকে বিবাহ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীদের সংখ্যা সকল নবী-রাসূলের অনুসারীদের সংখ্যার চেয়ে অধিক বলা হয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের উজ্জ্বল গুণের কিছু মণি-মুক্তা আমি আমার লেখায় প্রকাশ করলাম। আরো অসংখ্য গুণাবলী তাঁর জীবনে ঝলমল করছে, যা আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে ও সংক্ষিপ্ত লেখায় প্রকাশ করা সম্ভব হলো না। সবশেষে বলতে চাই, আসুন সবাই তাঁকে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় মশাল বা পাঞ্জেরী হিসেবে গ্রহণ করি। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দিন। আমীন! #

www.pathagar.com

রাসূল [সা]-এর উত্তম আচরণ

মো: তোফাজ্জল হোসাইন

প্রাথমিক কথা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] ছিলেন সর্বদিক দিয়ে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোত্তম মহামানব, সর্বোপরি তিনি একজন রাসূল [সা]। এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে তাঁদের জন্য রাসূল [সা]-এর মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।' [সূরা আহজাব: ২১]

আদি পিতা হযরত আদম [আ] থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] পর্যন্ত যত নবী রাসূল প্রেরিত হয়েছেন, তারা সবাই ছিলেন উত্তম চরিত্রের মূর্ত প্রতীক। তাঁদের মধ্যে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] ছিলেন সবার শীর্ষে। তিনি ছিলেন, উত্তম চরিত্রের বাস্তব রূপ। যে চরিত্রের সার্টিফিকেট দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। তিনি আল কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'হে রাসূল! নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।' [সূরা কলম: ৪]

মক্কায় রাসূল [সা]-এর আচরণ

নবুওয়ত লাভের পূর্বে রাসূল [সা] দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত মক্কার অধিবাসীদের সাথে চলাফেরা করেছেন। তার এই দীর্ঘ জীবনে কারো সাথে কোনো খারাপ আচরণ করেছেন বলে কোনো একজন ব্যক্তিও বলতে পারবে না।

এ ব্যাপারে উম্মুল মুমিনিন হযরত খাদিজাতুল কোবরা [রা] বলেন, যিনি নবুওয়তের পূর্বে ও পরে দীর্ঘ পঁচিশটি বছর পর্যন্ত পতিসেবায় নিয়োজিত ছিলেন; তিনি ওহিপ্রাপ্তির প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূল [সা]কে এ বলে সান্ত্বনা দান করতেন যে, 'কখনও নয়, খোদার কসম! আল্লাহ আপনাকে কখনও দুশ্চিন্তায় ফেলবেন না, আপনি আপনজনের প্রতি সদ্ব্যবহার করে থাকেন, ঋণগ্রস্তদের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন, দরিদ্রজনের সাহায্য করে থাকেন, অতিথি সেবা করে থাকেন,

www.pathagar.com

সত্যের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে থাকেন, বিপদে মানুষকে সাহায্য করেন।' [বুখারি]

নবুওয়ত লাভের পর সকল মানুষের সাথে রাসূল [সা]-এর আচরণ এমন ছিল। সবাই যেন ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসে। যখনই কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি মক্কায় আসতো, অমনি ইসলামের শত্রুরা তাকে ঘিরে ধরতো এবং রাসূল [সা]-এর প্রভাব থেকে তাকে বাঁচানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতো। কিন্তু অধিকাংশ সময় উল্টো ফল ফলতো। এ ধরনের কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করা জরুরি মনে হচ্ছে।

তোফায়েল বিন আমর দাওসি একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও নামকরা কবি ছিলেন। একবার তিনি মক্কায় বেড়াতে এলে কোরায়েশদের কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তার সাথে দেখা করতে গেল। তারা গিয়ে বললো, 'তোফায়েল সাহেব, আপনি আমাদের শহরে আগমন করেছেন, এতে আমরা আনন্দিত। তবে এখানে যে ক'টা দিন থাকবেন একটু সাবধানে থাকবেন। এখানে মুহাম্মাদের [সা] কার্যকলাপ আমাদের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। এ লোকটা আমাদের ঐক্য বিনষ্ট করে দিয়েছে এবং আমাদের স্বার্থ ধক্ষংস করে দিয়েছে। ওর কথাবার্তা জাদুর মতো। সে পিতা-পুত্রে, ভাইয়ে-ভাইয়ে এবং স্বামী-স্ত্রীতে বিচ্ছেদ ঘটাচ্ছে। আপনার ও আপনার গোত্রকে নিয়ে আমরা শঙ্কিত, পরে আপনারা ওর কুচক্রের শিকার হয়ে যান। তাই মুহাম্মাদের সাথে আপনার একেবারেই কোনো কথা না বলা ও তার কোনো কথা না শোনা সবচেয়ে উত্তম।'

তোফায়েল বলেন, আমি মুহাম্মাদের সাথে কোনো কথা বলবো না এবং তাঁর কোন কথা শুনবো না, এই মর্মে ওয়াদা না করায় তারা আমার পিছু ছাড়েনি। তাই মসজিদুল হারামে যাওয়ার সময় কানে তুলো দিয়ে যেতাম। এই সময় হঠাৎ একদিন দেখলাম, রাসূল [সা] কা'বার কাছে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন। আমিও তাঁর খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমি তাঁর আবৃত্তি করা খুবই মধুর বাণী শুনলাম। মনে মনে বললাম, আমি কি মায়ের দুধ খাওয়া শিশু? আল্লাহর কসম, আমি তো একজন বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। আমি একজন কবি। ভালো-মন্দ বাছবিচারের ক্ষমতা আমার আছে। তাহলে মুহাম্মাদের কথা শুনতে আমাকে কে বাধা দিতে পারে? তিনি যে দাওয়াত দেন তা যদি ভালো হয় তাহলে গ্রহণ করবো। আর খারাপ হলে প্রত্যাখ্যান করবো।'

এই চিন্তা-ভাবনায় খানিকটা সময় কেটে গেল। নামায শেষে রাসূল [সা] বাড়ির দিকে রওনা হলেন। তোফায়েল তাঁর সাথে সাথে চললেন। পথে তাঁকে সব কথা জানালেন যে, তাঁর কাছে তাঁর সম্পর্কে কিরূপ অপপ্রচার করা হয়েছে এবং

www.pathagar.com

কিভাবে তাকে রাসূল [সা]-এর কাছ থেকে দূরে রাখা হয়েছে। বাড়িতে পৌঁছে তিনি রাসূল [সা]-এর দাওয়াত কী, সবিস্তারে জানতে চাইলেন। রাসূল [সা] তাঁকে ইসলামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে এবং কুরআন পড়ে শোনালেন। তোফায়েল বলেন, 'আল্লাহর কসম, এত সুন্দর বাণীও আমি কখনো শুনিনি, এমন নির্ভুল ও সত্য দাওয়াতও আমি কখনো পাইনি। আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। অত:পর তিনি নিজ গোত্রের কাছে গিয়ে ইসলাম প্রচার করলেন। এতে তাঁর সমগ্র গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে।

তোফায়েল এমন আবেগদ্দীপ্ত প্রচারকে পরিণত হন যে, বাড়িতে গিয়ে বৃদ্ধ পিতার সাথে দেখা হওয়া মাত্রই বলেন, 'আপনিও আমার কেউ নন, আমিও আপনার কেউ নই।' পিতা বললেন, 'সে কী? তোমার কী হয়েছে বাবা!' তোফায়েল বললেন, 'আমি এখন মুহাম্মাদ [সা]-এর ধর্ম গ্রহণ করেছি এবং তাঁর আনুগত্যের পথ অবলম্বন করেছি।' পিতা বললেন, 'বাবা, তোমার ধর্ম যা, আমার ধর্মও তাই হবে।' তিনি তাড়াতাড়ি গোসল করে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তোফায়েল একই পন্থায় নিজের স্ত্রীকেও দাওয়াত দিলেন। সেও ইসলাম গ্রহণ করলো। এরপর গোত্রের সবার মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। পরে তিনি রাসূল [সা]-এর কাছে এসে পুরো ঘটনা বর্ণনা করেন এবং তাঁর গোত্রের বিভিন্ন চারিত্রিক দোষের উল্লেখ করে তাদের জন্য আজাবের দোয়া করতে রাসূল [সা]কে অনুরোধ করেন। কিন্তু রাসূল [সা] হেদায়াতের ও সংশোধনের দোয়া করেন এবং তোফায়েলকে কঠোরভাবে নির্দেশ দেন, যেন ধৈর্যের সাথে নিজের গোত্রের সংশোধনের জন্য কাজ করে যেতে থাকেন এবং তাদের সাথে নম্র আচরণ করেন। [ইসলাম প্রচারে তার জবরদস্তির প্রবণতা ইসলামী কর্মনীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল না।] [সিরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড : ৪০৭-৯ পৃষ্ঠা]

সবচেয়ে মজার ঘটনা ছিল মুরদ আরাশীর। বেচারা একটা উট নিয়ে মক্কায় এসেছিল। আবু জেহেলের সাথে উট বিক্রির বিষয়ে তার কথাবার্তা পাকা হয়। কিন্তু আবু জেহেল দাম দিতে গড়িমসি করতে থাকে। বাধ্য হয়ে সে কুরাইশদের বিভিন্ন নেতার কাছে গিয়ে উটের দাম আদায় করিয়ে দেয়ার জন্য কাকুতি মিনতি করতে থাকে। পবিত্র কা'বার চত্বরে কুরাইশদের একটা বৈঠক চলছিল। আরাশী ঐ বৈঠকে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের কাছে আবেদন জানালো যে, আপনাদের কেউ আবু জেহেলের কাছে থেকে আমার পাওনাটা আদায় করে দিন। আমি একজন বিদেশী। আমার ওপর যুলুম করা হচ্ছে। বৈঠকের লোকদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যে আবু জেহেলের কাছে গিয়ে বিদেশীর হক আদায় করে দেয়ার দু:সাহস দেখায়। এ জন্য তারা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললো, মুহাম্মাদ [সা] বসে

www.pathagar.com

আছেন, তাঁর কাছে যাও। সে আদায় করে দেবে। আসলে এটা ছিল একটা পরিহাস মাত্র। কেননা সবাই জানতো মুহাম্মাদের [সা] সাথে আবু জেহেলের কি সাংঘাতিক শত্রুতা। আরাশী রাসূল [সা]-এর কাছে এসে তার সমস্ত ঘটনা খুলে বললো। রাসূল [সা] তৎক্ষণাত উঠলেন এবং বললেন, আমার সাথে এসো। সবাই অপেক্ষা করতে লাগলো কী ঘটে তা দেখার জন্য। রাসূল [সা] হারাম শরীফ থেকে বেরিয়ে সোজা আবু জেহেলের বাড়িতে গেলেন এবং দরজায় করাঘাত করলেন। ভেতর থেকে আওয়াজ এলো, কে? তিনি বললেন, আমি মুহাম্মাদ। বাইরে এসো। আমার জরুরি কথা আছে।

আবু জেহেল বেরিয়ে এলো। মুখ তার ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। তিনি বললেন, এ লোকটার যা পাওনা আছে, দিয়ে দাও। আবু জেহেল বিনা বাক্যব্যয়ে পাওনা পরিশোধ করে দিল। আরাশী সানন্দে হারাম শরীফের বৈঠকরত লোকগুলোর কাছে গিয়ে পুরো ঘটনা জানালো।

মুহাম্মাদ [সা]-এর নির্মল চরিত্রের প্রভাবেই ঘটেছিল এ ঘটনা। আবু জেহেল নিজেও এর স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং বৈঠকরত কুরাইশ নেতাদের কাছে তা ব্যক্তও করেছিল। সে বললো, মুহাম্মাদ এসে দরজায় করাঘাত করলো। আমি তার আওয়াজ শুনতেই কেন যেন ভয় পেয়ে গেলাম। [ইবনে হিশাম]

স্বয়ং আরাশী এবং মক্কাবাসীর ওপর এ ঘটনার কেমন প্রভাব পড়ে থাকতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

যেসব নওমুসলিম আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন, তাদের কল্যাণে ঐ এলাকায় ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গিয়েছিল। সেখান থেকে ২০ জন খ্রিস্টান মক্কায় এলো। তারা হারাম শরীফে রাসূল [সা]-এর সাথে সাক্ষাৎ করে। রাসূল [সা] তাদের সাথে কথা বলেন, তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন, কুরআন শোনান এবং ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। তাদের চোখে পানি এসে যায় এবং তারা নির্দ্বিধায় ঈমান আনে। তারা যখন উঠে বেরুলো, তখন মসজিদের বাইরে কুরাইশরা জটলা পাকাচ্ছিল। আবু জেহেল আবিসিনিয়ার প্রতিনিধিদলকে বললো, তোমরা কেমন নির্বোধ! নিজেদের ধর্মকে পরিত্যাগ করলে! প্রতিনিধিদল বললো, 'আপনাদেরকে আমরা সালাম জানাচ্ছি। আমরা আপনাদের সাথে কোন বিবাদ বিসম্বাদে যেতে চাইনে। আমাদের পথ ভিন্ন এবং আপনাদের পথও ভিন্ন। আমরা একটা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হতে চাইনি।'

মদীনার ভিন্নতর পরিবেশ

ঐতিহাসিক দিক দিয়ে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা যে, মদীনার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিবেশ ছিল মক্কা থেকে একেবারেই ভিন্নতর। এ কারণে ইসলামের

www.pathagar.com

যে চারাগাছ মক্কায় চরম প্রতিকূল পরিবেশে বেড়ে উঠতেই পারছিল না, মদীনায় এনে লাগানো মাত্রই তা দ্রুত পত্রপল্লবে বিকশিত হয়ে উঠলো ও ফল দিতে শুরু করলো।

প্রথম পার্থক্যটা ছিল এই যে, মক্কা ও তার আশপাশের গোটা জনবসতি পরস্পরে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল। তারা ছিল একই ধর্মাবলম্বী গোত্র ও পারস্পরিক চুক্তির বন্ধনে আবদ্ধ এবং তাদের ওপর কোরায়েশদের ছিল পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য। কিন্তু মদীনা ও তাঁর আশেপাশে দুটো ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির জনগোষ্ঠী বাস করতো এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহ ও উত্তেজনা বিরাজ করছিল।

মদীনা ছিল ইহুদীদের প্রতিষ্ঠিত 'ইয়াসরিব' নামক প্রাচীন শহর। এখানে তাদের ক্রমান্বয়ে বংশ বিস্তার ঘটতে থাকায় মদীনার আশপাশে তাদের নতুন নতুন বসতি গড়ে উঠেছিল। সেই সাথে তাদের ছোট ছোট সামরিক দুর্গও নির্মিত হয়েছিল। এভাবে সমগ্র এলাকা ইহুদীদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রভাবাধীন ছিল।

দ্বিতীয় জনগোষ্ঠীটা ছিল আনসারদের। তাদের আসল জন্মভূমি ছিল ইয়েমেন। কাহতানের বংশধর ছিল তারা। ইয়েমেনের ইতিহাসখ্যাত বন্যায় যে ব্যাপক ধক্ষংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়, তা থেকে বেঁচে যাওয়া লোকেরা এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ে। কাহতান গোত্রের দু'ভাই আওস ও খাজরাজ তৎকালে মদীনায় এসে বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীকালে অন্যান্য লোকও এসে থাকতে পারে। তবে এই নবাগতদের মাধ্যমেই এ অঞ্চলে নতুন অধিবাসীর সমাগম ঘটে। পড়ে বংশ বিস্তার ঘটতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে একটা নতুন শক্তির উদ্ভব ঘটে। প্রথম প্রথম তারা ইহুদী সমাজ ও কৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবন যাপন করতে চেয়েছিল। কিন্তু আগে থেকে জেঁকে বসা ইহুদী জনগোষ্ঠীর প্রভাব ও শক্তির চাপে বাধ্য হয়ে তাদের সাথে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করে। এই চুক্তিভিত্তিক মৈত্রী দীর্ঘকাল সুষ্ঠুভাবে চলতে থাকে। কিন্তু ইহুদীরা যখনই অনুভব করলো যে, আনসারদের ক্রমবর্ধমান শক্তি তাদের প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য একটা হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তখন তারা মিত্রতার সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেললো।

ইহুদীদের সাথে আনসারদের সম্পর্ক সব সময়ই দ্বন্দ্ব সঙ্ঘাতে পূর্ণ ছিল, কিন্তু কোন আদর্শ বা লক্ষ্য না থাকায় আনসারদের অভ্যন্তরীণ ঐক্য কোন মযবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কলহে তাদের শক্তি ঘুনের মত খেয়ে নষ্ট করে দেয়। ফলে এক সময় আওস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে

www.pathagar.com

বুয়াস নামক যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং উভয় পক্ষের বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ নিহত হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইহুদীরা প্রায়শ আনসারদের সামনে আস্ফালন করতো যে, শিগগীরই শেষ নবী আসবেন। তিনি এলে আমরা তার সাথে মিলিত হয়ে তোমাদেরকে দেখে নেব। ইহুদীদের এই হুমকী ও ভবিষ্যদ্বাণীর কারণে আনসাররাও প্রতীক্ষিত নবীর অপেক্ষায় দিন গুণতে থাকে। তারা মনে মনে সংকল্প নেয়, ঐ নবীর আবির্ভাব ঘটলে তারা সবর্প্রথম তাঁর দলে ভিড়বে। হলোও তাই। যারা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, তারা বঞ্চিত থেকে গেল। ইহুদীরা যাদেরকে মার খাওয়াতে চেয়েছিল, তাদের হাতে নিজেরাই মার খেয়ে গেল। [সিরাতুন্নবী : শিবলী নুমানী]

ইহুদীদের আধিপত্য ও আভিজাত্যের একটা কারণ ছিল তাদের ধর্মীয় মোড়লিপনা। তাদের কাছে তাওরাত ছিল। এই সুবাদে তারা একটা স্বতন্ত্র ধর্মীয় বিধানের পতাকাবাহী ছিল, তাদের কাছে আলাদা আকিদা ও আদর্শগত পুঁজি ছিল, কিছু চারিত্রিক নীতিমালা ছিল, কিছু ধর্মীয় আইন ও বিধি ছিল, কিছু ঐতিহ্য ছিল এবং এবাদত পালনের স্বতন্ত্র বিধান ছিল। এদিক দিয়ে আনসারদের বলতে গেলে কিছুই ছিলনা। এ সব বিষয়ে তারা ইহুদীদের মুখাপেক্ষী ছিল। তাদেরই 'বাইতুল মাকদাস' [তৎকালে ইহুদীদের ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্র] থেকে তারা শিক্ষা লাভ করত। এমনকি যদি কোন আনসারীর সন্তান না বাঁচতো, তাহলে সে এই বলে মান্নত মানত যে, সন্তান বেঁচে থাকলে তাকে ইহুদী বানানো হবে। আনসারদের মধ্যে এদিক থেকে হীনমন্যতাবোধ বিরাজ করতো। তাদের আত্মসম্মানবোধ ও আভিজাত্যবোধ ক্ষুন্ন হওয়ায় তারা মনে মনে সব সময় বিব্রত থাকতো। এই সমস্ত তথ্য দ্বারা বুঝা যায় যে, মদীনার পরিমন্ডলে ইহুদী ও আনসারদের মাঝে দ্বন্দ্ব কলহ বিরাজ করতো এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল গভীর প্রতিদ্বন্দ্বীসুলভ। যেসব শর্তের ভিত্তিতে ইহুদীরা চুক্তিতে সই করেছিল, তাঁর কারণে তারা ইসলামী আন্দোলনের উন্নতি ও বিস্তার লাভে বাধা দিতে পারছিল না। তাদের চোখের সামনে সাধারণ মানুষ ও তাদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হচ্ছিল। অথচ তাদের আধ্যাত্মিক নেতারা, পীর দরবেশরা ও মুফতিরা নীরব দর্শক হয়ে তা দেখছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাদের ঘরে ঘরেও ইসলাম প্রবেশ করা শুরু করেছিল। তাদের নিজেদের লোকেরা, বিশেষত গণ্যমান্য লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে থাকায় ধর্মব্যবসায়ী মানসিকতার অধিকারী এই সম্প্রদায়ের ধৈর্যের বাঁধ ছিল না। তাছাড়া প্রত্যেক বিপ্লবী আন্দোলনের প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা এত

www.pathagar.com

অপ্রতিরোধ্য হয়ে থাকে যে, নেতিবাচক মনোভাব নিয়ে যারা তার প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসে, তাদের মোকাবিলা করার জন্য তাদের পরিবারের নবীনরাই ঐ বিপ্লবী আদর্শে দীক্ষিত হয়ে থাকে। ফলে ছেলে বাপের সাথে, বউরা শাশুড়ির সাথে, মেয়েরা মায়ের সাথে, পৌত্রেরা দাদা নানার সাথে এবং দাসেরা মনিবের সাথে বিরোধে লিপ্ত হয়ে থাকে।

ইহুদী সমাজে এ ধরনেরই এক অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন সালাম। তাঁর প্রাগৈসলামিক নাম ছিল হাসীন। তিনি একজন উঁচুদরের আলেম ও খোদাভীরু ধর্মীয় নেতা ছিলেন। তিনি ছিলেন বনু কাইনুকা গোত্রের লোক। রাসূল [সা]-এর সাথে সাক্ষাতের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজের পরিবার পরিজনকেও ইসলামের দাওয়াত দেন ও উদ্বুদ্ধ করেন। শেষ পর্যন্ত গোটা পরিবারই ইসলাম গ্রহণ করে। তাঁর এক আত্মীয় তাঁর কাছ থেকে শুনে তাঁর ইসলাম গ্রহণের যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তা শুনুন, 'আমি যখন আল্লাহর বার্তাবাহকের আগমনের খবর প্রথম শুনলাম, তখন তাঁর নাম, গুণবৈশিষ্ট্য ও আগমনের দিনক্ষণ জেনে নিলাম। কেননা আমরা তাঁর প্রতীক্ষায় ছিলাম। তাই এই খবরটা শুনে মনে মনে আনন্দিত হচ্ছিলাম। কিন্তু মুখে কিছু বলছিলাম না। তিনি যখন মদীনায় চলে এলেন, তখন পর্যন্ত আমি চুপচাপ ছিলাম। যখন তিনি কোবায় বনু আমর ইবনে আওফের বসতিতে পৌঁছলেন, তখন একটা লোক এসে আমাকে তাঁর আগমন বার্তা শোনালো। এ সময় আমি আমার খেজুর গাছের মাথার ওপর চড়ে কাজ করছিলাম। আমার ফুফু খালেদা বিনতে হারেস নিচে বসা ছিলেন। আমি আগমন বার্তা শোনামাত্র উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবর ধ্বনি তুললাম। ফুফু আমার ধ্বক্ষনি শুনে বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করে দিক! হযরত মূসা বিন ইমরানের আগমনের খবর শুনলেও তুই এমন উল্লাস প্রকাশ করতি না।' আমি বললাম, 'ফুফুজান! আল্লাহর কসম, ইনি মূসা বিন ইমরানের ভাই এবং তাঁরই ধর্ম পালনকারী। মূসা বিন ইমরান যে বিধান এনেছিলেন, ইনিও তাই নিয়ে এসেছেন।' ফুফু বললেন, 'হে আমার ভাতিজা, যে নবীর কথা আমাদেরকে বলা হয় যে, কেয়ামতের আগে আসবেন, ইনি কি সেই নবী?' আমি বললাম, 'হাঁ, ইনিই তো সেই নবী।' এরপর আমি আল্লাহর নবীর সান্নিধ্যে পৌঁছলাম এবং ইসলাম গ্রহণ করলাম। তারপর নিজের পরিবার পরিজনের কাছে এলাম এবং তাদেরকেও দাওয়াত দিলাম। ফলে তারা সবাইও ইসলাম গ্রহণ করলো। [সিরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড]

এই নওমুসলিম আলেম যেহেতু ইহুদীদের দুর্বলতাগুলো জানতেন এবং তাদের বিদ্বেষপূর্ণ মানসিকতা ও নিকৃষ্ট চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন, তাই তাঁর

www.pathagar.com

ইসলাম গ্রহণে কী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হবে, তাও জানতেন। স্বার্থপরতার ভিত্তিতে যখন দল ও গোষ্ঠী গঠিত হয়, তখন চরিত্রের এত অধপতন ঘটে থাকে যে, ভালোকে ভালো ও মন্দকে মন্দ বলার পরিবর্তে নিজেদের মন্দকে ভালো এবং প্রতিপক্ষের ভালোকে মন্দ বলা হয়। নিজের গোয়ালের গরু কালো হলেও তাকে সাদা এবং অন্যের গোয়ালের গরু সাদা হলেও তাকে কালো বলা হয়। এমনকি নিজের গোয়ালের সাদা গরু গোয়াল ভেঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ামাত্রই কালো বলে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। সকল যুগেই এ ধরনের ধর্মচারীদের চরিত্র একই রকম হয়ে থাকে। যতক্ষণ কোন ব্যক্তি তাদের সাথে থাকে অথবা অন্তত পক্ষে তার সম্পর্কে এই আশংকা জন্মে না যে তার তৎপরতা তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না, ততক্ষণ তার গুণাবলী খোলা মনে স্বীকার করা হয়। বরং কখনো অতিরঞ্জিত করে ঢালাওভাবে তার বিদ্যা ও চরিত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়। কিন্তু সময়ের কিছু পরিবর্তনের সাথে সাথে এ ধরনের কোন মহান ব্যক্তিত্বের ভূমিকা কারো ধর্মব্যবসায়ের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হলে তৎক্ষণাত মতামত পালটে যায়। আগে যিনি আলেম ছিলেন এখন তাকে মূর্খ বলা হয়। আগে যিনি মুমিন ছিলেন, এখন তাকে বলা হয় কাফের, ফাসেক এবং আরো অনেক কিছু। আগে যে ব্যক্তি জাতির সেবক বলে গণ্য হতো, এখন তাকে বলা হয় বিপথগামী। আগে যে ব্যক্তি ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র ছিল, এখন সে হয়ে যায় গালাগালের শিকার। বিকৃত স্বভাবের অধিকারী ইহুদী জাতির চরিত্রের এইসব হীনতা ও নীচতা আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের জানা ছিল। তিনি এই হীনতা ও নীচতার ওপর থেকে আবরণ তুলে ফেললেন। মনে মনে একটা নাটকের পরিকল্পনা করে নিজের ইসলামের গ্রহণের বিষয়টা গোপন রেখেছিলেন। উপযুক্ত সময় রাসূল [সা]-এর কাছে হাজির হয়ে বললেন, ইহুদীরা একটা বাতিলপন্থী জাতি। তাদের বিকারগ্রস্ত স্বভাবের মুখোশ খুলে ফেলার জন্য আপনি আমাকে আপনার গৃহে পর্দার আড়ালে বসিয়ে রাখুন। তারপর তাদের চোখের আড়ালে রেখে আমার সম্পর্কে তাদের মতামত জানতে চাইবেন। তারপর দেখবেন, আমার ইসলাম গ্রহণের কথা না জানা অবস্থায় তারা আমার সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করে। তারা যদি আমার ইসলাম গ্রহণের খবর জেনে ফেলে, তাহলে আমার ওপর অপবাদ আরোপ করবে ও দোষ বদনাম করবে। রাসূল [সা] অবিকল তাই করলেন। আব্দুল্লাহ বিন সালামকে তাঁর ঘরে পর্দার আড়ালে বসিয়ে রাখলেন। এদিকে ইহুদী নেতারা এলো এবং আলাপ আলোচনা চললো। তারা নানা প্রশ্ন করলো এবং তাঁর জবাব দেয়া হলো। সবর্শেষ রাসূল [সা] জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যকার হাসীন বিন সালাম কেমন লোক? তারা

www.pathagar.com

বলল, 'উনি আমাদের সরদার এবং সরদারের ছেলে। উনি আমাদের একজন মহৎ ব্যক্তি এবং একজন বড় আলেম। এভাবে তারা গুণকীর্তন করার পর আব্দুল্লাহ বিন সালাম পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, 'হে ইহুদী সম্প্রদায়, আল্লাহকে ভয় করো এবং যে ধর্ম মুহাম্মাদ [সা] নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর। কেননা আল্লাহর কসম, তোমরা ভালোভাবেই জান যে, ইনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। তোমরা মুহাম্মাদ [সা]-এর পবিত্র নাম ও গুণাবলী তাওরাতে লিখিত দেখে থাক। তাই আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। তাঁর ওপর ঈমান আনছি, তাঁকে সত্য বলে জানি এবং স্বীকার করছি।' ইহুদীরা এই নাটকে যারপরনাই বিব্রত হলো এবং তৎক্ষণাৎ বলল, 'তুমি মিথ্যুক।' এরপর আব্দুল্লাহ বিন সালামের নিন্দাবাদ ও কুৎসা রটানো শুরু করে দিল। এক্ষুণি কয়েক সেকেন্ড আগে যাকে মহান ব্যক্তি ও আলেম বলে আখ্যায়িত করেছে, তাকেই মিথ্যুক বলতে শুরু করে দিল। আব্দুল্লাহ রাসূল [সা]কে বললেন, 'আমি আপনাকে বলেছিলাম না যে, এরা একটি বাতিলপন্থী সম্প্রদায়। এরা অহংকার, মিথ্যাচার ও অসদাচারের দোষে দুষ্ট।' এভাবে একটা নাটকীয় পদ্ধতিতে আব্দুল্লাহ বিন সালাম নিজের গোটা পরিবারের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন। এ ঘটনায় ইহুদীদের মনমগজে কি সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকতে পারে ভেবে দেখুন। [সিরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, ১৩৮-১৩৯ পৃ:]

এর অল্প কিছুদিন পর ওহুদ যুদ্ধের সময় প্রখ্যাত আলেম ও সম্মানিত ব্যক্তি মুখাইরিকের বেলায়ও এ ধরনের ঘটনা ঘটে। ইনি ইহুদীদের মধ্যে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ছিল অনেকগুলো খেজুরের বাগান। তিনি নিজের জ্ঞানের আলোকে রাসূল [সা]-এর গুণাবলী দেখে তাঁকে চিনে ফেলেছিলেন। ঘটনাক্রমে ওহুদের দিন এসে গেল এবং তা ছিল শনিবার। একটা মজলিশে তিনি বললেন, 'হে ইহুদী জনমন্ডলী, আল্লাহর কসম তোমরা জান যে, মুহাম্মাদ [সা]-এর সাহায্য করা তোমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।' তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, মক্কার মোশরেকদের মোকাবিলায় মুসলমানদের দলকে সাহায্য করা তোমাদের ওপর নীতিগতভাবে ফরয। এর জবাবে ইহুদীরা যা বললো তা তাদের ধাপ্পাবাজি ও খল মানসিকতারই ঘৃণ্য ছবি তুলে ধরে। তারা বললো, 'আজ তো শনিবার।' এ জবাব শুনে মুখাইরিক তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'তোমাদের জন্য কোন শনিবার নেই।' অত:পর তিনি অস্ত্র হাতে নিয়ে ওহুদের ময়দানে গিয়ে রাসূল [সা]-এর সাথে মিলিত হলেন। যাওয়ার সময় নিজের পরিবার পরিজনদের সাথে দেখা করে বলে গেলেন, আমি যদি আজ নিহত হই,

www.pathagar.com

তবে আমার সমস্ত ধন সম্পদ রাসূল [সা]-এর হাতে সমর্পন করবো। তিনি আল্লাহর নির্দেশে যেভাবে ভালো মনে করেন, তা খরচ করবেন। সত্যিই এই ত্যাগী সৈনিকটি ঐদিন মারা গেলেন। রাসূল [সা] তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি গ্রহণ ও ব্যয় করেন। তবে মুখাইরিক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ আছে।

ইসলামী আন্দোলনের এই বিজয়াভিযানে ইহুদীদের ভন্ডামি যে গোপন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে, তা একটা মজার ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উম্মুল মুমিনীন হযরত সফিয়া বিনতে হুয়াই বিন আখতার বর্ণনা করেন, আমি আমার বাবা [ইহুদী সরদার হুয়াই] ও চাচার কাছে অন্য সব সন্তানের চেয়ে বেশি প্রিয় ছিলাম। তারা উভয়ে সব সময় আমাকে সাথে সাথে রাখতেন। রাসূল [সা] যখন মদীনায় এসে কোবায় অবস্থান করতে লাগলেন, তখন আমার বাবা হুয়াই বিন আখতার ও চাচা ইয়াসার বিন আখতার খুব ভোরে তাঁর সাথে দেখা করতে গেলেন। সূর্যাস্তের সময় ফিরে এলেন। মনে হলো, তারা খুবই ক্লান্ত ও অবসন্ন। তারা খুব ধীরগতিতে চলছিলেন। আমি অভ্যাসমত মুচকি হেসে তাদের সামনে গেলাম। কিন্তু ক্লান্তির কারণে তারা আমার দিকে ভ্রুক্ষেপই করলো না। আমার চাচা আবু ইয়াসার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'কি হে, ইনিই কি সেই [প্রতিশ্রুত নবী] ব্যক্তি?' বাবা বললেন, 'হাঁ, আল্লাহর কসম।' চাচা আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি তাঁকে চিনে ফেলেছ? তুমি কি নিশ্চিত?' বাবা বললেন, 'হ্যাঁ।' চাচা জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন তাঁর সম্পর্কে তোমার মনোভাব কী?' বাবা বললেন, 'শুধুই শত্রুতা। যতদিন বেঁচে আছি, খোদার কসম, শত্রুতাই করে যাবো।'

এই ছিল ইহুদীদের আসল মানসিকতা। তারা খুব ভালো করেই জানতো যে, তাদের কাছে যিনি এসেছেন তিনি সত্যের আহক্ষায়ক এবং নবী। তাঁর প্রতিটি কথা তার সত্যতার সাক্ষ্য বহন করছে। তাঁর সমগ্র চরিত্র তাঁর মর্যাদাকে স্পষ্ট করে দিচ্ছে। তাঁর চেহারা তাঁর নবুওয়তের লক্ষণ প্রতিফলিত করছে। তারা শুধু জানতো ও বুঝতো তা নয়, বরং গোপন বৈঠকে তা মুখ দিয়ে স্বীকারও করতো। কিন্তু ঈমান ও আনুগত্যের পথ অবলম্বন না করে তারা বিরোধিতা ও শত্রুতার জন্য কৃতসংকল্প হতো। এটাই ছিল ইহুদীদের চিরাচরিত স্বভাব। সূর্য উঠলে যে আলোর বান ডাকে তা কে না জানে। মানুষ ও জীবজন্তুরও চোখ আছে, তাই তারা এ দৃশ্য দেখতে পায়। কিন্তু যে ঘাসপাতার চোখ নেই, তারাও টের পায় যে, প্রত্যেক অন্ধকার রাতের শেষে যে ঘটনা প্রতিদিন ঘটে থাকে, তা ঘটে গেছে। এমনকি তাপ, মাটির নিষ্প্রাণ কণাগুলো, পানির ফোঁটাগুলো এবং বাতাসের ঝাপটাগুলোও জেনে ফেলে যে, আলোর বার্তাবাহক আবির্ভূত হয়েছেন। সূর্যোদয় এমন এক বিপ্লবাত্মক ঘটনা যে, চামচিকে ও বোবা পর্যন্ত তা

www.pathagar.com

জেনে ফেলে। কিন্তু তাদের স্বভাবের বক্রতা এই যে, রোদ ওঠার পর আর সব জীব জানোয়ারের চোখ খুলে যায়, কিন্তু পেঁচা ও চামচিকের চোখ বন্ধ হয়ে যায়। উপরন্তু তাদের জন্য সূর্যোদয়ের আলামতই হয়ে থাকে সূর্য রশ্মিতে তাদের চোখ ঝলসে যাওয়া ও বুঁজে যাওয়া। মানুষ এত অন্ধ হতে পারে না যে, তাঁর সামনে আল্লাহর নবীগণ অলৌকিক পর্যায়ের জ্ঞান ও চরিত্র নিয়ে আবির্ভূত হবেন এবং সে অনুভবই করবে না যে, কোন অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ও মহান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে। এসব লোক দেখে, জানে, বোঝে এবং এ সব কিছুর পরও চোখ বন্ধ করে রাখে। তারপরও যদি আলো চোখের ভেতর প্রবেশ করে, তবে চোখের ওপর পট্টি বেঁধে নেয়; হাত দিয়ে ঢেকে নেয়, মুখ বালুতে লুকায়, কক্ষের দরজা জানালা বন্ধ করে তাঁর ওপর কালো পর্দা ফেলে দেয়। প্রবাদ আছে যে, ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগানো যায়, কিন্তু জাগ্রত ব্যক্তিকে জাগানো যায় না। অনুরূপভাবে, অজ্ঞ লোককে জ্ঞান দান করা যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি জেনেও না জানার ভান করে, তাকে অজ্ঞতার জগত থেকে বের করে আনা সম্ভব নয়। ইহুদী জাতির অধিকাংশ এবং তাদের বড় বড় আলেমদের এই অবস্থাই হয়েছিল। কুরআনও তাদের এই বিকৃতির উল্লেখ করে বলেছে যে, 'অর্থাৎ তারা নিজের সন্তানদেরকে যেমন নিশ্চিতভাবে জানে ও চেনে, রাসূল [সা]কেও ঠিক তেমনি জানে ও চেনে।'

ইহুদী নেতারা রাসূল [সা]-এর উচ্চমর্যাদা ও সাধারণ মানুষরা তাঁর নতুন দাওয়াতের প্রতি ধাবমান হতে দেখে হিংসায় জ্বলতে থাকতো এবং তাদের হৃদয়ের জগতে ঘোরতর অবস্থার সৃষ্টি হতো।

বেদুইন আরবদের সাথে রাসূলের [সা] ব্যবহার

রাসূলুল্লাহ [সা] মূলত বেদুইন আরব সমাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, শুধুমাত্র আরব সমাজ নয়। বেদুইনদের আচার আচরণগুলো খুব নিম্নস্তরের ছিল যা রাসূলুল্লাহকে [সা] সহ্য করতে হতো। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক আরব বেদুইন মদীনায় আসলো এবং মসজিদ যে কি জিনিস তা সে জানতো না। সে মসজিদের এক কোণায় গিয়ে প্রস্রাব করে দিলো। সাহাবীরা অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাকে তিরস্কার করতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ [সা] বললেন, তাকে কষ্ট দিও না। অত:পর তাকে ডাকলেন এবং বোঝালেন যে, মসজিদ আল্লাহকে স্মরণ ও ইবাদত করার জায়গা, এরকম অশ্লীল কাজ করার জায়গা নয়।

মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম বলেন, আমি নামাজরত অবস্থায় ছিলাম এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি হাঁচি দিল, আমি বললাম, ইয়ারহামুকুমুল্লাহ। অন্য সবার দৃষ্টি আমার দিকে আকৃষ্ট হলো। লোকটি আবারও হাঁচি দিল এবং আমিও পুনরায় বললাম,

www.pathagar.com

ইয়ারহামুকুমুল্লাহ। যখন দেখলাম অন্যরা আমার দিকে তাকিয়ে আছে, তাদেরকে বললাম, তোমাদের মা তোমাদের শোকে বসুক, কেন আমার দিকে চেয়ে আছো? অন্যরা তাদের রানের উপর হাত চাপড়াতে লাগল এবং আমিও চুপ হয়ে গেলাম। যখন রাসূলুল্লাহর [সা] নামাজ শেষ হলো, আমাকে ডাকলেন। আল্লাহর কসম কোন শিক্ষক তার আগে ও পরে আমি পাইনি যে, আমাকে এভাবে শিক্ষা দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ [সা] না আমাকে কোন প্রকার শাস্তি দিলেন, না কোন প্রকার খারাপ ব্যবহার করলেন। তিনি বললেন, তুমি যে নামাজ পড়েছ তার কোন লাভ নেই, কেননা তুমি নামাজের মাঝে কথা বলেছ, আর নামাজ হচ্ছে তসবিহ, তকবির ও কোরান তেলাওয়াতের স্থান। [সোবোলোল হুদা, ৭/১৯]

অন্য এক রেওয়ায়েতেও আল্লাহর রাসূল [সা]-এর দ্বীনি শিক্ষা দানের ধরন বর্ণিত হয়েছে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, হে আল্লাহর রাসূল [সা]! নামাজের সময় হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমি জোনোব অবস্থায় রয়েছি, কি করবো? রাসূলুল্লাহ [সা] বললেন, আমার সাথেও অনেক সময় এরকম হয়। ঐ লোকটি বলল, আপনি আমাদের মতো নন, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করেছেন। রাসূলুল্লাহ [সা] বললেন, আল্লাহর কসম; আমিও আল্লাহর বিনয়ীতম বান্দা হতে চাই আর তাকওয়ার ব্যাপারে অধিক জ্ঞানী। [মুসলিম, ১১১০]

মায়া'য ইবনে জাবাল ও আবু মুসা আশআরী যখন ইয়ামানে যাচ্ছিলেন, রাসূলুল্লাহ [সা] তখন তাদেরকে বললেন, জনগণের সাথে সহজ ব্যবহার করো কঠিন ব্যবহার করো না, সুসংবাদ দিও বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না। কিছু লোক মদীনায় এলো এবং জনগণকে জিজ্ঞাসা করলো, রাসূলুল্লাহ [সা] কেমন ইবাদত করেন? যখন শুনল এবং অনুভব করলো যে তিনি খুব বেশি পরিমাণে ইবাদত করেন না, তখন বলল, খুব ভাল, যেহেতু তিনি আল্লাহর রাসূল তাই আল্লাহ তায়ালা তার সকল কিছুকে ক্ষমা করেছেন। তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, আমি নিয়মিত রাত থেকে সকাল পর্যন্ত ইবাদত করি। আরেকজন বলল, আমি সর্বদা রোজা রাখব। অন্য আরেকজন বলল, আমি বিয়ে করব না শুধু আল্লাহর ইবাদত করব। রাসূলুল্লাহ [সা] এলেন এবং তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা এরকম কথা বলছ কিন্তু আমি তোমাদের চেয়ে বিনীত ও পরহেজগার হওয়া সত্ত্বেও রোজা রাখি আবার খাদ্যও খাই, নামাজ পড়ি, বিয়েও করেছি আর এটি হচ্ছে আমার সুন্নত, যে কেউ আমাকে মানে সে যেন আমাকে অনুসরণ করে।

www.pathagar.com

অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে মুসলিম সম্প্রদায়ের আচার অনুষ্ঠানগুলো অন্য কোনো অমুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর চাপিয়ে দেয় না ইসলাম। এ বিষয়ে আল কুরআনে বলা হয়েছে, 'দ্বীন তথা জীবনবিধান গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই; কেননা সত্য পথ হতে ভ্রান্ত পথ সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।' [সূরা বাকারা : ২৫৬]। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন আর আমাদের জন্য আমাদের দ্বীন।' [সূরা কাফিরূন : ৬]। বস্তুত ইসলামের মূল কথা হচ্ছে এক দিকে মুসলিম সম্প্রদায় পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ইসলামের ধর্মীয় ও বৈষয়িক অনুশাসন জীবনের সব ক্ষেত্রে পুরোপুরি মেনে চলে একটি আদর্শ সমাজ ও পৃথিবী গড়ে তুলবে যার সুফল অন্য সব সম্প্রদায়ের লোকেরা ভোগ করবে এবং এর প্রতি আকৃষ্ট হবে। অপর দিকে অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করার সুযোগ দেবে এবং তাতে কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে না।

অমুসলিমদের সাথে নবী করিম [সা]-এর ব্যক্তিগত আচরণ ছিল খুবই অমায়িক। সাহাবী আবু বছরা বর্ণনা করেন, 'ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি এক রাতে নবী করিম [সা]-এর মেহমান হই। তাঁর ঘরে যে ক'টি বকরি ছিল, সব ক'টির দুধ আমি একাই পান করে ফেলি। ফলে সে রাতে নবী করিম [সা] সহ পরিবারের সবাই অভুক্ত অবস্থায় রাত যাপন করেন। তবুও তিনি আমার প্রতি বিন্দুমাত্রও বিরক্ত হন নি।' [মুসনাদে আহমদ]। এ বিষয়ে হযরত আসমা [রা] বর্ণনা করেন, 'হুদায়বিদায় সন্ধির পর তিনি তাঁর অমুসলিম মায়ের সাথে আচরণ সম্পর্কে নবী করিম [সা]-কে জিজ্ঞেস করলে জবাবে তিনি বললেন, 'মা যেই হোন না কেন তার সাথে সদাচরণ করতেই হবে।' [বুখারি]।

রাসূল [সা]-এর মহানুভবতায় ইসলামের সুশীতল ছায়ায়

বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ [সা]-সহ জিন্দাদিল আল্লাহপ্রেমিকদের চারিত্রিক সৌন্দর্যে ব্যাকুল হওয়া মানুষের জীবনবিপ্লবের চমকপ্রদ গল্প।

এক. প্রিয় নবীর ক্ষমা ও ঔদার্যে প্রভাবিত ছামামা [রা]-এর মুসলমান হওয়ার ঘটনা। ষষ্ঠ হিজরির ১০ মহররম রাসূলুল্লাহ্ [সা] মুহাম্মদ ইবনে মাসলামার নেতৃত্বে ৩০ জন অশ্বারোহী সৈনিককে 'কারতা' [এটি বনু বকর গোত্রের শাখা; মদীনা থেকে সাত দিন সফরের দূরত্বে 'দারবা' এলাকায় তাদের অধিবাস] অভিমুখে প্রেরণ করেন। বিদ্রোহী অধ্যুষিত এ অঞ্চলে তাদের পরিচালিত ঝটিকা আক্রমণে ১০ জন নিহত ও বাদ-বাকি লোকেরা পালিয়ে যায়। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে ১৫০টি উট এবং তিন হাজার ছাগল হস্তগত হয়। অভিযান

www.pathagar.com

পরিচালনাকারী সাহাবীগণ সব কিছু নিয়ে রাসূলের দরবারে হাজির হন। ১৯ দিন পর ২৯ মহররম তাঁরা মদীনায় পৌঁছেন। রাসূল [সা] লব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ 'গনিমত' সংশ্লিষ্টদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। গনিমত বণ্টনে ১০টি ছাগল একটি উটের সমান বিবেচনা করা হয়। হযরত আবু হোরায়রা [রা] সূত্রে সহিহ্ বুখারিতে বর্ণিত: অভিযান পরিচালনাকারী সৈনিকরা বনু হানিফার গোত্রপ্রধান ছামামা বিন আ'সালকে বন্দি করে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। রাসূলের সামনে তাঁকে হাজির করার পর তিনি মসজিদে নববীর একটি স্তম্ভের সঙ্গে বেঁধে রাখার নির্দেশ দেন, যাতে মুসলমানদের নামাজ, আল্লাহর দরবারে বিগলিত হৃদয়ে কান্নাকাটি ও অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগি প্রত্যক্ষ করে তার অন্তরে ইতিবাচক প্রভাব সঞ্চারিত হয়। আল্লাহর কথা স্মরণে আসে; পরকালীন জীবনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। মুসলমানদের ঈমান-আমলের অপার্থিব জ্যোতিতে তার অন্তর্লোক আলোকিত হয়। রাসূলুল্লাহ [সা] তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করলেন, 'ছামামা! আমার ব্যাপারে তোমার ধারণা কিরূপ? তিনি উত্তর দিলেন, 'আপনার ব্যাপারে আমার ধারণা ভালোই। আপনি যদি আমাকে মৃত্যুদন্ডের হুকুম দেন, তাহলে একজন খুনিকে প্রাণদন্ড দেওয়া হবে, যে শাস্তির সে উপযুক্ত। আর যদি ক্ষমা করে দেন, তাহলে সেটা একান্ত আপনার উদারতা। যদি আপনার সম্পদের চাহিদা থাকে তবে বলুন! যত চান তা আপনার সামনে হাজির করব। দ্বিতীয় দিন আবারও রাসূল [সা] তাকে একই প্রশ্ন করেন। তিনি রাসূল [সা]-এর দয়ার্দ্রতা অনুভব করে প্রথম ও তৃতীয় বাক্য উহ্য করে কেবল এটুকু বললেন, 'যদি দয়া করেন তবে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির ওপরই দয়া করা হবে।' দ্বিতীয় দিনও রাসূল [সা] চুপচাপ চলে গেলেন। মহানবী [সা] তৃতীয় দিন একই জায়গায় আগের জিজ্ঞাসারই পুনরাবৃত্তি করলেন। ছামামা বলল, 'গতকাল যা বলেছি আপনার ব্যাপারে তা-ই আমার ধারণা।' আজকের [তৃতীয় দিনের] জবাবে ছামামা 'যদি অনুগ্রহ করেন, তবে তা একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির প্রতিই করা হবে' বাক্যটিও অনুক্ত রেখে তার বিষয়টি পুরোপুরি রাসূলের নৈতিক উচ্চতা ও অনুগ্রহ-উদারতার ওপর ছেড়ে দেন। তিনি ছামামার উদ্দেশ্যে বলেন, 'ছামামা! আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম, যাও, তুমি মুক্ত।' মুক্তি পেয়েও ছামামা রাসূলের এমন বিরল উদারতা আর দয়া-ক্ষমাশীলতার প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে মসজিদের অদূরে খেজুর বাগানে গিয়ে গোসল সেরে ফিরে এলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয় এবং মুহাম্মাদ [সা] আল্লাহর নির্বাচিত প্রেরিত পুরুষ তথা রাসূল। রাসূলের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, 'হে মুহাম্মাদ [সা]! এ পরিস্থিতির আগ পর্যন্ত আপনার

www.pathagar.com

চেহারাই আমার কাছে সর্বাধিক ঘৃণ্য ছিল, এখন থেকে পৃথিবীতে আপনার চেহারাই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মুখ।' [বোখারি, খন্ড-১, পৃ. ৬৬]

পরবর্তী জীবনে ছামামা [রা]-এর কীর্তি

ছামামা ইবনে আ'সাল [রা] অন্যতম মর্যাদাবান সাহাবী। রাসূলুল্লাহ্ [সা]-এর ইন্তেকালের পর ইয়ামামা অঞ্চলের অধিবাসীরা ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়। তিনি লোকদের সামনে এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে শোনাতে থাকেন, 'হা-মীম, এ গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি পাপ মোচনকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা ও পূর্ণ সামর্থ্যবান। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তাঁরই দিকে হবে প্রত্যাবর্তন।' [সুরা মু'মিন, ১-৩]। এরপর তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, বিবেকবোধ থেকে ন্যায়সংগতভাবে বলো দেখি! মিথ্যাবাদী মুসাইলামার বেহুদা বকবকানির সঙ্গে মহান আল্লাহর এ অমিয় বাণীর তুলনা কী করে চলে? হযরত ছামামার নিষ্ঠা ও ঈমানবিধৌত এ কয়টি বাক্য শত-সহস্র মানুষর অন্তরে গিয়ে করাঘাত করে। মুসাইলামার তিন হাজার অনুসারী তাকে ত্যাগ করে ইসলামের ছায়াতলে আবার ফিরে আসে। তারা আবার কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে মুসলমান হয়ে যায়। [জুরকানী, খণ্ড-২, পৃ. ১৪৪]

দুই. রাসূলের আদর্শমুগ্ধ খাযরাজ গোত্রে এক হাজার লোকের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা

সহিহ্ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর [রা]-এর বরাতে বর্ণিত হয়েছে, যখন মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সালুলের মৃত্যুর পর তার ছেলে আবদুল্লাহ্ রাসূল [সা]-এর কাছে এসে বললেন, আমার পিতার জন্য আপনার জুব্বাটি দিয়ে দিন, তা দিয়ে তাকে কাফন হিসেবে পরাতে চাই। রাসূলুল্লাহ্ [সা] নিজের জুব্বাটি তাঁকে দিয়ে দিলেন। এরপর হযরত আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতার জানাজা পড়ানোর জন্য রাসূল [সা]-কে অনুরোধ করেন। এতে ঘোরতর আপত্তি তোলেন হযরত উমর [রা]। তিনি বললেন, আপনি মুনাফিকের জানাজা পড়াবেন? অথচ আল্লাহ্ আপনাকে তার জানাজা পড়াতে বারণ করেছেন! রাসূল [সা] জবাব দিলেন, আল্লাহ্ তো আমাকে এখতিয়ার দিয়েছেন। আমি চাইলে পড়াতেও পারি আবার না পড়াতেও পারি। সে আয়াতে তার জন্য ৭০ বার 'ইস্তিগফার' করলেও মাগফিরাত হবে না বলা হয়েছে; আমি এর চেয়েও বেশি ইস্তিগফারও করতে পারি। এখানে সুরায়ে তাওবার এ আয়াতটির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

'আপনি তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন বা না করুন; আপনি ৭০ বার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও তাকে আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন না।' [কুরআন, ৯ : ৮০]

তারপরও রাসূল [সা] তার জানাজা পড়ান। পরে 'তাদের কারো জানাজা আপনি পড়বেন না'- আয়াতটি নাজিল হলে তিনি আর কোনো মুনাফিকের জানাজা পড়েননি।

অন্তর্নিহিত রহস্য

তাকে [মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই] আল্লাহ ক্ষমা করবেন না, এটা জেনেও রাসূল [সা] কেন নিজের জামা দিলেন এবং তার জানাজাই বা কেন পড়ালেন? এর উত্তর হলো- প্রথমত, লোকটির ছেলে, যিনি নিষ্ঠাবান সাহাবি ছিলেন, তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মন রক্ষা ও প্রবোধ দেওয়ার জন্যই তা করা হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ হলো, সহিহ্ বুখারিতে হযরত জাবের [রা] বদরের যুদ্ধে কুরাইশ গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকদের সঙ্গে বন্দি হওয়া রাসূল [সা]-এর চাচা হযরত হামজা [রা]-কে, যিনি সাধারণ লোকদের চেয়ে একটু লম্বা ছিলেন বলে অন্য কারো জামা তার মাপসই ও সুসংগত না হওয়ায় আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের জামাটি তাঁকে পরানো হয়েছিল। রাসূল [সা] বস্তুত এ উপকারের প্রতিদান দিলেন। তৃতীয় কারণটি [প্রকৃতপক্ষে এটিই মূল কারণ] রাসূল [সা] স্বয়ং একটি হাদিসে বলেছেন, আমি কাজটি এ কারণে করেছি যে এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার গোত্রের হাজার হাজার লোক ইসলাম গ্রহণ করবে। পরে দেখা গেছে, রাসূল [সা]-এর এরূপ অসাধারণ উদারতায় মুগ্ধ-অভিভূত হয়ে খাযরাজ গোত্রের এক হাজার লোক ইসলাম গ্রহণ করে। [বোখারি শরিফের টীকা ভাষ্য, খন্ড-২, পৃ. ৬৭৪ ও মা'আরেফুল কোরআন, খন্ড-৪, পৃ.২০৬]

রাসূল [সা]-এর রহমতের ছায়া দোস্ত-দুশমন, কাফের-মুসলিম, শিশু-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ এমনকি হিংস্র জীব জন্তুর উপর পর্যন্ত সমভাবে বিস্তৃত ছিল। এক কথায় দুনিয়ার সব কিছুই তাঁর সে রহমতের ছায়ার অংশীদার ছিল। এক ব্যক্তি রাসূল [সা]-এর নিকট এসে কোন এক দুশমনের প্রতি অভিশাপ করার আবেদন জানালে ক্রোধান্বিত হয়ে ইরশাদ করলেন, 'আমি কারো প্রতি অভিশাপ করার জন্য আগমন করিনি, আমাকে দুনিয়ার সবার প্রতি রহমত স্বরূপ পাঠানো হয়েছে।'

রাসূল [সা] দুনিয়াবাসীর উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করো না। একের দিক থেকে অন্যে মুখ ফিরিয়ে রেখো না আল্লাহর সমস্ত বান্দা পরস্পর ভাই হয়ে যাও।'

www.pathagar.com

অপর এক হাদিসে আছে, 'তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ করো, অন্য সব মানুষের জন্যও তাই পছন্দ করো। তাহলে পরিপূর্ণ মুসলমান হতে পারবে।' তিরমিযি]
রাসূল [সা] যে আমাদের পথ প্রদর্শক এবং পথের আলোক স্বরূপ, সে সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল কুরআনে ঘোষণা করেছেন, 'হে রাসূল, [সা] নিশ্চয়ই তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীস্বরূপ, সুসংবাদাতা স্বরূপ, সতর্ককারী স্বরূপ ও আল্লাহর দিকে আকর্ষণকারী স্বরূপ এবং আলোক বিচ্ছুরণকারী মশাল স্বরূপ।' [সুরা আল আহযাব : ৪৫-৪৬]
উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা [রা]কে রাসূল [সা]-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবহ শব্দে বলেন, 'তার চরিত্র ছিল আল কুরআন।' অর্থাৎ কুরআন মজীদে যে সব উত্তম চরিত্র ও মহান নৈতিকতার উল্লেখ রয়েছে সে সবই তাঁর মাঝে বিদ্যমান ছিল। কুরআনে বর্ণিত চরিত্র অপেক্ষা মহত্তর চরিত্র আর কী হতে পারে? তিনি ছিলেন কুরআনী চরিত্রমালার জীবন্ত প্রতীক।
রাসূল [সা] পরিপক্ব ঈমান বিশিষ্ট মু'মিনের এক মাপকাঠি নির্ণয় করতে গিয়ে বলেন, 'মুমিনের মধ্যে ঈমানে পরিপূর্ণ সেই ব্যক্তি যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে চরিত্রবান।' [তিরমিযি]
তিনি আরও বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি সেই যে চরিত্রে সবার সেরা।' [বুখারি ও মুসলিম]
হযরত আয়েশা [রা] হতে বর্ণিত আছে, একবার কোন এক ব্যক্তি তাঁর নিকট রাসূল [সা]-এর বিস্ময়কর ঘটনা শুনতে চাইলে তিনি বললেন, রাসূল [সা]-এর এমন কোন কাজ আছে কি, যা বিস্ময়ের উদ্রেক করে না? অত:পর বললেন, একরাতে রাসূল [সা] আমার বিছানায় শয়ন করার ক্ষণিক পরেই বললেন, আমাকে যেতে দাও। আমি আল্লাহর ইবাদাত করব। এ কথা বলেই তিনি উঠে অজু করলেন। অত:পর নামাযে দাঁড়ালেন এবং কান্না আরম্ভ করলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর বক্ষদেশ অশ্রুতে ভেসে গেল। অত:পর রুকুতে ও সিজদায় অনুরূপ কাঁদলেন। এভাবে ভোর হয়ে গেল। বিলাল [রা] এসে নামাযের জন্য ডাক দিলেন। আমি বললাম, 'ইয়া রাসূল [সা]! আল্লাহ আপনার অগ্রপশ্চাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দেয়ার পরও আপনি কেন এত কান্নাকাটি করেন?' তিনি ইরশাদ করলেন, 'আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হিসাবে পরিচয় দিব না?'
আমাদের প্রিয় নবী [সা] এতো ইবাদাতে মশগুল থাকার পরও তিনি কিন্তু দুনিয়াদারী ছেড়ে দেননি। তিনি বললেন, 'লা রাহবানিয়াতা ফিল ইসলাম'। অর্থাৎ, 'ইসলামে বৈরাগ্য নেই।'

www.pathagar.com

শেষ কথা

মানবতার নবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর পরিপূর্ণ জীবন ছিল মানুষের জন্য গ্রহণীয় আদর্শ, তিনি একজন মানুষ হয়েই মানবতার আদর্শরূপে প্রেরিত হয়েছেন, তাই আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, 'আল্লাহর সবচাইতে বড় অনুগ্রহ তোমাদের প্রতি এই যে, তোমাদের মধ্য হতেই একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, তিনি তোমাদেরকে আল্লাহর আয়াত শিক্ষা দিয়েছেন, পবিত্র, বিশুদ্ধ, সুসভ্য ও সংস্কৃতিবান করেছেন, আল্লাহর কিতাব তোমাদেরকে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছেন, আর তোমাদেরকে শিখিয়েছেন বিজ্ঞান ও কৌশল, যদিও এর আগে তোমরা ছিলে অজ্ঞ।' [আলে ইমরান]

রাসূল [সা]-এর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি রেখে গেছেন অনুপম আদর্শ। একজন শিশু হিসেবে, এতিম হিসেবে, যুবক হিসেবে, ব্যবসায়ী হিসেবে, সমাজ সংস্কারক হিসেবে, স্বামী হিসবে, ধর্ম প্রচারক, কৃষিজীবী, শ্রমিক, যোদ্ধা, রাষ্ট্রনায়ক, আল্লাহর প্রতি অকৃত্রিম অনুগত বান্দা, পিতা, ভাই, প্রতিবেশী, অমুসলিমদের সাথে সৎভাব, তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় কাজের প্রতি কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি না করার পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদানকারী হিসেবে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়।

রাসূল [সা] পৃথিবীবাসীর জন্য ছিলেন একমাত্র অনুকরণযোগ্য মডেল। রাসূল [সা] শুধুমাত্র আরবের নন, এশিয়ার নন, তিনি সমগ্র বিশ্বের। শুধু মুসলমানের নন, মানুষের নন, তিনি সমগ্র সৃষ্টির। আর এ জন্যই তার আগমনবার্তা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায়। তিনি শুধু আদর্শ মানব নন, আদর্শ পয়গাম্বর নন, তিনি হলেন আদর্শ সৃষ্টি। তিনি শুধ মুসলমানদের পয়গাম্বর নন, রাহমাতুল্লিল আলামিন। অথার্ৎ সমগ্র সৃষ্টির জন্য পরিপূর্ণ কল্যাণ ও আশীর্বাদ। মুসলমানরা যেমন তাকে আপন ভাবতে পারে, হিন্দু-ইহুদী-খ্রিস্টানও ঠিক তেমনি তাকে আপন ভাবতে পারে। সবার জন্যই তিনি পথপ্রদর্শক। আমাদের সবাইকে রাসূলের সেই আদর্শ বাস্তবায়ন করার তৌফিক দিন আমিন। #

www.pathagar.com

প্রিয় নবীর রূপ-লাবণ্য

তৌহিদুর রহমান

মোহাম্মাদ [সা]-এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখি তিনি শিশুকাল থেকেই মহান আল্লাহ্ কর্তৃক পরিচালিত ছিলেন। আমরা এখানে মাত্র দু'একটি ঘটনা তুলে ধরবো।

অধিকাংশ সীরাত গ্রন্থকার বলেছেন, মোহাম্মাদ [সা]-এর বয়স যখন চার অথবা পাঁচ বছর তখন তাঁর 'বুক চেরা'র ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার বর্ণনা সহী মুসলিমে হযরত আনাস [রা] থেকে এভাবে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, হযরত জিব্রাইল [আ] রাসূলুল্লাহ [সা]-এর বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তাঁর কাছে আগমন করেন। এ সময় তিনি অন্য শিশুদের সাথে খেলছিলেন। জিব্রাইল [আ] তাঁকে শুইয়ে বুক চিরে তা থেকে একটা রক্তপিণ্ড বের করে আনলেন এবং বললেন, এটা আপনার মাঝে শয়তানের অংশ। এরপর সেটা তশতরিতে রেখে যমযমের পানি দিয়ে ধুয়ে পুনরায় যথাস্থানে স্থাপন করে দিলেন। অন্য শিশুরা ছুটে গিয়ে হযরত হালিমাকে বললো, মোহাম্মাদকে মেরে ফেলা হয়েছে। এ সময় পরিবারের লোকরা ছুটে গিয়ে দেখলেন, তিনি বিবর্ণ মুখে বসে আছেন। [সহী মুসলিম]।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাবাঘর তখন সংস্কার করা হচ্ছিল। নবী মোহাম্মাদ [সা] সেসময় হযরত আব্বাস [রা]-এর সাথে পাথর বহন করছিলেন। হযরত আব্বাস [রা] তাঁকে বললেন, লুঙ্গি খুলে কাঁধে রেখে তার ওপর পাথর বহন করো তাহলে পাথরের আঘাত থেকে রক্ষা পাবে। লুঙ্গি খোলার সাথে সাথে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। তখন তাঁর দৃষ্টি আকাশের দিকে উঠে যায়। একটু পরে হুস ফিরে এলে বলেন, আমার কাপড়! আমার কাপড়! এরপর তাঁকে কাপড় পরিয়ে দেয়া হয়। এ ঘটনার পর আর কখনো তাঁকে উলঙ্গ হতে দেখা যায়নি। [সহী বোখারি]। এ থেকে বুঝা যায় তিনি শিশুকাল থেকেই মহান আল্লাহ্ কর্তৃক পরিচালিত ছিলেন। তাঁর রূপ-লাবণ্যও ছিল মহান আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত।

www.pathagar.com

মোহাম্মাদ [সা]-এর শারীরিক সৌন্দর্য তথা রূপ-লাবণ্যের কথা বলে শেষ করা যাবে না। জন্মের পর তাঁর চেহারা দেখেই সবাই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। এর ফলে মোহাম্মাদ [সা]-এর নিরাপত্তা বিধান এবং মর্যাদা রক্ষার জন্য তৎকালীন আরব সমাজের অনেকেই এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁর জন্য মানুষ এমন নিবেদিত প্রাণ হয়ে পড়েছিল যার উদাহরণ দুনিয়ার অন্য কোন ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রেই দেখা যায় না। তাঁর বন্ধু ও সংগীরা তাঁকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তাঁর সংগীরা প্রয়োজনে তাঁর জন্যে নিজের জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। মোহাম্মাদ [সা]-এর দেহ মোবারকে একটি আঁচড়ও যেন না লাগে এটা সবাই চাইতেন। এই অসম্ভব রকমের ভালোবাসার অন্যতম কারণ ছিল, তাঁর রূপ-লাবণ্য ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারা। তাছাড়া যেসব গুণের প্রতি মানুষের মন উজাড় করে দেয়ার ইচ্ছা তৈরি হয়, ঐ ধরনের গুণের সবগুলোর সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। তাঁর চেহরার উজ্জ্বল্য এতো বেশি ছিল যা সে সময় অন্য কারো মধ্যেই ছিল না।

মোহাম্মাদ [সা]-এর জন্মের সময়ই তাঁর চেহারার রূপ-লাবণ্যে চতুর্দিক আলোকিত হয়ে উঠেছিল। এ সম্পর্কে ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেন, রাসূল [সা]-এর মা আমিনা বলেছেন, যখন মোহাম্মাদ জন্মগ্রহণ করে তখন আমার দেহ থেকে একটি আলো বের হয়, সেই আলোয় শাম দেশের মহল আলোকিত হয়ে যায়। ইমাম আহমদ হযরত এরবায ইবনে ছারিয়া [রা]-এর বর্ণনা থেকেও প্রায় একই ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়। [তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৩]। ইবনে আসাকের জুলহামা ইবনে আরফাতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তখন মক্কায় এলাম। দুর্ভিক্ষের কারণে মানুষ চরমভাবে বিপন্ন ছিল। কুরাইশ বংশের লোকরা আবু তালেবকে বলল, মক্কা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছে। আমাদের সন্তানরা দুর্ভিক্ষ পীড়িত। চলুন বৃষ্টির জন্য দোয়া করুন। আবু তালেব মোহাম্মাদকে [সা] নিয়ে বের হলেন। তাঁকে অপূর্ব সুন্দর মানে মেঘে ঢাকা সূর্য মনে হচ্ছিল। অন্যান্য শিশুদের মধ্যে সে ছিল ব্যতিক্রম। আবু তালেব মোহাম্মাদের হাত ধরে তাঁকে কাবাঘরের দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে বসিয়ে দিলেন। মোহাম্মাদ আবু তালেবের হাত ধরে বসেছিলেন। তখন আকাশে এক টুকরো মেঘও ছিল না, কিন্তু মুহূর্তে দেখা গেল চারদিক থেকে রাজ্যের মেঘ এসে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। এতে সমগ্র মক্কা পানিতে সয়লাব হয়ে গেল এবং দু'একদিনের মধ্যেই শহর প্রান্তর সজীব হয়ে উঠল। পরবর্তীতে আবু তালেব এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, তিনি সুদর্শন, তাঁর চেহারার বরকতে বৃষ্টি প্রত্যাশা করা হয়। তিনি এতিমদের আশ্রয় দেন ও বিধবাদের রক্ষা করেন। [শেখ আবদুল্লাহর মুখতাসারুল সীরাত]।

www.pathagar.com

হযরত আনাস ইবনে মালেক [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী মোহাম্মাদ [সা]-এর হাতের তালু ছিল চওড়া, রং ছিল চমকপ্রদ, একেবারে সাদাও ছিল না আবার একেবারে গমের রঙের মতোও ছিল না। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তাঁর মাথার এবং দাড়ির বিশটির মতো চুলও সাদা হয়নি। [সহী বোখারী]। শুধু কানের নিচের কয়েকটি ও মাথার ওপরে কয়েকটি চুল সাদা হয়েছিল। [সহী মুসলিম]।

এ সম্পর্কে হযরত আবু জোহায়ফা [রা] থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, আমি রাসূল [সা]-এর নিচের ঠোঁট সংলগ্ন দাড়ি সাদা দেখেছি। [সহী মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৯]।

নবী মোহাম্মাদ [সা] হিজরতের সময় উম্মে মাবাদ কোযাইয়ার তাঁবুতে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর মদীনার দিকে চলে যান। তাঁর চলে যাবার পর উম্মে মাবাদ স্বামীর কাছে নবী [সা]-এর অবয়বের যে বর্ণনা তুলে ধরেন তা ছিল অসাধারণ। উম্মে মাবাদ বলেন, তাঁর চেহারা মোবারক ছিল চমকদীপ্ত ও উজ্জ্বল, শরীরের গঠন অত্যন্ত সুন্দর, একদম সোজাও নয় আবার সামনে ঝুঁকে পড়াও নয়। মাঝারি উচ্চাতাসম্পন্ন, বেঁটেও নয় লম্বাও নয়। অসাধারণ সৌন্দর্যের পাশাপাশি দৃষ্টিনন্দন দেহ, সুরমামাখা হালকা রাঙা চোখ, লম্বা পাপড়ী, সাদা কালো চোখের মণি, সুরমামাখা সূক্ষ্ম চোখের পলক, উপরের ভ্রূ পরস্পর সংযুক্ত। কণ্ঠস্বর মোলায়েম ও মধুময়। বক্তব্যের প্রকাশভঙ্গি স্পষ্ট। কথা খুব সংক্ষিপ্তও নয় আবার দীর্ঘায়িতও নয়। কথা বলার সময় মনে হয় যেন মুক্তা ঝরছে, চুপচাপ থাকার সময় ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ ও কথা বলার সময় আকর্ষণীয় চেহারা। দূর থেকে দেখলে মনে হয় সবার চেয়ে উজ্জ্বল ও সৌন্দর্যপূর্ণ। কাছ থেকে দেখলে বুঝা যায় সুদর্শন মিষ্টি-মধুর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারা। মাথা ভর্তি চমকানো কালো চুল, ঘাড় কিছুটা লম্বা। তাঁর সংগীরা যখন তাঁকে ঘিরে কথা বলেন, তখন তিনি সে কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনেন। তিনি কোন নির্দেশ দিলে সংগীরা ছুটে গিয়ে তাঁর নির্দেশ পালন করেন। তাঁর সাথীরা খুবই অনুগত এবং তাঁর প্রতি গভীর সম্মান শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করেন। সাথীরা কেউ উচ্ছৃঙ্খল ও দুর্বিনীত নন, বাহুল্য কথাও বলেন না তাঁরা। [যাদুল মাআদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৪]।

রাসূল [সা]-এর দৈহিক সৌন্দর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত আলী [রা] বলেন, তিনি খুব বেশি লম্বা ছিলেন না, আবার বেঁটেও ছিলেন না, ছিলেন মাঝারি আকৃতির। তাঁর চুল ছিল একেবারে খাড়া নয়, সামান্য কোঁকড়ানো অর্থাৎ কোঁকড়ানো আর খাড়া চুলের মাঝামাঝি ধরনের। তাঁর চোয়াল একেবারে পেশীবহুল ছিল না আবার শুকনোও ছিল না; হালকা ধরনের ছিল। তাঁর কপাল ছিল প্রশস্ত, গায়ের রং ছিল গোলাপী ও ফর্সা রঙের মিশ্রণ। চোখ ছিল সুরমারাঙা লালচে, ঘন পল্লববিশিষ্ট পাপড়ি। নাভি থেকে বুকের ওপর পর্যন্ত হালকা চুলের রেখা, দেহের অন্য অংশ

www.pathagar.com

অদৃশ্য লোমযুক্ত ছিল, হাত- পা ছিল বেশ পেশীসম্পন্ন। চলার সময় স্পন্দিত ভঙ্গিতে পা ফেলতেন। তাঁকে হেঁটে যেতে দেখলে মনে হতো তিনি যেন ওপর থেকে নীচের দিকে নামছেন। কোন দিকে তাকালে পুরোপুরিভাবে তাকাতেন। উভয় কাঁধের মাঝখানে তাঁর মোহরে নবুয়ত অঙ্কিত ছিল। তিনি ছিলেন সকল নবীর শেষ নবী। তিনি ছিলেন সর্বাধিক দানশীল, সর্বাধিক সাহসী, সর্বাধিক সত্যবাদী, সর্বাধিক অঙ্গীকার পালনকারী, সর্বাধিক কোমলপ্রাণ ও সর্বাধিক আভিজাত্যসম্পন্ন। হঠাৎ করে কেউ তাঁকে দেখলে ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়তেন। পরিচিত বা অপরিচিত কেউ তাঁর সান্নিধ্যে গেলে তাঁর মধুর ভালোবাসায় আকুল হয়ে যেতেন। তাঁর গুণ বৈশিষ্ট্য দেখে বর্ণনাকারী বলতে বাধ্য হতেন, তাঁর মতো এমন কাউকে আমি আগে কখনো দেখিনি। [সীরাতে ইবনে হিশাম, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০১ এবং শরহে তিরমিযী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৩]।

অন্য এক বর্ণনায় হযরত আলী [রা] বলেছেন, তাঁর মাথা ছিল একটু বড়ো, জোড়ার হাড়গুলো ছিল ভারি। বুকের মাঝখানে লোমের হালকা রেখা আবরণ ছিল। তিনি চলার সময় এমনভাবে হাঁটতেন, দেখে মনে হতো যেন উঁচু থেকে নীচুতে অবতরণ করছেন। [সীরাতে ইবনে হিশাম, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০১ এবং শরহে তিরমিযী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৩]।

রাসূল [সা] সম্পর্কে হযরত জাবের ইবনে সামুরা [রা] বলেন, মোহাম্মাদ [সা]-এর পেশী ছিল চওড়া, চোখ ছিল হালকা লালচে, পায়ের গোড়ালি ছিল সরু ও মসৃণ। [সহী মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৮]।

এ সম্পর্কে হযরত আবু তোফায়ল [রা] বলেন, তিনি ছিলেন ফর্সা রঙের। তাঁর চেহারা ছিল মোলায়েম ও কোমল। তাঁর দেহের উচ্চতা ছিল মাঝামাঝি। অনেক লম্বাও নয় আবার বেঁটেও নয়। [সহী মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৮]।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বোসর [রা] বর্ণনা করেন, পূর্ণ বয়সে নবী করীম [সা]-এর নিচের ঠোঁট সন্নিহিত দাড়ির কয়েকটি পেঁকে সাদা হয়ে গিয়েছিল। [সহী বোখারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০২ ও সহী মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৯]।

মোহাম্মাদ [সা]-এর বর্ণনা হযরত বারা [রা] এভাবে দিয়েছেন। তিনি বলেন, নবী মোহাম্মাদ [সা] প্রথম দিকে আহলে কিতাবদের মতো চুল আঁচড়াতেন। তখন তিনি চুল আঁচড়ালে সিঁথি করতেন না, কিন্তু পরবর্তীতে সিঁথি করতেন। [সহী বোখারী ও সহী মুসলিম]।

হযরত বারা [রা] আরো বলেন, মোহাম্মাদ [সা] ছিলেন মাঝারি উচ্চতাসম্পন্ন। উভয় কাঁধের মাঝখানে দূরত্ব ছিল একটু বেশি। মাথার চুল ছিল উভয় কানের লতি পর্যন্ত লম্বা। আমি যখন তাঁকে দেখেছি তখন তিনি লাল পোশাক পরিহিত

www.pathagar.com

অবস্থায় ছিলেন। আমি জীবনে কখনো তাঁর চেয়ে অধিক সুন্দর কোনো মানুষ দেখিনি। [সহী বোখারী ও সহী মুসলিম]।

হযরত আযেব [রা] বলেন, তাঁর চেহারা ছিল সবচেয়ে সুন্দর এবং তাঁর চরিত্র বৈশিষ্ট্য ছিল সকলের চেয়ে উৎকৃষ্ট। [সহী মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৮]।

তাঁর সম্পর্কে রবী বিনতে মোয়াওয়েয [রা] বলেন, যদি তোমরা রাসূল [সা]কে দেখতে, তবে মনে হতো যেন উদীয়মান সূর্য দেখছো। [মেশকাত শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫১৭]।

হযরত আনাস [রা] বলেন, নবী মোহাম্মাদ [সা]-এর উভয় কাঁধের মাঝামাঝি স্থানে মোহরে নবুয়ত অঙ্কিত ছিল। এই মোহরে নবুয়তের রং ছিল তাঁর দেহের রঙের মতো এবং তা ছিল কবুতরের ডিমের মতো দেখতে। বাম কাঁধের নরম হাড়ের পাশে এই মোহর অঙ্কিত ছিল। হযরত আনাস [রা] আরো বলেন, রাসূল [সা]-এর ঘাম ছিল মুক্তোর মতো। [সহী মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬০]। হযরত উম্মে সোলায়ম [রা] বলেন, এ ঘামই ছিল সবচেয়ে উত্তম খোশবু। [সহী মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৬]।

হযরত জাবের [রা] বর্ণনা করেন, মোহাম্মাদ [সা] কোন পথ দিয়ে হেঁটে যাবার পরে অন্য কেউ সে পথ দিয়ে গেলে বুঝতে পারতেন যে, এ পথ দিয়ে নবী মোহাম্মাদ [সা] আগেই গমন করেছেন। [মেশকাত শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭]।

হযরত বারা ইবনে আযেব [রা]-এর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, মোহাম্মাদ [সা]-এর চেহারা মোবারক কি তলোয়ারের মতো ছিল? তিনি বললেন, না, বরং তাঁর চেহারা ছিল চাঁদের মতো। অন্য বর্ণনায় আছে, নবী করীম [সা]-এর চেহারা ছিল গোলাকার। [সহী বোখারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০২]।

জাবের ইবনে ছামুরা [রা] বলেন, আমি রাসূল [সা]কে এক চাঁদনী রাতে দেখেছিলাম। তখন তাঁর পরনে ছিল লাল কাপড়। আমি একবার রাসূল [সা]-এর দিকে এবং আর একবার চাঁদের দিকে তাকাচ্ছিলাম। আমি এটা বারবার করছিলাম। শেষে আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম, তিনি চাঁদের চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর। [শামায়েলে তিরমিযি]।

শামায়েলে তিরমিযিতে এসেছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম [সা]-এর সামনের দুটি দাঁত ছিল সামান্য ফাঁকা। কথা বলার সময় উভয় দাঁতের মাঝখান দিয়ে আলোর বিচ্ছুরণ বেরিয়ে আসতো। [শামায়েলে তিরমিযি]। রাসূল [সা]-এর ঘাড় ছিল রৌপ্যে নির্মিত পাত্রের মতো পরিচ্ছন্ন, চোখের পলক ছিল দীর্ঘ, দাড়ি ছিল ঘন, কপাল ছিল প্রশস্ত, ভ্রূ ছিল যুক্ত, নাসিকা উন্নত, নাভি থেকে বুক পর্যন্ত হালকা লোমের রেখা ছিল, বাহুতেও কিছু লোম ছিল। পেট ও বুক ছিল সমান, বুক ছিল চওড়া,

www.pathagar.com

হাতের তালু ছিল প্রশস্ত। পথ চলার সময় তিনি কিছুটা সামনে ঝুঁকে মধ্যম গতিতে হাঁটতেন। [খোলাসাতুস সিয়ার, পৃষ্ঠা ১৯]।

আবু হোরায়রা [রা] বলেন, রাসূল [সা]-এর চেয়ে অধিক সৌন্দর্যপূর্ণ মানুষ আমি আর দেখিনি। দেখলে মনে হতো যেন তাঁর চেহারায় সূর্য ঝিকমিক করছে। আমি তাঁর চেয়ে অধিক দ্রুতগতিসম্পন্নও কাউকে দেখিনি। তিনি হাঁটতে শুরু করলে পথ যেন তাঁর পায়ের আকর্ষণে ছোট হয়ে আসতো। তাঁর সাথে হাঁটতে গিয়ে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়তাম, কিন্তু তিনি কখনো ক্লান্ত হতেন না। [শরহে জামে তিরমিযি, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৬]।

মোহাম্মাদ [সা] সম্পর্কে হযরত কা'ব ইবনে মালেক [রা] বলেন, রাসূল [সা] যখন আনন্দিত হতেন, তখন তাঁর চেহারা মোবারক উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। দেখে মনে হতো যেন এক ফালি চাঁদ। [সহী বোখারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০২]।

হযরত আয়েশা [রা] থেকে বর্ণিত, একবার তিনি হযরত আয়েশা [রা]-এর কাছে অবস্থান করছিলেন। কোন কারণে তিনি ঘর্মাক্ত হয়ে ওঠেছিলেন। ঘর্মাক্ত হয়ে ওঠার পর তাঁর চেহারা আরো উজ্জ্বল সুন্দর দেখাচ্ছিল। এ অবস্থা দেখে হযরত আয়েশা [রা] আবু কবীর হোযালীর নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন, যার অর্থ হচ্ছে,

'তাঁর চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম
চমকানো মেঘ যেন চমকায় অবিরাম।'
[রাহমাতুল্লিল আলামীন, পৃষ্ঠা ১৭২]।

প্রায়ই হযরত আবু বকর সিদ্দিক [রা] তাঁকে দেখে একটি কবিতা আবৃত্তি করতেন। যা ছিল এমন,

'ভালোর দিকে ডাকেন তিনি, অটুট থাকেন অঙ্গীকারে
পূর্ণিমার চাঁদ যেন লুকোচুরি খেলতে থাকে অন্ধকারে।'
[খোলাসাতুস সিয়ার, পৃষ্ঠা ২০]।

মোহাম্মাদ [সা] সম্পর্কে যোহায়র [রা]-এর রচিত একটি কবিতার কিছু অংশ আবৃত্তি করতেন হযরত ওমর [রা]। সেটা হলো,

'মানুষ যদি না হতেন আল্লাহর এ প্রিয়জন
চতুর্দশীর রাত তিনি করতেন তবে রওশন।' [প্রাগুক্ত]।

হযরত জাবের ইবনে সামুরা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মোহাম্মাদ [সা] বেশিরভাগ সময় মৃদু হাসতেন। এ সময় তাঁর চোখ দেখে মনে হতো যেন সুরমা লাগানো আছে, অথচ তখন তাঁর চোখে সুরমা লাগানো ছিল না। তিনি যখন ক্রোধান্বিত হতেন তখন তাঁর চেহারা মোবারক লাল হয়ে যেতো, মনে হতো

www.pathagar.com

যেন তাঁর কপালে আংগুরের রস নিংড়ে দেয়া হয়েছে। [শরহে জামে তিরমিযি, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৬ ও মেশকাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২]।

হযরত জাবের ইবনে সামুরা [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন কিশোর ছিলাম সে সময়ের ঘটনা। আমার কিশোর বয়সের সময় নবী করীম [সা] আমার কপালে হাত রেখেছিলেন, এতে আমি এমন শীতলভাব ও সুবাস অনুভব করেছিলাম যে, তখন আমার মনে হয়েছিল, তিনি তাঁর পবিত্র হাত আতর বিক্রেতার আতরদানী থেকে সবেমাত্র তুলে এনেছেন। [সহী মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৬]।

এ সম্পর্কে হযরত আনাস [রা] বলেন, আমি এমন কোন রেশম দেখিনি, যা রাসূল [সা]-এর হাতের তালুর চেয়ে অধিক নরম। আবার এমন কোন মেশক আম্বর শুঁকিনি, যা নবী করীম [সা]-এর দেহের সুগন্ধির চেয়ে অধিক সুবাসিত ছিল। [সহী বোখারী]।

অপর এক বর্ণনায় হযরত আবু জোহায়ফা [রা] বলেন, আমি রাসূল [সা]-এর হাত আমার চেহারার ওপর রেখেছিলাম। সে সময় আমি অনুভব করলাম, সেই হাত বরফের চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা ও মেশকের চেয়ে বেশি সুগন্ধিযুক্ত। [সহী বোখারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০২]।

হযরত খাদিজা [রা] থেকে বর্ণিত। আমানত রক্ষা ও ওয়াদা পালনে তিনি ছিলেন অগ্রণী। এ জন্য সেই সময়ের জাহেল লোকরা পর্যন্ত তাঁর নাম রেখেছিলেন আল আমীন। তিনি বলেন, মোহাম্মাদ [সা] ছিলেন, দু:খী, অসহায় ও দরিদ্র মানুষের বন্ধু, তাদের সাহায্যে তিনি হাত বাড়িয়ে দিতেন। বিপদগ্রস্তদের বোঝা তিনি বহন করতেন। সাধ্যানুযায়ী মেহমানদারী করতেন এবং সর্বোপরি সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার কাজে প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। [সহী বোখরী]।

রাসূল [সা] নিজের দায়িত্বপূর্ণ কাজ, উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও অত্যন্ত দরদী স্বভাবের জন্য সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে আছেন। তিনি হলেন দুনিয়ার সকল মানুষের চেয়ে অধিক মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন, সবার চেয়ে অধিক ভালো চরিত্রের অধিকারী, দায়িত্বশীল ও আমানতদার প্রতিবেশী, অধিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, পরিপূর্ণ সত্যবাদী, সকলের প্রতি কোমলপ্রাণ, সর্বাধিক পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র মনের অধিকারী। ভালো আচরণ, ভালো কাজ ও ভালো কথায় তাঁর সমকক্ষ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। সুন্দর স্বভাবের পাশাপাশি সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সুদর্শনও ছিলেন তিনি। #

www.pathagar.com

রাসূলের [সা]-এর একটি শিক্ষণীয় দিক

হেলাল আনওয়ার

আখেরি যামানার পয়গাম্বার আহম্মদ তথা মুহাম্মাদ [সা] জাহেলিয়াতের কণ্টকাকীর্ণ নির্দয়-নিষ্ঠুর সমাজে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ জাতি, গোত্র আর সমাজের প্রবল অসহিষ্ণুতার কারণে তাঁকে হাজারো চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হয়। শিরক এবং কুফরির মতো ব্যাধি থেকে দেশ, সমাজ আর জাতিকে মুক্ত করার জন্যে তিনি অবর্ণনীয় কষ্টকে অকাতরে বরণ করেন। আজো যা ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। চরম সংকটাপন্ন অবস্থায়ও তিনি ধীর ও শান্তভাবে দ্বীনের সুমহান বাণী প্রচার করেন।

স্থান, কাল, আর অবস্থা বুঝে তিনি দ্বীন প্রচারের কাজ চালাতে থাকেন। সমগ্র মানব জাতির ইহকালীন শান্তি আর পরকালীন মুক্তির সন্ধান দেবার জন্যে তাঁর গুরুদায়িত্ব তিনি পরিপূর্ণভাবে পালন করেন। নিজের কষ্ট আর যন্ত্রণাকে গৌণ বিষয় বলে মনে করতেন। তবু তিনি দ্বীনের নসিহত অব্যাহত রাখেন। এমনই একটি নসিহত বা উপদেশমূলক ভাষণ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করবো।

ভাষণের পটভূমি

হযরত ঈসা [আ]-এর আগমনের প্রায় ছয়শো বছর পর সমগ্র মানব জাতি অন্ধকারাচ্ছন্ন ও সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে। বেদ্বীন আর পাপ-পংকিলতায় মানুষ ভেসে যেতে থাকে। এক আল্লাহকে ভুলে মানুষ “মানুষকে” দেবতা, ঈশ্বর, ভগবান এমনকি কেউ কেউ নিজ আত্মাকে আল্লাহ বানিয়ে ফেলেছিল। চন্দ্র, সূর্য, গাছ-পালা, পাহাড়, নদী এমনকি চেতন-অচেতন পদার্থেরও পূজা করা শুরু করেছিল। ঐতিহাসিকগণ বলেন, সেই সময় অবস্থা এতই নাজুক ছিল যে আল্লাহর নাম করার মতো কোনো লোক বিদ্যমান ছিল না। ধর্মীয়, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এমনকি সার্বিক অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল।

www.pathagar.com

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যে মহান রাব্বুল আলামীন মহানবী [সা]কে দুনিয়াতে পাঠান। তিনি যখন তাওহীদের বাণী প্রচার করা শুরু করেন তখন মক্কার কাফির আর মোশরেকেরা তার বিরুদ্ধে নানা রকম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এমনকি তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করতেও তারা দ্বিধা করেনি। এসব নানামুখী ষড়যন্ত্রের মাঝে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁকে হিজরত করার নির্দেশ প্রদান করেন।

নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরের সাতাশে সফর তিনি আপন জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করেন। সাথে আছেন একান্ত সহচর হযরত আবু বকর [রা]। পথিমধ্যে সাওর পর্বতের গুহায় তিনি তিনদিন আত্মগোপন করত: অজানা-অচেনা বিপদ-সংকুল লোহিত সাগরের কিনার ধরে দীর্ঘপথ অতিক্রম করেন। আটই রবিউল আওয়াল সোমবার বেলা দুপুর। তিনি মদিনার কুবা পল্লীতে এসে পৌঁছান। এখানে বনী সালেম বিন আমের বিন আওফ গোত্রে তিনি চৌদ্দ রাত অবস্থান করেন। সংগত কারণে মুহাজিরদের প্রয়োজনে তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। ইতিহাস তাকে কুবা মসজিদ বলে বর্ণনা করেছে। এখানে প্রথম জুময়ার নামাজে তিনি ইমামতি করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদাণ করেন। উক্ত ভাষণ সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে পাঠকদের জন্য তা তুলে ধরা হলো।

ভাষণ

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যে। আমি তার গুণগান করছি। তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি, এবং ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তাঁর নিকট হেদায়েত চাচ্ছি। তাঁর প্রতি ঈমান আনছি। তাঁকে অস্বীকার করছি না। যে তাঁকে অস্বীকার করে আমি তার প্রতি শত্রুতা পোষণ করছি।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি এক ও তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ [সা] তার বান্দা ও রাসূল। যাকে আল্লাহ হেদায়াত, সত্য দ্বীন, নূর ও নসীহত দিয়ে প্রেরণ করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, সে সঠিক পথ লাভ করবে। যে ব্যক্তি তাদের উভয়ের নাফরমানী করবে সে অবশ্যই পথভ্রষ্ট হবে, সীমালংঘন করবে এবং সঠিক পথ থেকে বহু দূরে ছিটকে পড়বে।

আর আমি তোমাদেরকে তাকওয়া অর্জনের জন্যে উপদেশ দিচ্ছি। কেননা, একজন মুসলমান অপর মুসলমানকে প্রদান করার মতো সর্বোত্তম উপদেশ হলো তাকে পরকালীন জীবনের প্রতি অনুপ্রাণিত করা এবং তাকওয়া অবলম্বনের আদেশ করা।

www.pathagar.com

অতএব, তোমরা যেসব বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন কর, সেসব বিষয়ে আল্লাহ স্বয়ং তোমাদেরকে তার নিজের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। [স্মরণ রেখ] এর চেয়ে উত্তম উপদেশ আর যিকির নেই। আর সেটাই তাকওয়া যা কোন ব্যক্তি ভীতি ও সন্ত্রস্ত অবস্থায় আমল করে। পরকালীন জীবনে মুক্তির ব্যাপারে তোমরা যা কিছু অন্বেষণ করছো সে ব্যাপারে এটাই হবে সঠিক ও নির্ভুল সহায়ক।

অনন্তর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার মধ্যকার যাবতীয় প্রকাশ্য এবং গোপন বিষয়সমূহ সংশোধন করে নেবে আর তাদ্বারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ব্যতিত অন্য কোন উদ্দেশ্য হাসিলের ইচ্ছা করবে না, এমন হলে তা হবে তার পার্থিব জীবনের জন্যে যিকির এবং পরকালীন জীবনের জন্যে সঞ্চিত সম্পদ স্বরূপ। যখন মানুষ মুখাপেক্ষী হবে সেই নেক আমলের প্রতি যা সে পরকালীন নাজাতের জন্যে প্রেরণ করেছিল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির অবস্থা এর বিপরীত হবে, সে নিজ এবং নিজ কর্মের মাঝে দূরত্ব কামনা ও সৃষ্টি করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে তার নিজ সত্তা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। বস্তুত মহান আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি অতিশয় দয়াবান।

আর যে ব্যক্তি সদা সত্য কথা বলে এবং স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে সে তাতে কোনরূপ ব্যতিক্রম করে না। যেমন আল্লাহ বলেন, আমার নিকট কোন কথারই পরিবর্তন হয় না। আর আমি বান্দাদের প্রতি অবিচারকারী নই। আর তোমরা গোপন ও প্রকাশ্যে তাকে ভয় কর। কেননা, এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার সকল পাপ সমূহ মুছে দেন এবং তাকে অনেক বড় প্রতিদান দান করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে সে বড় ধরনের সাফল্য লাভ করে।

নিশ্চয় খোদাভীতি মুত্তাকিকে প্রভুর অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা করে। তার শাস্তি থেকে বাঁচায় এবং ক্রোধ থেকে রক্ষা করে। নিশ্চয় আল্লাহ-ভীতি ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল করে। তার প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করে এবং তার পদমর্যাদা উন্নীত হয়। তোমরা তোমাদের প্রাপ্য অংশ গ্রহণ কর। আর তোমরা আল্লাহর বিধান পালনে ত্রুটি করো না। কেননা, আল্লাহ তোমাদেরকে তার কিতাব শিক্ষা দিয়েছেন এবং তোমাদের জন্যে তার পথ দেখিয়েছেন, যেন তিনি জানতে পারেন কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী।

সুতরং তোমরা অনুগ্রহ কর, যেভাবে আল্লাহ তোমদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আর তোমরা তার শত্রুদের সাথে শত্রুতা পোষণ কর এবং তার সাথে যথাযথ জিহাদ কর। কারণ তিনি তোমাদের নির্বাচিত করেছেন এবং মুসলমান নামে নামকরণ করেছেন। যাতে করে যে ধ্বক্ষংস হবে সে যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকার

www.pathagar.com

পর সম্পূর্ণভাবে ধ্বক্ষংস হয়ে যায়। আর যে জীবিত থাকবে সে যেন সুসম্পর্ক ও যথাযথ প্রমাণ বিদ্যমান থাকার পর জীবিত থাকে।
মহান আল্লাহর শক্তি ছাড়া কোন শক্তি নেই। সুতরাং তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ কর এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্যে নেক আমল কর। কেননা যে ব্যক্তি নিজের ও আল্লাহর মাঝে সকল বিষয়াবলি সংশোধন করে নেয়, তখন তার ও অন্যদের মধ্যকার সম্পর্কের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট হবেন। এটা এ জন্যে যে, নিশ্চয় আল্লাহ সকল মানুষের ওপর ফয়সালা কার্যকর করেন। পক্ষান্তরে মানুষরা তার উপর কোন ফায়সালা দিতে পারে না। আর তিনি মানুষের ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতাবান, পক্ষান্তরে মানুষ আল্লাহর ওপর কোন রূপ ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ মহান, আল্লাহর শক্তি ব্যতিত অন্য কোন শক্তি নেই, তিনি উচ্চ ও মহান।
[পুনশ্চ: এই হাদিসটি/ভাষণটি বর্ণনা করেন আবুল ফিদা ইমামুদ্দীন ইসমাইল ইবনে কাসীর আল বসরী আল কুরাইশী আশ শাফেয়ী]

উক্ত ভাষণের মৌলিক দিক

মহনবী [সা]-এর দেয়া ভাষণটিতে ইসলামের কিছু মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ দিক ফুটে উঠেছে। সেগুলো হলো :

কিয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত

যেহেতু একজন মানুষের সমগ্র জীবনের কর্মফল কিয়ামতের দিন দেয়া হবে। সেদিন যার ভালো কাজের পরিমাণ বেশি হবে, সে থাকবে আল্লাহর সন্তুষ্টির মাঝে। মূলত মুসলমানের জীবনের একমাত্র প্রত্যাশা পরকালীন নাজাত। তাই মহানবী [সা] সকলকে উৎসাহিত করেছেন, পরকালের সফলতার প্রতি যাতে সে প্রকৃত সাফল্য লাভ করতে পারে।

আনুগত্যের জন্য নির্দেশ

যেহেতু কুরআন এবং হাদীস মানুষের জীবনের জন্যে সঠিক পথ নির্দেশক। তাই আল্লাহ এবং তার রাসূলের আনুগত্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, 'তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলকে আনুগত্য কর'। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে সৎ পথ প্রাপ্ত হবে।

অবাধ্যাচরণ হতে নিষেধ

রাসূল [সা]-এর ভাষণে মানুষকে অবাধ্য আচরণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। মূলত অবাধ্যতা এমন একটি জিনিস যা একটি সুন্দর সমাজকে কিংবা দেশকে তছনছ করে দেয়। এজন্যে তিনি তার ভাষণে অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে অবাধ্য আচরণ করবে সে চরম পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হবে।

www.pathagar.com

তাকওয়ার প্রতি আহবান

যেহেতু খোদাভীতি সকল পাপ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে সেহেতু মহান রাসূল [সা] মানুষকে খোদাভীতি অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন এবং সওয়াব বৃদ্ধি করে দেবেন। তাই রাসূল [সা]-তার উম্মতকে তাকওয়া অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করে বলেন, এটি হল মুসলমানদের জন্যে সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোত্তম উপদেশ ও নসিহত।

তাকওয়ার উপকারিতা

শুধু তাকওয়া অর্জনের জন্যেই তার ভাষণে বলেননি। বরং তাকওয়ার উপকারিতা নিয়েও তিনি উল্লেখ করেছেন। মহান রাব্বুল আলামীন বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে সে অবশ্যই সফলতা অর্জন করবে।

তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে একজন মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতে যে সফলতা লাভ করবে মুসলিম পন্ডিতগণ যে সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করে বলেন:

ক. তাকওয়া মহান আল্লাহর ক্রোধ থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করে।

খ. তাকওয়া অর্জন বান্দার মুখমন্ডলকে উজ্জ্বল করে।

গ. মহান প্রভুর সন্তুষ্টি এনে দেয়।

ঘ. দুনিয়া ও আখেরাতে মুত্তাকির সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

ঙ. এটা মন্দ সমূহ দূরীকরণের অন্যতম মাধ্যম।

চ. তাকওয়া একজন মানুষকে নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে হেফাযত করে।

ছ. তাকওয়া উভয় জগতে সফলতা অর্জনের মহান সোপান।

জ. এটা দুনিয়াতে রিজিক বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে। এ জন্যে মানবতার মহান বন্ধু হযরত মুহাম্মাদ [সা]-তার ভাষণে তাকওয়া অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

উত্তম সম্পর্ক তৈরির নির্দেশ

মানুষকে ভালো হওয়ার কৌশল সম্পর্কে তিনি বলেন, বান্দা ও আল্লাহর মাঝে সম্পর্ক তৈরি করার জন্যে আল্লাহর সাথে বান্দার গোপন এবং প্রকাশ্য সকল বিষয়ে সম্পর্ক স্থাপন অতীব জরুরি।

সত্য বলা ও ওয়াদা পালন

রাসূল [সা] বলেন, মিথ্যা সকল পাপের মা। সুতরাং সদা সত্য বলার প্রতি তিনি নির্দেশ করেন। কেননা সত্য মানুষকে বাঁচতে শেখায় আর মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে। আল্লাহ বলেন, যারা পরস্পর সদা সত্য কথা বলে কাল কেয়ামতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

www.pathagar.com

সাথে সাথে ওয়াদা পালনের বিষয়েও তিনি তার উম্মতকে নির্দেশ দেন। চাই সে অঙ্গীকার তার মাঝে কিংবা আল্লাহর মাঝে বা অন্য কারোর মাঝে হোক।

পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ গঠন

মুসলমানদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির প্রতি তিনি গুরুত্বারোপ করেন। কেননা, দেশ ও জাতি এর উপর নির্ভরশীল। যদি পরস্পর ভালো সম্পর্ক না থাকে তাহলে উন্নতি লাভ করা অসম্ভব হয়ে যায়।এ জন্যে মানবতার মহান শিক্ষক বলেন, একজন মুসলমান আর একজন মুসলমানের ভাই।

এখানে স্বজাতির প্রতি সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। কেননা, আল্লাহ বলেন, কোনো মুমিনের উচিত হবে না কোন মুমিনের পরিবর্তে অন্য কোন কাফিরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা। এ জন্যে একটি সুখী ও শান্তিময় সমাজ বা রাষ্ট্র গঠনের পূর্ব শর্ত হলো পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।

আল কুরআনকে ধারণ করে চলা

এখানে কিতাব দ্বারা পবিত্র আল কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। এই কিতাব মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর পথের সন্ধান দিয়ে থাকে। গোটা মানবজাতির উপদেশ সম্বলিত এই মহামূল্যবান কিতাব। দেশ, জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র এমনকি সকল ক্ষেত্রে এই কিতাব মানুষের কল্যাণ সাধন করে থাকে। এ জন্যে মহানবী [সা] স্বীয় ভাষণে এই কিতাবকে আঁকড়ে ধরার প্রতি নির্দেশ দেন।

ইহসানের প্রতি নির্দেশ

মহানবী [সা]-তার ভাষণে ইহসানের প্রতি তার উম্মতকে নির্দেশ দেন। তিনি তার সাহাবীদের নির্দেশ দিয়ে বলেন, হে মুসলিমগণ, আল্লাহ তোমাদের প্রতি যেভাবে করুণা করেছেন, সেভাবে তোমাদেরও মানুষের প্রতি করুণা করা প্রয়োজন।

জিহাদের প্রতি নির্দেশ

রাসূল [সা] জিহাদের প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। নিজ ধর্মকে হেফাজত করার জন্যে, ইসলামকে ধক্ষংসের চক্রান্ত রুখে দেবার মানসে যুদ্ধ করা ফরজ। পবিত্র আল কুরআনে মহান রাব্বুল আলামীন অসংখ্যবার মানুষকে জিহাদের কথা বলেছেন। এমনকি আল্লাহ বলেন, তোমাদের ওপর ধর্ম যুদ্ধকে ফরজ করা হয়েছে। হয়তো অনেকে এটাকে অপছন্দ করবে।

রাসূল [সা]-এর জীবনে বহুবার তিনি জিহাদে অংশ নিয়েছেন এবং যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। ধর্ম যুদ্ধের মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, যারা ধর্ম যুদ্ধে নিহত হন তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা সেটা বোঝ না।

www.pathagar.com

এ জন্য রাসূল [সা] জিহাদের প্রতি তার উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন এবং এতে অংশগ্রহণ করাকে ফরজ করে দিয়েছেন।

পরকালীন মুক্তির জন্য আমল

মহান নেতা মানব হিতৈষী রাসূল [সা] তার উম্মতকে আখেরাতের মুক্তির জন্য সকল আমল করার নির্দেশ প্রদান করেন। আর এই পরকালীন মুক্তি কেবল সৎকর্মের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। এজন্যে তিনি স্রষ্টা ও সৃষ্টির এবং উপাসক ও উপাস্যের মধ্যে সম্পর্ক বিশুদ্ধ করার অনুপ্রেরণা প্রদান করেন।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে রাসূলের [সা] এই ভাষণ

আধুনিক সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে রাসূল [সা]-এর এই ভাষণটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। খোদাভীতি অর্জনের মাধ্যমে মানুষ সকল পাপ থেকে বিশুদ্ধ থাকতে পারে। ব্যক্তি যেমন পাপমুক্ত হয়ে সফলতা অর্জন করতে পারে তেমনি পাপমুক্ত সমাজ গঠনও সহজ হয়।

আধুনিক যুগের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা যে সব তথ্য ও উপাত্ত রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রদান করেছেন তার অধিকাংশই ক্ষণকাল পরে অসাড় প্রমাণিত হয়েছে। যার জন্য ব্যক্তির দূরাচারের কারণে রাষ্ট্রও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

কিন্তু মানবতার মহান শিক্ষক রাসূল [সা] ব্যক্তি চরিত্র গঠনের মাধ্যমে দেশ, জাতি, সমাজ, আর রাষ্ট্র গড়ার তাগিদ দেন। এ জন্য সকল ঐতিহাসিক একথা স্বীকার করেছেন যে, মহানবী [সা] একটি আধুনিক কল্যাণময় রাষ্ট্রের প্রবর্তক।

এই ভাষণটি যদিও সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত অর্থবহ। এর অন্তর্নিহিত ভাবের প্রতি যদি বিশ্ববাসী আন্তরিক হয় তাহলে সত্য, ন্যায় ও সুখী সমৃদ্ধশালী সমাজ ও কল্যাণময় রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব। #

www.pathagar.com

মুমিন হৃদয়ে আখিরাতের বাসনা

মনির হোসেন হেলালী

মুমিন অর্থ বিশ্বাসী। মহান আল্লাহ তা'আলার একক সত্ত্বা, তাঁর প্রেরিত রাসূল, ফেরেশতা, কিতাব, পরকাল এবং তাকদীরের ওপর আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপনকারী আল্লাহর গোলামকে ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় মুমিন বলা হয়। মুমিনের পরিচয়ে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, 'তাঁরা তাওবাকারী, ইবাদাতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকুকারী, সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশদাতা, অসৎকাজের নিষেধকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা হিফাযতকারী। আর মুমিনদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও।' [সূরা তওবা: ১১২]। 'মুমিন তো তাঁরাই যাদের সামনে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে তাদের অন্তর প্রকম্পিত হয়ে ওঠে আর যখন আয়াত তিলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেয়ে যায়।' [সূরা আনফাল : ২]।

হাদীসে বলা হয়েছে, নুমান ইবনে বশীর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন, 'তোমরা মুমিনদেরকে পারস্পরিক দয়া, ভালবাসা এবং হৃদ্যতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে একটি দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। দেহের কোন অঙ্গ যদি পীড়িত হয়ে পড়ে তাহলে অপর অঙ্গগুলোও জ্বর এবং নিদ্রাহীনতাসহ তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে।' [সহীহ বুখারী-মুসলিম]।

মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে বলা হয় আখিরাত। কুরআনে বলা হয়েছে, 'সেদিন অবশ্যই আসবে যখন মুত্তাকী লোকদেরকে আমি মেহমানদের মত রহমানের দরবারে উপস্থিত করব। আর পাপী অপরাধী লোকদেরকে পিপাসু জানোয়ারের মত জাহান্নামের দিকে তেড়ে নিয়ে যাব। সেই সময় লোকেরা কোন সুপারিশ করতে সক্ষম হবে না তাদের ব্যতীত যারা রহমানের দরবার হতে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে।' [সূরা মারিয়াম : ৮৫-৮৭] হাদীসে এসেছে, আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, 'আমি আল্লাহর নবীকে একথা বলতে শুনেছি যে, কিয়ামাতের দিন মানব জাতিকে খালি পায়ে, উলঙ্গ ও খাতনা বিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমতাবস্থায় তো

www.pathagar.com

নারী-পুরুষ পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাবে। রাসূল [সা] বললেন, হে আয়েশা! সেদিনকার অবস্থা এত ভয়াবহ হবে যে, পরস্পর পরস্পরের দিকে তাঁকাবার কোন কল্পনা-ই করবে না।' [সহীহ বুখারী-মুসলিম]

মুমিন সবসময় নিজেকে আল্লাহর ভালবাসার চাঁদরে জড়িয়ে রাখতে চান। তাঁর জীবনের সকল চাওয়া-পাওয়া হয় একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে। তিনি তাঁর রবের সন্তোষ অর্জনের জন্য যে কোন ত্যাগই স্বীকার করতে রাজি হন। দুনিয়ার কোন লোভ-লালসা তাকে গ্রাস করতে পারে না। তাঁর শয়নে-স্বপনে-কর্মে সবসময় জাগরুক থাকে আল্লাহর ভয় ও তাঁর ভালবাসা। দুনিয়ার স্বার্থকে তিনি বড় দেখেন না, বড় দেখেন শুধু আখিরাতের মানযিল। তাই তিনি অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যান তাঁর লক্ষ্যপানে পৌঁছতে, আর বাসনার রাজ্যে পরম তৃপ্তিতে ভাসতে থাকেন রবের হুকুম পালন করার মানসিকতা নিয়ে। কীভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, সে ভাবনাই থাকে তাঁর মনে সবসময়।

মুমিন জীবনের লক্ষ্য

সফল জীবন লাভের জন্য একটি চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করা খুবই জরুরী। ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মানুষ অনাদি নয়, চিরস্থায়ী। অর্থাৎ মানব জীবনের শুরু আছে শেষ নেই। তাই মানুষের উচিত এমন লক্ষ্য নির্ধারণ করা যা তার চিরস্থায়ী জীবনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী, তাই যদি কেউ পার্থিব জীবনের মধ্যে তার জীবনের লক্ষ্য সীমিত রাখে, তাহলে তা হবে বুদ্ধিমত্তার পরিপন্থী। মানুষ নিজ জীবন সম্পর্কে প্রায়শ ভুল ধারণার বশবর্তী হয়। কখনো সে নিজেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বস্তু বলে সাব্যস্ত করে এবং অন্যদেরকে নিম্নস্তরের মনে করে তাদের আনুগত্য দাবী করে। আবার কখনো সে নিজেকে নিতান্ত অসহায় ভেবে যে কোন শক্তিধর বস্তুর নিকট আপন সত্তাকে বিলীন করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে এ দু'য়ের মাঝামাঝি মানুষের অবস্থান। মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। অত্যন্ত নিকৃষ্ট বস্তু দ্বারা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে অহঙ্কার করা মানুষের জন্য সমীচীন নয়। কিন্তু মানুষকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে। তাই মানুষ একমাত্র তাঁরই সামনে মাথা নত করবে, অন্য কারো সামনে নয়। কুরআনে বলা হয়েছে, 'আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফিরিশতাদেরকে বললেন, 'নিশ্চয় আমি যমীনে একজন খলীফা সৃষ্টি করছি।' [সূরা ২; আলবাকারাহ: ৩০]। মানুষের মর্যাদা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু সে স্রষ্টার অনুগত থেকেই পৃথিবীর সবকিছুর ওপর কর্তৃত্ব চালাবে। তাহলেই সে হবে সফলকাম। পক্ষান্তরে এর ব্যতিক্রম করলে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে।

www.pathagar.com

জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর গোলামী করাই হচ্ছে সফল জীবনের লক্ষ্য। কারণ মানুষকে সৃষ্টি করাই হয়েছে তাঁর গোলামী করার জন্য। এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, 'আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদাত করবে।' [সূরা ৫১; যারিয়াত : ৫৬] অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদাতই মানুষের জীবনের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। এটিই মানুষের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। আল্লাহর উদ্দেশ্য যাতে পূর্ণ হয়, সে লক্ষ্যেই পরিচালিত হওয়া উচিত মানুষের জীবন। সৃষ্টজীব হিসেবে স্রষ্টার উদ্দেশ্য পূরণে ব্রতী হওয়া মানুষের একান্ত কর্তব্য। অতএব, আল্লাহর ইবাদাতই মানুষের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাহলে বুঝা গেলো, আল্লাহর গোলামীর মধ্যেই রয়েছে মানুষের কল্যাণ ও সফলতা। তাই একেই ধরা যায় সফলতার মাপকাঠি। আল্লাহর গোলামীতে মানুষের সম্মান কমে না বরং বৃদ্ধি পায়। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানীত।' [সূরা ৪৯; হুজুরাত : ১৩]।

তাকওয়া বা আল্লাহভীতি হচ্ছে সম্মানের মাপকাঠি। যার মধ্যে যতটুকু তাকওয়া থাকবে, আল্লাহর নিকট তার সম্মানের মাত্রাও থাকবে ততটুকু। তাই সম্মান লাভের জন্যে যা করতে হয় তা হলো তাকওয়া অর্জন তথা আল্লাহর গোলামী।

দুনিয়ার জীবনে মুমিনের চাওয়া-পাওয়া

দুনিয়ার জীবনে মুমিন পেতে চায় তাঁর রবের ইবাদাত করার ব্যাপক সুযোগ। দুনিয়ার কোন মোহ তার চাওয়া-পাওয়া হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা মানুষসহ সকল প্রাণীর আহারের দায়িত্ব নিজের কাছেই রেখেছেন। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, 'আর যমীনে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর রিয্কের দায়িত্ব আল্লাহরই এবং তিনি জানেন তাদের আবাসস্থল ও সমাধিস্থল। সব কিছু আছে স্পষ্ট কিতাবে' [সূরা ১১; হূদ : ৬]।

আল্লাহ তা'আলার ওপর এরূপ গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দেয়ার মত কোন ব্যক্তি বা শক্তি নেই। বরং তিনি নিজেই অনুগ্রহ করে সে দায়িত্ব নিয়েছেন এবং মানুষকে তা জানিয়ে দিয়ে তাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওয়াদার কোন ব্যতিক্রম হতে পারে না। অসহায় শিশু, অচল জীব-জন্তুকেও তিনি আহার দান করেন। তাই শুধুমাত্র জীবিকা সংগ্রহ বা অর্থ উপার্জনকে লক্ষ্য বানানো, শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের জন্যে শোভনীয় নয়। কিন্তু মানুষ স্বভাবত ক্ষিপ্রতাবাদী। বর্তমান অবস্থাকেই সে সর্বস্ব মনে করে থাকে। অতীতের কথা স্মরণ রেখে ভবিষ্যতের জন্যে সঠিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে সে প্রায়শ ব্যর্থ হয়। সাময়িক কষ্টের কারণে কখনো অতীতের সুখ-সচ্ছলতার কথা সে একেবারেই ভুলে যায়

www.pathagar.com

এবং আল্লাহর বিধি নিষেধের কোন তোয়াক্কা না করেই জীবিকার সন্ধান করতে শুরু করে। কেবলমাত্র মুমিনরাই পারেন দুনিয়ার এসব লোভ লালসা থেকে মুক্ত থেকে আল্লাহর জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতে। মুমিনদের ব্যাপারে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয় আমি নিবিষ্ট করেছি আমার চেহারা একনিষ্ঠভাবে তাঁর জন্য, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।' [সূরা ৬; আনআম : ৭৯]। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'বল, নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব।' [সূরা ৬; আনআম : ১৬২]। 'আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজকে বিকিয়ে দেয়। আর আল্লাহ [তাঁর] বান্দাদের প্রতি স্নেহশীল।' [সূরা ২; আলবাকারাহ : ২০৭]।

মুমিন জীবনে ঈমানী পরীক্ষা

যুগে যুগে আল্লাহর মুমিন বান্দাদেরকে তাদের জান, মাল, ইজ্জত আব্রু কুরবানী করতে হয়েছে। আল্লাহ তাঁর দ্বীনের জন্য যাদেরকে পছন্দ করেছেন, তাদেরকে বিভিন্ন সময় পরীক্ষা করেছেন। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, 'আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।' [সূরা ২; আলবাকারাহ: ১৫৫]। কুরআন মাজীদে অন্যত্র বলা হয়েছে, 'নাকি তোমরা ভেবেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনো তোমাদের নিকট তাদের মত কিছু আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে। তাদেরকে স্পর্শ করেছিল কষ্ট ও দুর্দশা এবং তারা কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তাঁর সাথী মুমিনগণ বলছিল, 'কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে'? জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।' [সূরা ২; আলবাকারাহ : ২১৪]।

দুনিয়ার জীবনে কোন মুমিন বান্দাই পরীক্ষা থেকে রেহাই পাননি। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, 'মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আর আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। ফলে আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্য বলে এবং অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী।' [সূরা ২৯; আলআনকাবূত : ২-৩]।

হাদীসে এসেছে, আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল [সা] বলেছেন, বিপদ ও পরীক্ষা যত কঠিন হবে তার প্রতিদানও তত মূল্যবান। এ শর্তে যে, মানুষ বিপদে ধৈর্যহারা হয়ে হক পথ থেকে যেন পালিয়ে না যায়। আর আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন তখন অধিক যাচাই ও সংশোধনের জন্য

www.pathagar.com

তাদেরকে বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। অত:পর যারা আল্লাহর সিদ্ধান্তকে খুশি মনে মেনে নেয় এবং ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাদের ওপর সন্তুষ্ট হন। আর যারা এ বিপদ ও পরীক্ষায় আল্লাহর ওপর অসন্তুষ্ট হয় আল্লাহও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন।' [তিরমিযী]।

জীবন যুদ্ধে মুমিনের সফলতা

দুনিয়ার জীবন যুদ্ধে একজন মুমিন তাঁর ঈমানের দাবি পূরণে থাকেন সদা আপসহীন। সংগ্রামের পথে তিনি খুঁজে পান জীবনের সফলতা। কুরআনে এসেছে, 'মুমিন কেবল তাঁরাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের [সা] প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি। আর নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। এরাই সত্যনিষ্ঠ।' [সূরা ৪৯; হুজুরাত : ১৫]। মুমিনদের সফলতার ব্যাপারে কুরআন মাজীদে ঘোষণা করা হয়েছে, 'তাদের রবের কাছে তাদের পুরস্কার হবে স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা থাকবে স্থায়ীভাবে। আল্লাহ তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন তারাও আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট হয়েছে। এটি তার জন্য, যে স্বীয় রবকে ভয় করে।' [সূরা ৯৮; আলবায়্যিনাহ : ৮]। মুমিনের সকল কাজ হয়ে থাকে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, 'সে তো শুধু তাঁর মহান রবের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করে। অবশ্যই তিনি [তাঁর ওপর] সন্তুষ্ট হবেন।' [সূরা ৯২; লাইল : ২০-২১]।

মুমিনদের পুরস্কার সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, 'তবে যারা তাওবা করে নিজেদেরকে শুধরে নেয়, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং আল্লাহর জন্য নিজেদের দ্বীনকে খালেস করে, তারা মুমিনদের সাথে থাকবে। আর অচিরেই আল্লাহ মুমিনদেরকে মহাপুরস্কার দান করবেন।' [সূরা ৪; নিসা : ১৪৬]। 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে যমীনের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতি শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তাঁরা আমারই ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপর যারা কুফরী করবে তারাই ফাসিক।' [সূরা ২৪; নূর : ৫৫]।

www.pathagar.com

মুমিনের আসল ঠিকানা

একজন সত্যিকারের মুমিন মনে করেন, তাঁর আসল ঠিকানা হলো আখিরাত। তাই সে আখিরাতের ঘর বানানোর কাজে সদা থাকেন সচেষ্ট। আর আখিরাতের ঘর হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জান্নাত। জান্নাতের আকাঙ্খী মুমিন বান্দাহ দুনিয়ার জীবনে এক মুহূর্তের জন্যও আখিরাতের আমল থেকে দূরে থাকতে চান না। সময়ের প্রতিটি সেকেন্ড তাঁর কাছে মহা মূল্যবান। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পুরোটা সময়ই তিনি আল্লাহর ইবাদাতে কাটিয়ে দিতে ভালবাসেন। তাঁর কর্মের প্রশংসা করে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, 'সৎ কর্মশীল মুমিনদের জন্যে রয়েছে নিয়ামাতে ভরা জান্নাত। চিরকাল তাঁরা তা উপভোগ করবে। এটা আল্লাহর পাকা ওয়াদা। আর তিনি মহা শক্তিশালী ও সুবিজ্ঞ।' [সূরা ৩১; লোকমান : ৮-৯]।

মুমিনের আখিরাত প্রস্তুতি

আখিরাতে চিরসুখ ভোগ করতে একজন মুমিন দুনিয়ার জীবনে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দেন আল্লাহর দ্বীনের পথে। দুনিয়ার কোন বাধা, অর্থ-বিত্ত তাঁর কাছে বড় মনে হয় না, বড় মনে হয় আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন করাকে। মুমিনের কর্মপ্রস্তুতি সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন [এর বিনিময়ে] যে, তাঁদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তাঁরা আল্লাহর পথে লড়াই করে। অতএব তাঁরা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে অধিক কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা [আল্লাহর সঙ্গে] যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য।' [সূরা ৯; তাওবা : ১১১]। কুরআন মাজীদে অন্যত্র বলা হয়েছে, আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তাঁরা ভাল কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, আর তাঁরা সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' [সূরা ৯; তাওবা : ৭১]।

আখিরাতে মুমিনের অবস্থান

যারা দুনিয়ার সকল চাওয়া-পাওয়াকে তুচ্ছ মনে করে, হাসি-আনন্দকে বিসর্জন দিয়ে হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন আখিরাতের বাসনা, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য মহা পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। কুরআন মাজীদে এসেছে, 'আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ, তাতে তাঁরা চিরদিন থাকবে এবং [ওয়াদা দিচ্ছেন] স্থায়ী জান্নাতে

www.pathagar.com

পবিত্র বাসস্থানসমূহের। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি সবচেয়ে বড়। এটাই মহাসফলতা।' [সূরা ৯; তাওবা : ৭২]। কুরআন মাজীদের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'তারাই হবে ওয়ারিস। যারা ফিরদাউসের অধিকারী হবে। তাঁরা সেখানে স্থায়ী হবে।' [সূরা ২৩; আলমুমিনূন : ১০-১১]।
আখিরাতে মুমিনের অবস্থান হবে জান্নাতের সর্বোচ্চ আসনে। কুরআনে বলা হয়েছে, 'আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, অচিরেই আমি তাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা হবে স্থায়ী। সেখানে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র স্ত্রীগণ এবং তাদেরকে আমি প্রবেশ করাব বিস্তৃত ঘন ছায়ায়।' [সূরা ৪; নিসা : ৫৭]।
দুনিয়ার জীবনটাই শেষ নয়। মৃত্যুর পর শুরু হবে অনন্ত জীবন। সেখানে সকলের পাপ-পূণ্যের হিসাব নেয়া হবে এবং দেয়া হবে আমলের ভিত্তিতে ফলাফল। আখিরাতে মুমিনদের জন্য রয়েছে মহা শান্তির স্থান জান্নাত। আর পাপীদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। কুরআনে এসেছে, 'কিয়ামাতের সংবাদ কি তোমার কাছে এসেছে? সেদিন অনেক চেহারা হবে অবনত। কর্মক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে। তাদের পান করানো হবে ফুটন্ত ঝর্ণা থেকে। তাদের জন্য কাঁটাবিশিষ্ট গুল্ম ছাড়া কোন খাদ্য থাকবে না। তা মোটা-তাজাও করবে না এবং ক্ষুধাও নিবারণ করবে না। সেদিন অনেক চেহারা হবে লাবণ্যময়। নিজদের চেষ্টা সাধনায় সন্তুষ্ট। সুউচ্চ জান্নাতে। সেখানে তারা শুনবে না কোন অসার বাক্য।' [সূরা ৮৮; আলগাশিয়া : ১-১১]। এমন জান্নাত প্রত্যাশাই হোক মুমিনের কাম্য। #

www.pathagar.com

সামাজিক অবক্ষয় রোধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মাদ [সা]

মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহিদ

বিশ্বমানবের চরম অবক্ষয় ও অধ:পতনের সময়ে যখন মানবতা অবহেলিত, উপেক্ষিত এমন কি দারুণভাবে অপমানিত এবং নির্যাতিত তখন অত্যাচারিত মানবতার ফরিয়াদ শ্রবণের জন্য বিশ্বের বুকে কেউ ছিল না। জড়বাদ, বস্তুবাদ এবং ভোগবাদের গোলক ধাঁধাঁয় যখন সকলেই দিশেহারা, বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট, পাপী, আত্মবিস্মৃত মানব জাতির এমন সংকটময় মুহূর্তে সামাজিক অবক্ষয় রোধকল্পে বিশ্বমানবতার পরিপূর্ণ বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন তথা সামগ্রিক কল্যাণ ও বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালার মহান দান ও করুণা স্বরূপ পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]কে। বিপন্ন এবং অসহায় মানবতা পরিত্রাণ পেলো। মানবতা বেঁচে উঠলো, স্রষ্টা এবং সৃষ্টির সম্পর্ক নতুন ভাবে গড়ে উঠলো এবং ঘনিষ্ঠতর হলো। অশান্ত ও জুলুম অত্যাচারে জর্জরিত অধ:পতিত বিশ্বের বুকে শান্তি ফিরে এলো। বিশ্ব মানবতার যাবতীয় গোমরাহী, অধ:পতন, সামাজিক অবক্ষয় এবং অকল্যাণকে দূরীভূত করে প্রত্যেকটি মানুষ হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর সংস্পর্শে এসে হয়ে উঠলো আল্লাহর প্রিয় বান্দা। তাইতো এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকাতে বলা হয়েছে: "of all the religious personalities of the world Hazrat Muham.mad [s.m] was the most successful."

সমাজ হলো একটি মানবিক সংগঠন। এটি বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠির সমন্বয়ে গঠিত হয়। সমাজ বিজ্ঞানী রবার্ট এম ম্যাকাইভার সমাজের সংজ্ঞায় বলেন, "সমাজ অর্থ সহযোগিতা, এটি যুদ্ধ বিগ্রহের বিপরীত অবস্থা। যুদ্ধ বিগ্রহ হলো একে অপরের ধক্ষংস সাধন, ক্ষতি সাধন। অন্যদিকে সমাজ হলো একে অপরের সৃজনশীলতা তথা সহযোগিতা"।

www.pathagar.com

সামাজিক অবক্ষয় রোধও শান্তি প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর নবুয়তের পূর্ব যুগঃ

সামাজিক অবক্ষয় রোধে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমাজের প্রতিটি অঙ্গনে, মানব চিন্তার প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এই মহামানবের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। দ্বীন ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে আরব জাহানে অব্যাহতভাবে যেসব যুদ্ধ চলে আসছিল তার মধ্যে "হারবলু ফিজার" যুদ্ধ ছিল সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও ভয়ংকর। জাহেলী যুগেও আরবদের মধ্যে মুহররম, রজব, যুলকাদ ও যুলহাজ্জ এ চার মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ থাকত। এ সব মাসে যুদ্ধ করা ছিল তাদের জন্য মহাপাপ। এ জন্য এ যুদ্ধকে হারবুল ফিজার বা পাপের যুদ্ধ নামে নামকরণ করা হয়। হযরত মুহাম্মাদ [সা] সরাসরি সশস্ত্র এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "দুশমনদের নিক্ষিপ্ত তীর আমি কুড়িয়ে এনে আমার পিতৃব্যদের হাতে তুলে দিতাম"। [ইবনে হিশাম] পরবর্তী কালে মহানবী [সা] বলতেন, "আমি যদি এতটুকু অংশ গ্রহণ না করতাম তবে তাই উত্তম ছিল"। [আত-তাবাকাতুল কুবরা]। এ সময় হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর বয়স ছিল মাত্র দশ বা তের বৎসর।

আরবগোত্র সমূহের মধ্যে অব্যাহত যুদ্ধ বিগ্রহ ও ব্যাপক সামাজিক অবক্ষয়ের ফলশ্রুতিতে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] শান্তিকামী সমমনাদের নিয়ে গঠন করেন "হিলফুল ফুযুল" নামক সেবাসংঘ। এ সময় হযরত মুহাম্মাদের [সা] বয়স ছিল মাত্র বিশ বৎসর। ইবনে হিশাম বলেন, "হিলফুল ফুযুলের প্রতিজ্ঞা সমূহ ছিল নিম্নরূপঃ ১. আমরা দেশ হতে অশান্তি দূর করব; ২. আমরা বহিরাগতদেরকে রক্ষা করব; ৩. আমরা নিংস্বদেরকে সাহায্য করব; ৪. আমরা অত্যাচারীদেরকে প্রতিহত করব; ৫. আমরা অত্যাচারীতদেরকে সাহায্য করব। [রাহমাতুল্লিল আলামিন]। এ সেবা সংঘের প্রচেষ্টায় সমাজে অত্যাচার অবিচার বহুলাংশে হ্রাস পায়, ফলে মানুষের যাতায়াত অনেকাংশে নিরাপদ হয়।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] শৈশবকাল থেকেই অত্যন্ত নম্র ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর কিশোর বয়সের সততা, ন্যায় নিষ্ঠা, নম্রতা ও ভদ্রতা, নি:স্বার্থ মানবপ্রেম ও সত্যিকার কল্যাণ প্রচেষ্টা, চরিত্র মাধুর্য ও অমায়িক ব্যবহারের ফলে আরবগণ তাঁকে "আল আমিন বা বিশ্বস্ত, আস সাদিক বা সত্যবাদী" উপাধিতে ভূষিত করেছিল। [সীরাতে ইবন হিশাম]। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বৎসর তখন মক্কার বিভিন্ন গোত্র মিলিত হয়ে পবিত্র কাবাঘর নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করে। কিন্তু হাজরে আসওয়াদ অর্থাৎ কালোপাথর স্থাপনকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ ও রক্তপাতের প্রবল আশংকা দেখা দেয়।

www.pathagar.com

এ সময় কুরাইশ গোত্রের সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ ও সম্মানিত ব্যক্তি আবু উমাইয়া ইবন মুগীরা নেতৃবৃন্দকে ডেকে বললেন, "তোমরা শুভ কাজের মধ্যে অশুভের সুত্রপাত করো না। আমার কথা শোন, আগামীকাল ভোরে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম কাবাঘরে আগমন করবে তার উপর এই বিরোধের মিমাংসার ভার অর্পণ করা হবে।" সকলেই এই প্রস্তাব মেনে নিল এবং শাসরুদ্ধকর অবস্থায় আগন্তকের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। এমন সময় দেখা গেল কুরাইশ বংশীয় যুবক হযরত মুহাম্মাদ [সা] আগমন করছেন। তাঁকে দেখে সকলেই আনন্দিত হয়ে স্বত:স্ফুর্তভাবে বলে উঠল, "এই তো আমাদের আলামীন মুহাম্মাদ। আমরা তার মিমাংসায় সম্মত আছি।" হযরত মুহাম্মাদ [সা] কাবাঘরে উপস্থিত হওয়ার পর নেতৃবৃন্দের নিকট থেকে বিষয়টি অবগত হয়ে একটি চাদর আনতে বললেন। প্রত্যেক গোত্র হতে একজনকে চাদরটি ধরতে বললেন এবং নিজ হাতে কালো পাথরটি চাদরের উপর উঠিয়ে দিলেন। নেতৃবৃন্দ পাথরটি কাবাঘরের মধ্যে নিয়ে আসার পর হযরত মুহাম্মাদ [সা] পাথরটি যথাস্থানে স্থাপন করলেন। নবুয়ত লাভের পূর্বেই হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর বিশ্বস্ততা, বুদ্ধিমত্তা দুরদর্শিতা ও নিরপেক্ষতার কারণে পবিত্র মক্কার জনগণ সম্ভাব্য এক ভয়াবহ যুদ্ধ ও রক্তপাত হতে রক্ষা পেল এবং অকুণ্ঠচিত্তে তাঁর প্রশংসা করতে লাগল। [সীরাতুল মুস্তফা]।

অবক্ষয় রোধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মাদ [সা] নবুয়তের পরবর্তী যুগঃ

মহান আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে চল্লিশ বৎসর বয়সে হযরত মুহাম্মাদ [সা] নবুয়ত লাভ করেন। নবুয়ত প্রাপ্তির পর তিনি সামাজিক অবক্ষয় রোধ করার লক্ষ্যে মানুষের মধ্যে দাওয়াত ও তাবলিগ শুরু করেন। যার সারকথা হচ্ছে (১) আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস (২) হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য এবং তাঁর সকল কর্মকান্ড ও সিদ্ধান্ত সর্বান্ত:করণে মেনে নেওয়া। (৩) আখিরাতের প্রতি অবিচল আস্থা (৪) তাযকিয়ায়ে নফসের উপর গুরুত্বারোপ অর্থাৎ অবক্ষয় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকা এবং নেক আমলে তৎপর থাকার চেষ্টা করা। (৫) নিজের সকল কর্ম ও ইবাদত সৃষ্টিরকর্তা আল্লাহর উপর ন্যস্ত করা। মহান আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশে হযরত মুহাম্মাদ [সা] সামাজিক অবক্ষয় রোধকল্পে কুরআনের আলোকে কর্মপদ্ধতি ও নীতিমালা গ্রহণ করে সফলতা লাভ করেন। আরবদের কাছে কন্যা সন্তানের জন্ম অত্যন্ত অপমানজনক ব্যাপার ছিল। অনেক পিতা অপমানের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এবং অনেকে দারিদ্রের ভয়ে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিত। এ প্রসঙ্গে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] মহান আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ জানিয়ে দিলেন, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "তোমাদের সন্তানদের দারিদ্র-ভয়ে হত্যা করো না।

www.pathagar.com

আমিই তাদের এবং তোমাদের রিযিক দেই। নিশ্চয় এদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।" [বনি ইসরাইল আয়াত-৩১]। ইসলামে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা নিষিদ্ধ। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] এভাবেই কুরআনের মূলনীতি দ্বারা কন্যা শিশু হত্যা রোধসহ যাবতীয় হত্যা রোধ করে সমাজে নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালীন সময়ে আরবদের মধ্যে ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। পণ্যদ্রব্যের ন্যায় দাস-দাসীও হাটেবাজারে বিক্রি করা হতো, তাদের কোন প্রকার স্বাধীনতা ছিল না। দাসীদের উপপত্নী হিসেবে ব্যবহার করা হতো। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] ঘোষণা দিলেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে দাসত্ব মুক্ত করে দিবে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সেই ব্যক্তিকে জাহান্নাম হতে মুক্ত করে দিবেন।" [মিশকাত শরিফ]। বিশ্বনবীর ঘোষণায় হযরত বিলাল [রা]কে হযরত আবুবকর [রা] মুক্ত করে আনেন। [আর রাহিকুল মাখতুম]। আর এভাবে অনেক দাস-দাসীদের মুক্ত করার মাধ্যমে সামাজিক অবক্ষয় রোধ করে মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

জাহেলিয়া যুগে আরব সমাজে নারীকে কোন সম্মান ও মূল্য দেয়া হত না। তাদের কোন সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার ছিল না। সমাজে নারীকে অস্থাবর ও ভোগের সমাগ্রী হিসেবে গণ্য করা হতো। নারী-পুরুষের মধ্যে কোন পবিত্র বন্ধন ছিল না। একজন পুরুষ যত খুশি বিয়ে করত এবং ত্যাগ করত। উত্তরাধিকার সুত্রে নারীগণ কোন প্রকার সম্পত্তি পেত না। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দেশ জানিয়ে দিলেন, মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, "পিতা-মাতা এবং আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে। তা অল্প হোক অথবা বেশী হোক এক নির্ধারিত অংশ।" [সূরা নিসা আয়াত-৭]। আরব সমাজে যৌতুক প্রথাও প্রচলিত ছিল। অনেকেই ধন-সম্পদের লোভে ও যৌতুকের লালসায় একাধিক বিবাহ শাদী করত। যৌতুক নেয়া একটি সুস্পষ্ট জুলুম। মহান আল্লাহ তা'য়ালা জুলুমবাজদের ভালবাসেন না। এটি একটি জঘন্য সামাজিক অবক্ষয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলে কারীম [সা] বলেছেন, "যে ব্যক্তি কাউকে সম্পদ লাভের আশায় বিবাহ্ করে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে অসম্মানিত ও অপমানিত করেন। আর যে ব্যক্তি নৈতিক চরিত্র ঠিক রাখার জন্য বিবাহ্ করে আল্লাহ্ তা'য়ালা সবদিক থেকেই তাকে বরকতময় করেন।" [মাজ-মাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মানবাউল কাওয়ায়েদ]। নারীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠায় বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] বলেন, "মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত"। আর তিনি এভাবেই সমাজে নারীর সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন।

www.pathagar.com

প্রাক ইসলামী যুগে আরবে জঘন্য জুলুমমুলক সুদপ্রথা বিদ্যমান ছিল। মহাজনগণ এত উচ্চহারে দরিদ্র আরবদের কাছ থেকে সুদ গ্রহণ করত যে, সুদ পরিশোধ করতে না পারলে সুদ গ্রহীতার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির সাথে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে জোর করে সুদের বিনিময়ে নিয়ে যেত। মহানবী [সা] আল্লাহর নির্দেশ জানিয়ে দিলেন, মহান আল্লাহ বলেন, "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা চক্র বৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর"। [আল ইমরান আয়াত-১৩০]। রাসূলুল্লাহ [সা] আরও বলেন, "যে সুদ খায়, যে সুদ দেয়, যে সুদের দলিল লেখে এবং যে দুজন স্বাক্ষী হয় তাদের প্রতি অভিসম্পাত"। তিনি এটাও বলেছেন, "পাপী হওয়ার দিক থেকে তারা সকলেই সমান"। [সহীহ্ মুসলিম]। ঘুষ একটি জঘন্যতম সামাজিক অনাচার, এর অপর নাম উৎকোচ। দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষকে কোন কিছু দেওয়ার বিনিময়ে বাড়তি সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করাকেই ঘুষ বলে। ঘুষ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ [সা] বলেন, "ঘুষ দাতা ও ঘুষগ্রহিতা উভয়ই জাহান্নামী"। [তাবারানী]। এভাবেই বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] সমাজ থেকে সুদপ্রথা ও ঘুষ উচ্ছেদ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রাক ইসলামী যুগে সমাজ ছিল অশালীনতায় ভরপুর। পাপাচার, কুসংস্কার, অন্যায়-অবিচার, জুলুম-নির্যাতন আরব সমাজকে কুলষিত করেছিল। অবসর বিনোদনের হাতিয়ার ছিল জুয়া খেলা এবং ফলাবিহীন তীর নিক্ষেপ করে ভবিষ্যত ভাগ্য গনণা করা। মদ ও নর্তকী ছাড়া আরব সমাজে উৎসবের কল্পনা করা যেত না। হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এ সকল অন্যায় জুলুম ও অবক্ষয় রোধকল্পে আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ অবগত করালেন। এসম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, "হে বিশ্বাসীগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপুজা ও ভাগ্য নির্ণায়ক তীর নিঃসন্দেহে শয়তানের কাজ। কাজেই তোমরা তা থেকে দূরে থাক, তাহলে তোমরা সফলতা পাবে"। [সুরা মায়েদা আয়াত-৯০]। মদপান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ [সা] বলেন, "যে মাদকদ্রব্য পান করবে তাকে বেত্রাঘাত কর। সে যদি চতুর্থবার করে তবে তাকে হত্যা কর"। [সুনানে ইবনে মাজা]।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও ব্যভিচার রোধকল্পে মহান আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ জানিয়ে দিলেন, "তোমরা ব্যভিচারের নিকটও যেয়ো না, কেননা এটা অত্যন্ত ঘৃণিত মন্দ কাজ"। [সূরা বনি ইসরাইল - ৩২]। আর এভাবেই বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] অবক্ষয় অনাচার বন্ধ করে সমাজে শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করেন।

সামাজিক অবক্ষয়ের মধ্যে প্রতারণা একটি মারাত্মক অপরাধ। এটি একটি সমাজদ্রোহী পাপ। মানুষকে ফাঁকি দেয়া, ঠকানো, পণ্যে ভেজাল দেয়া, ওজনে

www.pathagar.com

কম-বেশী করা, মুদ্রা জাল করা, পরীক্ষায় নকল করা, পণ্য নকল করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, এমন কি নিজ দায়িত্ব পালন না করাও প্রতারণার শামিল। প্রতারণার প্রভাবে সমাজ-সভ্যতা অবক্ষয় ও ধংসের মুখোমুখি হয়। এটি একটি মারাত্বক সামাজিক অপরাধ। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] এক ব্যবসায়ীর আটার বস্তার মধ্যে হাত প্রবেশ করিয়ে দেখলেন আটা ভেজা। তখন তিনি সাবধানবানী উচ্চারণ করে বললেন, "যে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়"। [সহীহ মুসলিম]। আর এভাবেই তিনি প্রতারণা নামক সামাজিক অবক্ষয় রোধ করেন। চুরি ডাকাতি ও ছিনতাই প্রতিটি অমানবিক জুলুমমূলক জঘন্যতম অপরাধ। এ গুলোর মাধ্যমে সমাজে আরো নতুন নতুন অপরাধ সৃষ্টি হয়। চোর ডাকাত ও ছিনতাইকারীরা সম্পদের পাশাপাশি মানুষ অপহরণের কাজ করে। সুযোগ পেলে সভ্রমহানির ঘটনাও ঘটে। যার ফলশ্রুতিতে মানুষ দারুণভাবে নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়। একদা এক ব্যক্তি মহানবী [সা]-এর নিকট এসে বলল, "ইয়া রাসূলূল্লাহ [সা] আমি চুরি করি, মিথ্যা বলি, এবং আরও বহু অন্যায় কাজ করি। এমতাবস্থায় এসব পাপ থেকে বাঁচার উপায় কি? রাসূলে কারীম [সা] বললেন, তুমি মিথ্যা বলা ছেড়ে দাও। লোকটি তাই করল এবং দেখা গেল মিথ্যা পরিত্যাগের ফলে লোকটির জীবন পাপ মুক্ত ও অবক্ষয় মুক্ত হয়ে গেল।" মহানবী [সা]-এর সম্মুখে এক ব্যক্তি তার এলাকায় চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদি অশান্তির ঘটনা উল্লেখ করলে রাসূলে কারীম [সা] বললেন, "তুমি যদি বেঁচে থাক তাহলে দেখবে এতদাঞ্চলে এমন শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, একজন উষ্টারোহী মহিলা সুদূর ইরাকের হীরা নামক স্থান থেকে যাত্রা করে একাকী কাবাঘর তাওয়াফ করে চলে যাবে কিন্তু এ দীর্ঘ পথে আল্লাহ ছাড়া সে আর কাউকে ভয় করার প্রয়োজন বোধ করবে না"।

তাই বলা যায় যে, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] সৎ উপদেশ দান্, আখেরাতের ভীতি, প্রতিরোধ মুলক ব্যবস্থা এবং ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে নানামুখী সামাজিক অরাজকতা ও অবক্ষয় রোধ করে নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাইতো পাশ্চাত্য মনীষীগণ এক বাক্যে স্বীকার করেছেন: "The world will be again peaceful if Hazrat Muhammad [s.w] comes." আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সুখী ও সমৃদ্ধিশালী সমাজ ও দেশ গড়ার তৌফিক দান করুন, আল্লাহুম্মা আমিন। #

www.pathagar.com

বাংলা ভাষায় মুহাম্মদ সা. চরিত

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান

বিশিষ্ট কবি লেখক ও গবেষক নাসির হেলাল সম্প্রতি 'বাংলা ভাষায় মুহাম্মদ সা. চরিত' নামক একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও সীরাত-গবেষক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান এবং মোহাম্মদ আবুল কাশেম ভূঁঞাকে।

গ্রন্থের শিরোনাম থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, বাংলা ভাষায় এ যাবৎ রাসূলুল্লাহ্ [সা.] সম্পর্কে যারা লেখালেখি ও গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাদের একটি ধারাবাহিক বিবরণ এ গ্রন্থে উঠে এসেছে। কাজটি অত্যন্ত কঠিন এবং গভীর গবেষণা-সাপেক্ষ বিষয়। এ দূরুহ কাজটি নাসির হেলাল অত্যন্ত যত্নের সাথে সুসম্পন্ন করেছেন বলে তিনি সকলের ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। এ গ্রন্থ পড়ে বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ [সা.] সম্পর্কে যারা চর্চা করেছেন, তাদের নাম, পরিচয় ও কাজের বিবরণ মোটামুটিভাবে অবগত হওয়া যায়।

মুহাম্মদ [সা.] মহান স্রষ্টার প্রেরিত নবী ও রাসূল। মানুষ সৃষ্টির পর মহান স্রষ্টা তাদেরকে দুনিয়ায় সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেন। আদি মানব আদম আ. একাধারে প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী। তারপর যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন। নবী-রাসূলগণের একমাত্র দায়িত্ব ছিল মানবজাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শন করা। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁরা মানবজাতিকে সঠিক পথের নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ [সা.] নবী-রাসূলদের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। মানবীয় সকল গুণাবলীতে বিভূষিত এ মহান ব্যক্তি নবী-রাসূলদের মধ্যে যেমন শ্রেষ্ঠ, মানুষ হিসাবেও তিনি অনন্যতুল্য সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। স্বয়ং আল্লাহ্ তাঁর শান ও মর্যাদাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছেন। এ সম্পর্কে কয়েকটি বাণী নিচে উদ্ধৃত হলো ঃ

"তুমি অবশ্যই শ্রেষ্ঠতম চরিত্রে অধিষ্ঠিত।" (সূরা কলম, আয়াত ঃ ৪)

"রাসূলকে (সা.) আমি তোমাদের (মানবজাতি) জন্য সর্বোত্তম আদর্শরূপে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আহযাব, আয়াত ঃ ২১)

"এবং তোমার খ্যাতিকে উচ্চমর্যাদা দান করেছি।" (সূরা ইনশিরাহ্, আয়াত ঃ ৪)

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে রাসূলের শান ও মর্যাদা সম্পর্কে সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এছাড়া, সর্বযুগে পৃথিবীর অনেক মনীষী মুহাম্মদ [সা.] সম্পর্কে সুউচ্চ

www.pathagar.com

ধারণা পোষণ করেন এবং তিনি যে সর্বোৎকৃষ্ট মহামানব এ সম্পর্কে অনেক অমুসলিম মনীষীও একমত। রাসূল হিসাবে তিনি বিশ্বব্যাপী সমগ্র মুসলিম জাতির নিকট পরম প্রিয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ অনুসরণীয় আদর্শ। অল্লাহ্ তাঁর মাধ্যমে তাঁর দ্বীনকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন এবং তাঁর উপর সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআন নাজিল করেছেন। আল-কুরআনের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ্ [সা.] এক আদর্শ জাতি গঠন করেন। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে-সভ্যতায় সে জাতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে পরিগণিত হয়। সমগ্র বিশ্বের সকল প্রান্তে তাঁদের প্রভাব বিস্তৃত হয়। আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহ্‌র জীবনাদর্শের ভিত্তিতেই মুসলিম জাতি বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা লাভ করে।

পৃথিবীর যে প্রান্তেই ইসলাম প্রচারিত হয়েছে, সেখানেই কমবেশি আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহ্‌র জীবনাদর্শের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর বিন খাত্তাবের খিলাফতকালে অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীতে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার শুরু হয়। তখন থেকে আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহ্‌র জীবনাদর্শের সাথেও এদেশের মানুষের পরিচয় ঘটে। ইসলামের প্রচার ব্যাপকতর হবার সাথে সাথে রাসূলের জীবনাদর্শের প্রভাবও এদেশে বিস্তার লাভ করেছে। তাই দেখা যায়, হাজার বছরের অধিককাল থেকে এদেশের মুসলিম জনগণ রাসূলের প্রতি বিভিন্নভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। নামাযের মধ্যে দরুদ পাঠ করা ছাড়াও মিলাদ ও বিভিন্ন ইসলামী অনুষ্ঠানে রাসূলের উপর দরুদ ও দোয়া পাঠের রেওয়াজ এদেশে আদিকাল থেকে প্রচলিত।

বাংলা ভাষায় মুসলিম কবিরা মধ্যযুগ থেকেই রসূল-প্রশস্তিমূলক কবিতা লিখেছেন। এভাবে যুগে যুগে অসংখ্য কবি-লেখক তাঁদের লেখায় রাসূল-প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। বর্তমান যুগে এ ধারা অধিকতর ব্যাপকতা লাভ করেছে। রাসূলের উপর যেমন কবিতা-গান-না'ত ইত্যাদি রচিত হয়েছে তেমনি তাঁর জীবনী নিয়ে অসংখ্য গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। রাসূল-প্রসঙ্গ নিয়ে এভাবে বাংলা ভাষায় এক বিশাল সাহিত্যভাণ্ডার রচিত হয়েছে। নাসির হেলাল সে সমৃদ্ধ সাহিত্যভাণ্ডারের এক ধারাবাহিক বিবরণ তুলে ধরে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ করেছেন।

সূচীমালা থেকে এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা চলে। সূচীটি এরূপ ঃ মধ্যযুগে রচিত রাসূল বিষয়ক বাংলা কাব্য, মৌলুদ শরীফ বিষয়ক গ্রন্থ, বাংলা গদ্যে সীরাত গ্রন্থ, গুরুত্বপূর্ণ সীরাত সংকলনসমূহ, সীরাত বিষয়ক গ্রন্থের ওপর লিখিত গ্রন্থ, আধুনিক বাংলা কাব্যগ্রন্থ, না'ত ও নিবেদিত কবিতার সংকলন, ছোটদের উপযোগী জীবনী গ্রন্থ, অসম্পূর্ণ তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ, সীরাত চর্চায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও প্রকাশনা মাধ্যম ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী।

উপরোক্ত সূচী থেকে গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সহজেই ধারণা করা যায়। এ থেকে আরো ধারণা করা যায় যে, এ কাজটি কোন সহজ কাজ নয়। নাসির

www.pathagar.com

হেলাল গভীর অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যের সাথে এ দূরূহ কাজটি যথাসম্ভব সূচারুরূপে সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছেন। তবু একথা না বললেই নয় যে, শত চেষ্টা করেও সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে এ কাজ করা প্রায় অসম্ভব। গ্রন্থে উল্লেখিত রচনাবলীর বাইরেও আরো অনেক লেখা এবং গ্রন্থ রয়েছে, যা হয়তো লেখকের দৃষ্টিতে পড়েনি। এটা লেখকের ইচ্ছাকৃত কোন ত্রুটি নয়। সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও বাংলা ভাষায় রাসূল [সা.] এর উপর রচিত সব গ্রন্থের বিবরণ দেয়া কঠিন। পরবর্তী সংস্করণে আশা করি, নাসির হেলাল এ অসম্পূর্ণতা বহুলাংশে দূর করতে সক্ষম হবেন। এরূপ মূল্যবান ও অতি প্রয়োজনীয় একটি গ্রন্থ রচনার জন্য লেখককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং এর বহুল প্রচার কামনা করি।

বাংলা ভাষায় মুহাম্মদ সা. চরিত। লেখক ঃ নাসির হেলাল। প্রকাশক ঃ সুহৃদ প্রকাশ, বুকস্ এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ২০১৩, প্রচ্ছদ ঃ মশিউর রহমান, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২৭, মূল্য ঃ চারশত টাকা মাত্র।

পাঞ্জেরী ইসলামিক পাবলিকেশন্স পাঞ্জেরী

আমাদের প্রকাশিত কতগুলো প্রয়োজনীয় ইসলামী বই

১. কুরআন মাজীদের বিষয়ভিত্তিক আয়াত
২. আল কুরআন কথা বলে
৩. ইসলামের আলোকে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও দাম্পত্য জীবন
৪. ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার ও পারিবারিক জীবন
৫. ইসলামে নারী বনাম প্রচলিত ভুল
৬. রাসূল (স) এর স্ত্রীদের জীবন বৃত্তান্ত
৭. কুরআন হাদীসের আলোকে সহীহ দুআর ভাণ্ডার
৮. হাদিয়াতুল মুসাল্লিন [নামাযের প্রামাণ্য মাসায়ালা]
৯. আত্মপরিচয়ে আল-কুরআন
১০. নবী রাসূলদের অলৌকিক ঘটনাবলী
১১. তাফসীরুল কুরআন সূরা ফাতিহা ও বাকারা
১২. তাফসীরুল কুরআন আমপাড়া
১৩. কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহীহ মুকছুদুল মোমেনীন
১৪. প্রশ্নোত্তরে ছোটদের প্রিয় নবী (স)
১৫. মিরাজ ও বিজ্ঞান
১৬. কারবালা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও ইমাম হোসাইনের (রা) শাহাদাত
১৭. শেষ মনযিলের পথে
১৮. আল কুরআনে আলোকিত বিশ্বনবী (স)
১৯. মানবাধিকার সনদ ও মহাগ্রন্থ আল কুরআন
২০. ইসলাম বনাম মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা
২১. সুনির্বাচিত হাদিস সঙ্কলন
২২. যুক্তি প্রমাণের আলোকে পর্দার বিধান
২৩. আল কুরআনে মানুষের করণীয় ও বর্জনীয়
২৪. আসহাবুর রাসূল (স) (১ম খণ্ড) [বেহেস্তের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন সাহাবী]
২৫. ছোটদের প্রিয়নবীর প্রিয়কথা
২৬. ইসলামের উদারতা ও অমুসলিমদের অধিকার
২৭. রোযা কি, কেন রাখবেন, কিভাবে রাখবেন
২৮. ইসলামের দৃষ্টিতে শিশুর অধিকার
২৯. নারী ও ইসলাম
৩০. তাযকিয়াতুন নফস বা আত্মশুদ্ধি
৩১. পরিবেশ ও ইসলাম
৩২. মুক্তিযুদ্ধ, ইসলাম ও বাংলাদেশ
৩৩. মক্কা মদীনা ও হজ্বের বিধি-বিধান
৩৪. দূর্নীতি ও নৈতিক মূল্যবোধ
৩৫. হিজাব, পর্দা ও ফ্যাশন
৩৬. আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র
৩৭. ঈদে মিলাদুন্নবী (স) উৎপত্তি, ভিত্তি ও আপত্তি
৩৮. মাও. মওদূদীর সঙ্গে মরিয়ম জামিলার পত্রালাপ
৩৯. জান্নাতের পথ পাথেয়
৪০. আল কুরআনে আস সালাত
৪১. আধুনিক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশল
৪২. ডাঃ জাকির নায়েক রচনাসমগ্র (১)
৪৩. হাদীসে কুদসী
৪৪. রাসূলুল্লাহ (স)-এর জিহাদ

www.pathagar.com

প্রতিবেদন :

বিভিন্ন সংগঠনের সীরাতুন্নবী সা. উদযাপন ২০১৫

আবু শামিল

নব্বই ভাগ মুসলমান অধ্যুষিত আমাদের এ দেশে নবী (স.) দিবস উদযাপন বেশ ব্যাপক আকারেই হয়ে থাকে। বিভিন্ন সামাজিক- সাংস্কৃতিক সংগঠন এ উপলক্ষে ব্যাপক অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে। এ আয়োজনের উল্লেখযোগ্য কিছু তুলে ধরা হলো।

সীরাতুন্নবী সা. উদযাপন জাতীয় কমিটির সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা:

ব্যতিক্রমী কর্মসূচী নিয়ে প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরেই দেশবাসীর দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হয়েছে সীরাতুন্নবী (সা.) উদযাপন জাতীয় কমিটি। সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে তারা। এর অংশ হিসাবে ৪ জানুয়ারী ২০১৫, রবিবার, জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে কেরাত, হামদ-না'ত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন সীরাতুন্নবী (সা.) উদযাপন জাতীয় কমিটির আহবায়ক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর সাবেক মহা-পরিচালক শিল্পী মুস্তাফা জামান আব্বাসী। উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব শেখ আবুল কাশেম মিঠুন, বিশিষ্ট গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী তোফাজ্জল হেসেন খান, সংবাদ পাঠক ও টিভি উপস্থাপক শরীফ বায়জীদ মাহ্মুদ, কবি মো: আমিনুল ইসলাম, গল্পকার ইবরাহিম বাহারী, অধ্যাপক কচি চৌধুরী, সংগঠক যাকিউল হক জাকি এবং প্রখ্যাত আবৃত্তিকার ইকবাল সাকি। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সীরাতুন্নবী (সা.) উদযাপন জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব শাহাদাতুলাহ টুটুল।

প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী বক্তব্য রাখছেন আহ্বায়ক মুস্তাফা জামান আব্বাসী

প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী বক্তব্যে সীরাতুন্নবী (সা.) উদযাপন জাতীয় কমিটির আহবায়ক শিল্পী মুস্তাফা জামান আব্বাসী বলেন, রাসুল (সা.) হলেন আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। সেই অনুপম আদর্শ থেকে আমরা বিচ্যুত

www.pathagar.com

হয়েছি বলেই আমাদের আজকে এই চরম পরিণতি। তিনি বিশ্বের সকল বিশ্বাসী মানুষকে সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার আহবান জানিয়ে মনোজ্ঞ এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এতে বিভিন্ন বিভাগে সম্মানিত বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীত শিল্পী সালাউদ্দিন আহমেদ, গীতিকার, সুরকার শিল্পী তোফাজ্জল হোসেন খান, শিল্পী গোলাম মাওলা, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হাফেজ ক্বারী মো: আবুল হোসাইন, বিশিষ্ট আলেমেদ্বীন মাওলানা লুৎফর রহমান, ক্বারী মো: বেলাল হোসাইন, বিশিষ্ট সংবাদ পাঠক ও টিভি উপস্থাপক শরীফ বায়জীদ মাহ্মুদ, আবৃত্তিশিল্পী ইকবাল সাকি, ও নাট্যকার আহসান হাবীব খান। প্রতিযোগিতায় রাজধানীর বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্রাসা থেকে বিপুল সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

পুরস্কার বিতরণী ও হামদ-না'ত সন্ধ্যা :

সীরাতুন্নবী (সা.) উদযাপন জাতীয় কমিটির কর্মসূচীর সমাপনী পর্ব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ৯ই জানুয়ারী,২০১৫ শুক্রবার, বিকাল সাড়ে তিনটায় জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে। সীরাতুন্নবী (সা.) উদযাপন জাতীয় কমিটির আহবায়ক শিল্পী মুস্তাফা জামান আব্বাসীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সীরাতুন্নবী (সা.) উদযাপন জাতীয় কমিটির প্রধান উপদেষ্টা, সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব মো: ফজলুল করীম। বিশেষ অতিথি ছিলেন উদযাপন জাতীয় কমিটির অন্যতম উপদেষ্টা কবি আল মাহমুদ। এতে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কমিটির সদস্য বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ড. মোহাম্মদ মানজুরে এলাহী। বক্তব্য রাখেন ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশনের সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শেখ আবুল কাশেম মিঠুন, বিশিষ্ট মিডিয়া ও নাট্য ব্যক্তিত্ব মাহবুবুল আলম গোরা, এবং

প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের সাথে প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাবেক পরিচালক ও জাতীয় কমিটির সদস্য মুফাজ্জল হোসাইন খান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কমিটির সদস্য শরীফ বায়জীদ মাহমুদ ও চলচ্চিত্র পরিচালক মোহাম্মদ হাফিজ উদ্দীন। অনুষ্ঠানের উপস্থাপনায় ছিলেন সীরাতুন্নবী সা. উদযাপন জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব শাহাদাতুলাহ টুটুল।

এতে বক্তারা নবী করিম (সা.) এর জীবনাদর্শে সকলকে রঙ্গিন হওয়ার আহবান জানান। তাঁরা আরো বলেন, কোন অলৌকিক কল্প কাহিনীর উপর নির্ভর না করে সাহাবায়ে কেরামের প্রদর্শিত পথে নবী করিম (সা.) এর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে সেই পথে আমাদের জীবন পরিচালনা করতে হবে। আধুনিক টেকনোলজি ব্যবহার করে নবী করিম (সা.) এর জীবনাদর্শ প্রচার করতে হবে। তারা বলেন, নবী করিম (সা.) এর জীবনেই সংঘাতময় এ বিশ্বের শান্তি ফিরিয়ে আনার মূল মন্ত্র রয়েছে।

আলেচনা সভা শেষে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করেন অতিথিবৃন্দ। পুরষ্কার হিসাবে ছিলো নগদ অর্থ, আকর্ষণীয় ক্রেষ্ট, সার্টিফিকেট, বই ও সিডি।

পুরস্কার বিতরণী শেষে সীরাতুন্নবী (সা.) উদযাপন জাতীয় কমিটির সদস্য শরীফ বায়জীদ মাহমুদ এর উপস্থপনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তন পরিপূর্ণ দর্শক-শ্রোতাদের মূর্হুমুহু মারহাবা ধক্ষনি ও করতালির মাঝে হামদ-না'ত ও কাওয়ালী পরিবেশন করেন রেডিও টেলিভিশনের বিশিষ্ট শিল্পী এম এ মান্নান, শিল্পী ইয়াকুব আলী খান, শিল্পী সালাহউদ্দিন আহমেদ, শিল্পী আবু বকর সিদ্দিক, এবং মহানগর শিল্পীগোষ্ঠী,

হামদ-না'ত পরিবেশন করছেন শিল্পী এম এ মান্নান

হামদ-না'ত পরিবেশন করছেন শিল্পী সালাহউদ্দীন আহমেদ

হামদ-না'ত পরিবেশন করছেন শিল্পী ইয়াকুব আলী খান

মল্লিক একাডেমী, অনুপম সাংস্কৃতিক সংসদ, সন্দীপন শিল্পীগোষ্ঠী, উচ্চারণ শিল্পীগোষ্ঠী ও জাগরণ শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ। প্রায় ২ ঘন্টাব্যাপী মনোজ্ঞ এ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপভোগ করেন অনেক দিনের ক্ষুধার্ত দর্শক-শ্রোতারা এবং এর মাধ্যমেই সমাপ্তি ঘটে সীরাতুন্নবী (সা.) উদযাপন জাতীয় কমিটির এবারের সীরাত বিষয়ক আয়োজন মালার।

www.pathagar.com

কোরাস পরিবেশন করছেন মহানগর শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ

বায়তুশ শরফের চারদিনব্যাপী সীরাতুন্নবী অনুষ্ঠানঃ

শত শত প্রতিযোগী, হাজার হাজার দর্শক শ্রোতা এবং অগণিত আলেম ওলামার সমাবেশে ১৯৮৪ সাল হতে চট্টগ্রাম বায়তুশ শরফ আনজুমানে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী ও সীরাতুন্নবী (সা.) অনুষ্ঠান। পাশাপাশি এবারে ৯-১২ রবিউল আউয়াল পর্যন্ত চারদিনব্যাপী তামাদ্দুনিক (ইসলামী সাংস্কৃতিক) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিজয়ীদের হাতে তুলে দেয়া হয় আকর্ষণীয় পুরস্কার। এ বছর কেরাত, হাম্‌দ-না'ত, ছড়া-কবিতা, কায়েদা-আমপারা-কুরআন, হিফজুল কুরআন, অর্থসহ ৪০ হাদীস মুখস্থ, আযান, বাংলা-উর্দু-আরবি কবিতা আবৃত্তি এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে ও ঘরে বসে রচনা প্রতিযোগিতা শিশু-কিশোর, জুনিয়র-সিনিয়র, মহিলা-সর্ব সাধারণ মিলিয়ে ২১টি বিষয়ে এক সহস্রাধিক প্রতিযোগী অংশ নিয়েছে প্রতিযোগিতায়। ১২ই রবিউল আউয়াল নবীজি (সা.) এর পবিত্র জন্ম ও ওফাত দিবসে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় সু-বিশাল সীরাতুন্নবী (সা.) মাহফিল। এই চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো সারাদিন ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা শেষে বাদ মাগরিব অনুষ্ঠিত আকর্ষণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষ অনুষ্ঠান।

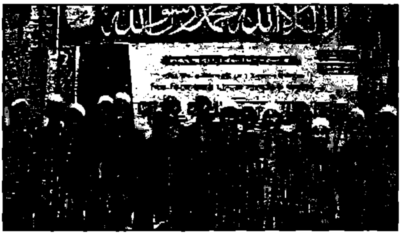

১ জানুয়ারি ২০১৫ইং ৪দিন ব্যাপী তামাদ্দুনিক প্রতিযোগিতা ও পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন এর প্রথম দিন ছোটদের ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'পাখপাখালির আসর'-এ অংশগ্রহণকারী বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদরাসার ক্ষুদে শিল্পীবৃন্দ

www.pathagar.com

প্রথম দিন: পাখ-পাখালির আসর। এখানে বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্‌রাসার শিশু-কিশোর ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায় গীতি নক্‌শার মাধ্যমে মহানবী (সা.) এর পবিত্র জীবন ফুটিয়ে তোলা হয়। এ অনুষ্ঠানটি এতই আকর্ষণীয় হয় যে, বায়তুশ শরফ কমপেক্স কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে দর্শক শ্রোতার সমাগমে।

দ্বিতীয় দিন: শানে মোস্তফা (সা.) মাহফিল। এ মাহফিলটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে সব বয়সের কবি শিল্পীদের অংশগ্রহণে পরিবেশিত হয় নবী করিম (সা.) এর শানে বাংলা, উর্দু, ফার্সি ও আরবি ভাষায় না'তে রাসূল পরিবেশন ও কবিতা আবৃত্তি। চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনেক উর্দু ভাষী শায়ের এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। পীর সাহেব হুজুর নবীজির শানে স্ব-রচিত গজল পরিবেশন করেন।

এবার এ অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে হযরত মাওলানা মোহাম্মদ কুতুবউদ্দিন সাহেব রচিত কাব্যগ্রন্থ "গুলহায়ে আকিদত-ভক্তির পুষ্পমাল্য" এর প্রকাশনা অনুষ্ঠান। এ কাব্যগ্রন্থে নবীজিকে নিয়ে তাঁর রচিত কয়েক ডজন উর্দু না'ত স্থান পেয়েছে।

তৃতীয় দিন: চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত ঈদে মিলাদুন্নবী ও সীরাতুন্নবী (সা.) মাহফিলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠান তৃতীয় দিন ১১ রবিউল আউয়াল বাদ মাগরিব অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত বায়তুশ শরফ আনজুমানে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ৭৮ জন দেশের বিশিষ্ট গুণীব্যক্তিকে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনা ও "বায়তুশ শরফ স্বর্ণপদক" প্রদান করে। প্রতি বছর ৪ জন জীবিত-মৃত অথবা

২ জানুয়ারি ২০১৫ইং বায়তুশ শরফের মাননীয় পীর বাহরুল উলূম শাহ্‌সূফী হযরত মাওলানা মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন (ম.জি.আ) এর স্বরচিত কাব্যগ্রন্থ গুলহায়ে আকীদত (ভক্তির পুষ্পমাল্য) এর প্রকাশনা অনুষ্ঠানে কাব্যগ্রন্থটি নিয়ে প্রধান অতিথি হযরত মাওলানা সুলতান যওক নদ্‌ভী, বিশেষ অতিথি ড. শব্বির আহমদ ও সুধীবৃন্দ।

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠানকে এই সংবর্ধনা ও পদক প্রদান করা হয়। এ বছর ১) ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসার এবং দ্বীনি খেদমতে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ- আওলাদে রাসূল (সা.) হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন তাহের জাবেরী আল-মাদানী ২) ইউনানী চিকিৎসার মাধ্যমে জটিল রোগ ব্যাধি উপশম এবং হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ- ড. হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভূঁইয়া, ৩) বিজ্ঞান শিক্ষার বিকাশ ও প্রচার-প্রসার এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ- প্রফেসর মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম কলেজ এবং ৪) চিকিৎসার মাধ্যমে অগণিত মানুষের ডায়াবেটিক রোগ উপশমে সহযোগিতা এবং আর্তমানবতার সেবায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ- চট্টগ্রাম ডায়াবেটিক সমিতি, প্রতিনিধি : অধ্যাপক মোহাম্মদ জাহাঙ্গির চৌধুরীকে সংবর্ধনা দেয়া হয়।

সংবর্ধনা উপলক্ষে প্রতি বছর একটি আকর্ষণীয় "গুণীজন সংবর্ধনা স্মারক" প্রকাশিত হয়। এতে সংবর্ধিত গুণীজনদের জীবন ও কর্ম সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়। তাদেরকে দেয়া সম্মাননা পত্রও এতে সন্নিবেশিত হয়।

চতুর্থ দিন: চারদিনব্যাপী ঈদে মিলাদুন্নবী ও সীরাতুন্নবী (সা.) মাহফিলের সমাপ্তি দিন। নবী করীম (সা.) এর পবিত্র জন্ম, বাল্য-কৈশোর-যৌবনকালের বিস্তৃত আলোচনা হয় এ মাহফিলে। সবশেষে পীর সাহেব দেশ ও জাতির কল্যাণে এবং মুসলিম উম্মাহ্র দূর্গতি অবসানের লক্ষ্যে মহান আল্লাহ্র দরবারে মুনাজাত পরিচালনা করেন। উপস্থিত মুসলমানগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে পরিতৃপ্ত মনে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। ১২ রবিউল আউয়াল উপলক্ষে প্রতিবছরের মত এবারও বায়তুশ শরফ হতে প্রকাশিত হয়েছে সীরাতুন্নবী সংখ্যা মাসিক দ্বীন দুনিয়া ও শিশু কিশোর দ্বীন দুনিয়া। প্রতিবেদক: মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্।

ছবি আঁকছে ক্ষুদে প্রতিযোগি

'সমন্বিত সাংস্কৃতিক সংসদ- 'সসাস':

সুস্থ ধারার সংস্কৃতির বিকাশ ও যুব সমাজের মুক্তির জন্য রাসুল (সা.) এর জীবনাদর্শের বিকল্প নেই। তাই ঐতিহ্যবাহী সংগঠন 'সমন্বিত সাংস্কৃতিক সংসদ- সসাস' সীরাতের মাসে কেন্দ্রীয়ভাবে

www.pathagar.com

ঘোষণা করে দেশব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচী। তারই ধারাবাহিকতায় 'সসাস' এর শাখা সংগঠনগুলো আয়োজন করেছিল নানা অনুষ্ঠানের। এর মধ্যে না'তে রাসুল সন্ধ্যা, নবীজীর জীবনী নিয়ে আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা, ভ্রাম্যমাণ না'তে রাসুল পরিবেশন ও 'রাসূলুল্লাহর গল্প বলা' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মাসব্যাপী আয়োজনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি তুলে ধরা হলো।

উচ্চারণ শিল্পীগোষ্ঠী: ঢাকার উচ্চারণ শিল্পীগোষ্ঠীর শিশুবিভাগ পুস্পকানন শিশুমেলা আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-১৫। যার মধ্যে ছিল না'তে রাসুল, তেলাওয়াত ও চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা । সেখানে অংশগ্রহণ করে প্রায় তিন শতাধিক প্রতিযোগী । পরিচালক আবদুল্লাহ আল মাহমুদের পরিচালনায় প্রতিযোগিতায় বিচারক ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যকার ও আবৃত্তিকার মুস্তাগিছুর রহমান মোস্তাক, সসাসের নাট্য সম্পাদক মনিরুল ইসলাম, শিল্পী ইলিয়াস হোসাইন প্রমুখ।

সন্দীপন শিল্পীগোষ্ঠী: এদিকে ঢাকার আর এক সাংস্কৃতিক সংগঠন সন্দীপন শিল্পীগোষ্ঠী বড় শিল্পীদের জন্য আয়োজন করে না'তে রাসুল প্রতিযোগিতা ও ছোটদের জন্য আয়োজন করে 'রাসুল (সা.) এর জীবনের গল্প বলি' প্রতিযোগিতার। পরিচালক হাবিবুল হাসান সাইমনের পরিচালনায় বিচারক ছিলেন বিশিষ্ট গতিকার সুরকার ও শিল্পী ইলিয়াস হোসাইন।

স্পন্দন সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ: গাজীপুরের সাংস্কৃতিক সংগঠন স্পন্দন সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে আয়োজন করে না'তে রাসুল পরিবেশনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। পরিচালক সৈয়দ মিজানুর রহমান রিমনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্পন্দনের ভাইস চেয়ারম্যান হাসনাইন আহমেদ, সসাস এর নাট্য সম্পাদক মনিরুল ইসলাম, সসাসের নির্বাহী সদস্য শিল্পী নাসির উদ্দিন আল মামুন ও স্পন্দনের উপদেষ্টা সদস্য মেহরাব হাসান প্রমুখ।

উত্তরণ সাংস্কৃতিক সংসদ: পবিত্র সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে ময়মনসিংহ উত্তরণ সাংস্কৃতিক সংসদ শহরের একটি মিলনায়তনে 'আয়োজন করে 'সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণীর। পরিচালক রিয়াদুল ইসলাম শাহীনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরণের ভাইস-চেয়ারম্যান রেজাউল করিম, উপদেষ্টা খন্দকার আবু হানিফ, পৃষ্ঠপোষক শোয়েব মুহাম্মদ। এতে সংগীত ও আবৃত্তি বিভাগে মোট ৪টি গ্রুপে শিল্পীরা অংশগ্রহণ করে।

ইলহাম শিল্পীগোষ্ঠী: ময়মনসিংহের আরেক সাংস্কৃতিক সংগঠন ইলহাম শিল্পীগোষ্ঠী সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে আয়োজন করে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। এখানে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন

www.pathagar.com

ইলহাম'র চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মুক্তা, ভাইস-চেয়ারম্যান মুজাহিদুল ইসলাম।

ঝংকার শিল্পীগোষ্ঠী: ফরিদপুরের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন ঝংকার শিল্পীগোষ্ঠী আয়োজন করে হামদ-না'ত প্রতিযোগিতার। ৩টি বিভাগের মধ্যে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ।

চেতনা শিল্পীগোষ্ঠী: রাজবাড়ির সাংস্কৃতিক সংগঠন চেতনা শিল্পীগোষ্ঠী আয়োজন করে হামদ-না'ত ও ইসলামিক কুইজ প্রতিযোগিতার। পরিচালক শরিফুল ইসলামের পরিচালনায় পুরস্কার বিতরণীতে উপস্থিত ছিলেন চেতনা শিল্পীগোষ্ঠীর চেয়ারম্যান কবির উদ্দিন।

দিশা সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ: নওগাঁ'র দিশা সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে আয়োজন করে রাসুলুল্লাহর জীবনী নিয়ে 'গল্প বলার আসর'। এতে উপস্থিত ছিলেন দিশা'র চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন।

আলহেরা শিল্পীগোষ্ঠী: ভোলার সাংস্কৃতিক সংগঠন আলহেরা শিল্পীগোষ্ঠী সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে আয়োজন করে হামদ না'ত প্রতিযোগিতার। পরিচালক সাইফুল্লাহ ইদ্রিসের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেন আলহেরার চেয়ারম্যান রুহুল আমিন মুশফিক।

প্লাবণ সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ: কুমিল্লার প্লাবণ সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ ১২ই রবিউল আওয়াল সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে আয়োজন করে ভ্রাম্যমাণ না'ত পরিবেশনার । এতে শহরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে শিল্পীরা না'তে রাসুল পরিবেশন করেন।

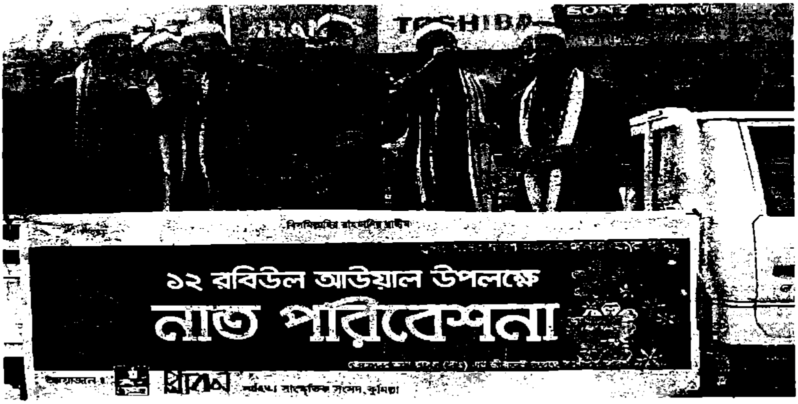

অভিযাত্রী শিল্পীগোষ্ঠী : চাঁপাইনবাবগঞ্জের অভিযাত্রী শিল্পীগোষ্ঠী ১২ ই রবিউল আওয়াল সিরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে আয়োজন করে আলোচনা সভা ও

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের । দেলোয়ার হোসেনের পরিচালনায় এ আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

কপোতাক্ষ শিল্পীগাষ্ঠী: সাতক্ষীরার কপোতাক্ষ শিল্পীগোষ্ঠী আয়োজন করে স্কুলভিত্তিক না'তে-রাসূল প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের। পরিচালক মুক্তাদির হোসেনের পরিচালনায় শতাধিক শিল্পী এতে অংশগ্রহণ করে।

অনুপম শিল্পীগোষ্ঠী : লক্ষীপুরের অনুপম শিল্পীগোষ্ঠী এ উপলক্ষে আয়োজন করে হামদ-না'ত সন্ধ্যা।

প্রভাত সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ: শরীয়তপুরের প্রভাত সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ আয়োজন করে হামদ-না'ত প্রতিযোগিতার।

প্রতিবেদক : মিরাদুল মুনীম।

ইসলমিক ফাউন্ডেশন: এ ছাড়াও ইসলমিক ফাউন্ডেশন মাসব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে। যার মধ্যে ছিল সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী, হামদ-না'ত মাহফিল এবং ইসলামী বইমেলা।

এছাড়াও সারাদেশে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন রবিউল আউয়াল উপলক্ষে নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

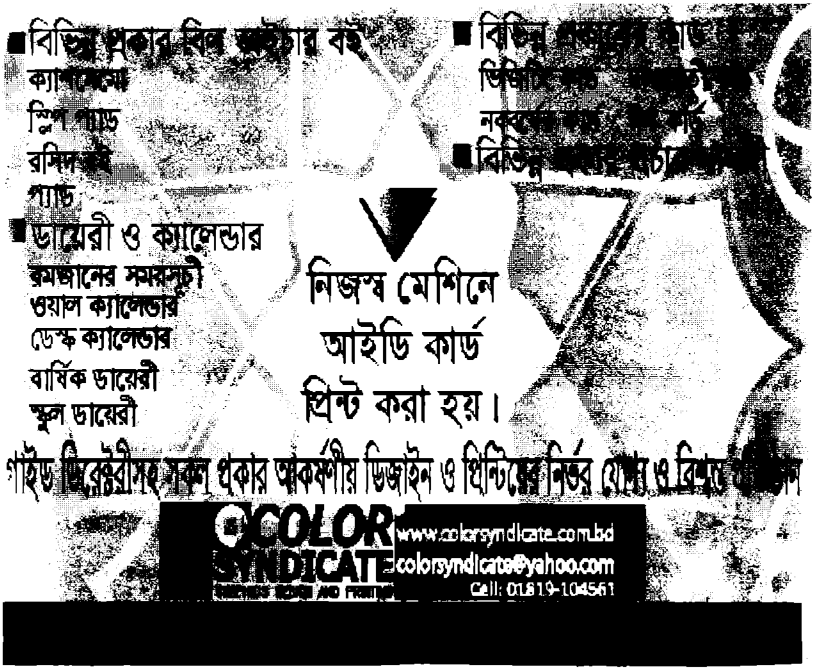

www.pathagar.com

পীসস্কুল ব্যতিক্রমী প্রয়াস!

এক ছাতার নিচেই সবকিছু

গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা, সব বিষয়ে লেকচার প্রেজেন্টেশন, মাল্টিমিডিয়া পারফরমেন্স, সচিত্র ডিজিটাল বই, কোরিওগ্রাফির মাধ্যমে গান-কবিতা, স্টুডিওভিত্তিক ক্লাসরুম, শিশু মনোবিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকমণ্ডলী, সুন্দর হ্যান্ডরাইটিং, আর্ট ও ক্যালিগ্রাফি, আন্তর্জাতিক মানের শুদ্ধ উচ্চারণে ইংরেজী, আরবী ও বাংলা শেখা। প্লে, নার্সারী ও কেজি শ্রেণিতেই প্রি-হিফজ, পৃথক হিফজ বিভাগের সাথে শর্টকোর্সে সাধারণ শিক্ষা, ছাত্র ও ছাত্রীদের পৃথক শ্রেণিকক্ষ, সব পাঠদান প্রক্রিয়া টেলিভিশনে প্রচারযোগ্য। নৈতিক ও ধর্মীয় বিধি-বিধান পরিপালনসহ প্রয়োজ্য ম্যানার ট্রেনিং।

আমাদের কোন স্লোগানই 'কথার কথা' নয়, সত্যিকার বাস্তবানুগ। বাসায় কোনো বিষয়েই আলাদা টিউটরের প্রয়োজন নেই।

প্লে থেকে ৪র্থ শ্রেণি ও হিফজ বিভাগে

ভর্তি চলছে

ইনডাইট পীস স্কুল এন্ড কলেজের প্রথম পি.পি উপস্থাপনকারী, উত্তরা ক্যাম্পাসের ফাউন্ডার এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, পীস স্কুল সংগীতের গীতিকার, ছড়াকার-শিশু সংগঠক ও গ্রাফিক্স ডিজাইনার নূরুজ্জামান ফিরোজ এর পরিচালনায় 'পীসস্কুল-মালিবাগ' এ আপনাদের সবাইকে সুস্বাগতম।

'Be enriched- Live in Peace'

Peace School

Malibag

৪০০/বি, মালিবাগ চৌধুরীপাড়া, ঢাকা-১২১৯ ফোন: ০১৮৪২৭৩৭৭০০, টিএন্ডটি: ৫৫১২১৬০৩

লোকেশন : মালিবাগ চৌধুরীপাড়া আল-মদিনা হোটেলের বিপরীতে

Hotline: 01829369100 www.peaceschoolbd.com

www.pathagar.com

NIBRAS International Madrasah
مدرسة النبراس العالمية
নিবরাস ইন্টারন্যাশনাল মাদরাসা

- আবাসিক
- অনাবাসিক
- ফুলটাইম

অ্যারাবিক এন্ড ইংলিশ ভার্সন

www.nibrasbd.com

- বালক বিভাগ
- বালিকা বিভাগ
- তাহফিজুল কুরআন বিভাগ

মূল ক্যাম্পাস (সাধারণ ও বিজ্ঞান)
প্লে গ্রুপ হতে ১২ শ্রেণি (৪র্থ শ্রেণি থেকে পৃথক বালক-বালিকা)

মোহাম্মদপুর ক্যাম্পাস
প্লে গ্রুপ হতে ৭ম শ্রেণি

মূল ক্যাম্পাস
বাড়ি-১, রোড-৫, ব্লক-ডি, বনশ্রী আবাসিক এলাকা
রামপুরা, ঢাকা-১২১৯, ফোন: ৮৩৯৬২৮৭
মোবাইল : ০১৭১১০৬৯৮৯৮, ০১৮১৯৪১৭১৮৭, ০১৭২৪০০০৬০৭

মোহাম্মদপুর ক্যাম্পাস
বাড়ি-১, রোড-২, পিসি কালচার হাউজিং
শেখেরটেক, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল : ০১৫৫২০০৩০৩২, ০১৯৪৮২৪৮৯১১

ভর্তির সময়
- তাহফিজুল কুরআন বিভাগ
  শাওয়াল এবং নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস
- সাধারণ বিভাগ
  নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস

নিবরাস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

e-mail: nibrasbd@yahoo.com

www.pathagar.com

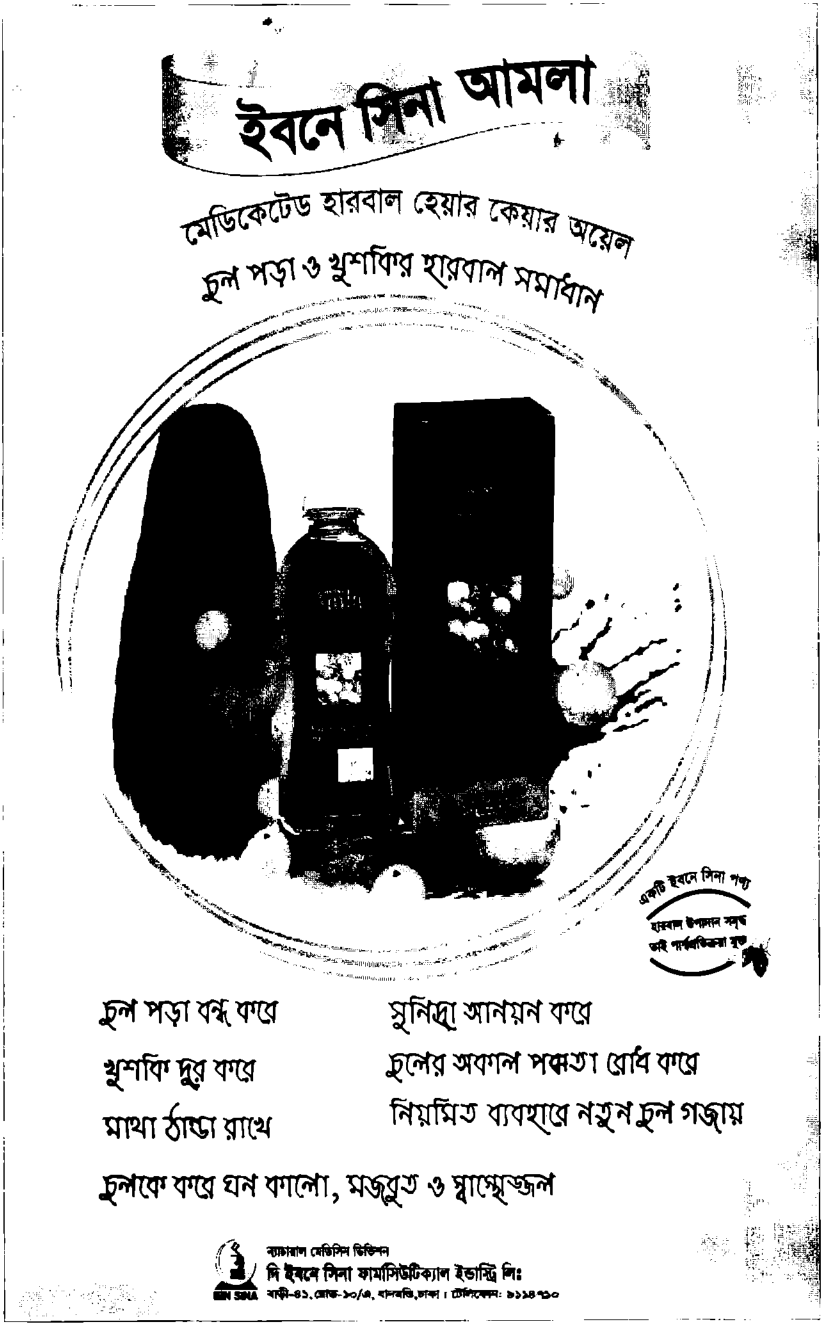

www.pathagar.com

এন্ডোস্কোপি আপনি যতটা কষ্টকর মনে করেন আসলে তা ততটা কষ্টকর নয়

থেরাপিউটিক এন্ডোস্কোপি অপারেশনের বিকল্প

বিনা কষ্টে কোন রকম কাটা ছেঁড়া ছাড়াই
এন্ডোস্কোপির মাধ্যমে খাদ্য নালির রক্তক্ষরণ,
খাদ্যনালি থেকে ফরেন বডি (যেমন- পয়সা,
কৃত্রিম দাঁত, হাড় ইত্যাদি) বের করা কিংবা স্টেন্ট
বসানোর মতো জটিল অপারেশনের বিকল্প চিকিৎসা করা যায়

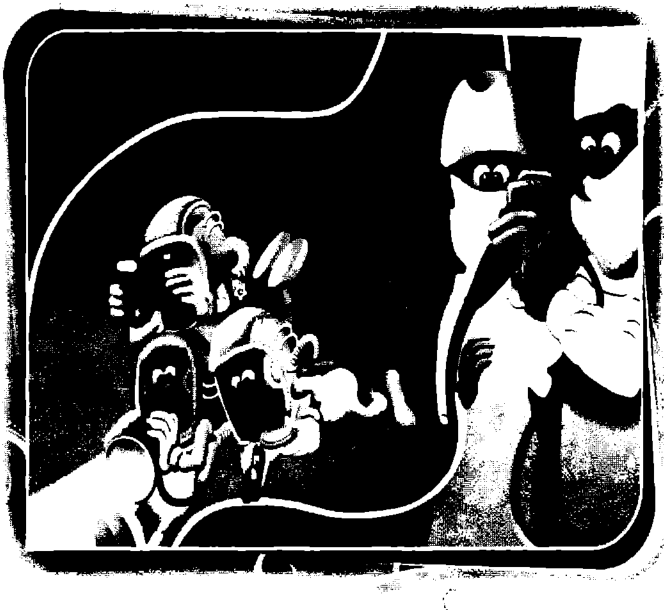

ইআরসিপি'র মাধ্যমে অপারেশন ছাড়াই পিত্তনালীর পাথর অপসারণ,
কৃমি বের করা ও ক্যান্সারে টিউব (Stent) বসাতে নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

Crescent Gastroliver & General Hospital

25/i, Green Road, Dhanmondi, Dhaka.
[Eastern end of Dhanmondi Road # 7]
Phone : 8621612, 8611936, Mobile : 01926 100 100

www.pathagar.com

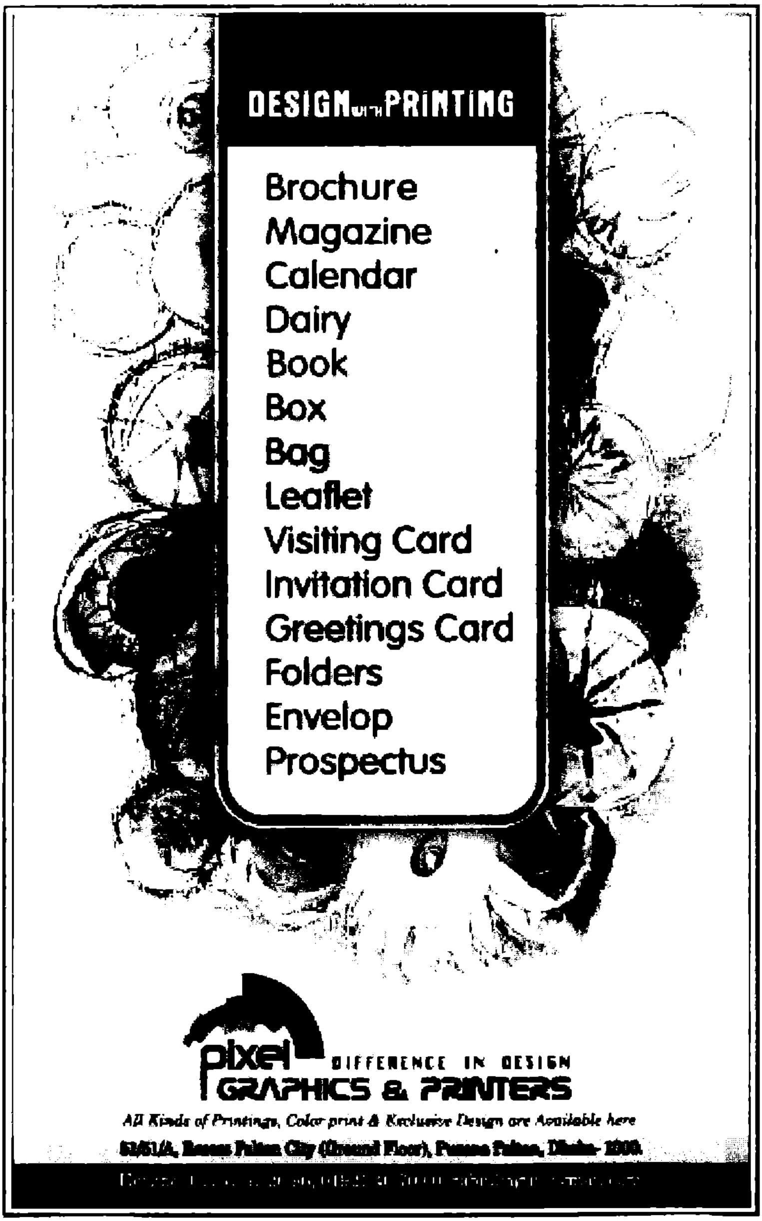

www.pathagar.com

ব্যাংকিং এখন
যখন তখন
Islami Bank
iBBL iBanking
ইসলামী ব্যাংক ইন্টারনেট ব্যাংকিং
বিশ্বের যেকোন স্থান থেকে ২৪ ঘণ্টা ঝুঁকিমুক্ত ব্যাংকিং
অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স ও স্টেটমেন্টসহ ক্লিয়ারিং সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য
ইসলামী ব্যাংকের যে কোন অ্যাকাউন্টে তাৎক্ষণিক টাকা স্থানান্তর
বিনা খরচে মোবাইল ও ওয়াইম্যাক্স রিচার্জ
ইউটিলিটি বিল পরিশোধ ও টিকেট ক্রয়
অনলাইনে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়
ইসলামী ব্যাংক
বাংলাদেশ লিমিটেড
ইসলামী শরী'আহ মোতাবেক পরিচালিত
লগ ইন করুন - ibblportal.islamibankbd.com
ইসলামী ব্যাংক কন্ট্যাক্ট সেন্টার ৮৩৩১০৯০ অথবা ১৬২৫৯